বাংলা চলিত গদ্য

ড. মণিলাল খান

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশক :
শ্রীঅরুণকুমার পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর :
শ্রীমতী মহামায়া রায়
সনেট প্রিন্টিং হাউস
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাংলা গদ্য ও মুদ্রাযন্ত্রের সূচনা

বাংলা গদ্যের ব্যবহার ঠিক কিভাবে ও কবে থেকে শুরু হয়েছে, সেকথা সঠিকভাবে বলার উপায় নেই। আজ থেকে হাজার বছর আগে চর্যাপদগুলো লেখা হয়। পদ্যে রচিত এই পদগুলোই বাংলা ভাষার আদিমতম নিদর্শন। সে আমলে গদ্যচর্চা না থাকলেও লোকে নিশ্চয় কাব্যে কথা বলতো না। তখন মুখে মুখে ভাষার চেহারা কেমন ছিল সেটা চর্যার ভাষা থেকে কতকটা অনুমান করা যায়। তবে পুরোপুরি অনুমান অসম্ভব। কারণ লেখ্যভাষা বরাবর কৃত্রিম ও মার্জিত। তাতে মৌখিক ভাষার উপাদান থাকলে তাও মার্জিত রূপেই প্রবেশ করে। বাংলা গদ্যের প্রথম প্রাপ্ত নিদর্শন দেখে একথা অস্বীকার করা যাবে না।

বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্বে দেশিয় রাজাদের হাতের লেখা চিঠি, দলিল, চুক্তিপত্র প্রভৃতি পাওয়া যায়। গদ্যে লেখা সবচেয়ে পুরোনো একটা হাতে লেখা চিঠির খোঁজ পাওয়া যায়। পত্রটির রচনাকাল ১৫৫৫ খৃস্টাব্দ বলে জানা যায়।[১] আসামের রাজাকে লেখা কোচবিহাররাজের এই পত্রটির সন্ধান প্রথম দেন ১৯০১ খৃঃ ২৭ জুনের 'আসাম বন্তী' পত্রিকা। পরে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ ভাগে ও বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়। পত্রটি এই :

"লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে সে বর্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি। তোমারো এ-গোট কর্তব্য উচিত হয়। না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্মী, রামেশ্বর শর্মা, কালকেতু ও ধুমা সর্দার, উদ্ভব চাউনিয়া, শ্যামরাই, ইমরাক পাঠাইতেছি। তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা। অপর উকিল সঙ্গে ঘুড়ি ২, ধনু ১, চেঙ্গা মৎস্য ১ জোর, বালিচ ১, জকাই ১, সারি ৫ খান, এই সকল দিয়া গইছে। আরু সমাচার বুঝি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ গমচেং ১, ছিট ৫, ঘাগরি ১০, কৃষ্ণচামর ২০, শুক্লচামর ১০।

ইতি শক ১৪৭৭, মাস আষাঢ়।"

এতে দেখতে পাচ্ছি ভাষায় কিছু সংস্কৃত এবং কিছু আঞ্চলিক উপভাষার উপাদান রয়েছে। আর তৎসম, অর্ধতৎসম ও আঞ্চলিক শব্দের প্রচুর ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে আগাগোড়া সাধুরূপের বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে।

আঞ্চলিকতার মধ্যে উত্তরবঙ্গের সেকালের কথ্যরূপ পত্রের অনেক জায়গায় দেখতে পাই। 'আমরা সেই উদ্যোগতে আছি,' 'না কর তাক আপনে জান,' 'অধিক কি লেখিম' 'আরু সমাচার বুঝি কহি পাঠাইবেক'—প্রভৃতি বাক্‌রীতির মধ্যে আমরা তার প্রমাণ পেতে পারি।

পত্রদাতা এখানে অতি সহজে মনের ভাব প্রকাশ করতে পেরেছেন। তবু স্বীকার করতে দোষ নেই যে, এর ভাষার চেহারা এই শতকের গদ্যভাষার চেয়ে অনেকটা আড়ষ্ট। বিশেষ

১. আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় পত্রটিকে সপ্তদশ শতকের আগের নয় বলেছেন। দ্রঃ বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য।

করে সংস্কৃত বাক্য ব্যবহারে গোড়ায় উৎকট ভাবটা বেশি ফুটে উঠেছে। বলা বাহুল্য, এই সব চিঠি বা দলিলের মধ্যে ব্যবহৃত কিছু সংস্কৃত কিছু ফার্সি, কিছু বা বাংলা প্রয়োগের মাধ্যমে এই সব রচনার সূচনা করা হোত বিশেষ একটা System বা রীতির জন্যে। এখনো এসবক্ষেত্রে সেই পুরাতন ধারা লক্ষ্য করা যায়।

এটুকু বাদ দিলে বাকি চিঠির মধ্যে দিয়ে সেকালেও পত্রদাতার হৃদয়াবেগ তৎসম ও ভগ্ন-তৎসম শব্দের পাশাপাশি দেশি বিদেশি আঞ্চলিক শব্দের সাহায্যে সহজেই প্রকাশ হতে পেরেছে।

এই পত্রের উত্তরে আসামরাজের পত্রটিতে আঞ্চলিক ভাষায় তথা অসমিয়ার রূপটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা বোঝা যায়। এতে মনে হয়, এখান থেকেই কামরূপী উপভাষা স্বতন্ত্র একটা ভাষারূপের দিকে পা বাড়িয়েছে। তবে সেটুকু বাদ দিয়ে অর্থ উদ্ধার করতে বাঙালি পাঠকের এতটুকু বেগ পেতে হবে না।

কিন্তু এর অল্পকাল পরে বাংলা ভাষায় আরবি-ফার্সি শব্দ বেনোজলের মত ঢুকে পড়ে ভাষার স্বকীয়তাকে কিছুটা জব্দ করে দেয়। সপ্তদশ শতকে লেখা ঢাকা অঞ্চলের একটা দলিলের[১] কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। যথা :

"হকীকত মজুকুর শ্রীজুত জসোমাধব ঠাকুর কুমড়াল গ্রামে দেবালয়ত আছিল রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়রহ সেবকেরা আপনার আপনার ওয়াদা মাফিক সেবা করিতেছিল রাত্রিদিন চৌকি দিতেছিল শ্রীরামজীবন মৌলিক সেবার সরবরাহ পুরুষানুক্রমে করিতেছেন। ইহার মধ্যে পরগনা পরগনাতে দেওড়া ও মুরুত তোড়িবার আহাদে হজুর থাকীয়া পরোয়ানা লইয়া আর আর পরগনাতে দেওড়া ও মুরুত তোড়িতে লাগীল। এ বার্তা ষুনিয়া ঠাকুর রামজীবন মৌলিকের ও বাড়ীতে বাহির বাড়ীতে আসিয়া রহিলা রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়রহ ঠাকুরের সেবা ও চৌকি পহরা রাত্রিদিন নিজুক্ত আছিল তাহার পর ২৭ মহরম মাহে ২৮ জ্যৈষ্ঠ ঠাকুর দেখিবার প্রাতঃকালে সকল লোকে গেল ঠাকুর সেখানে না দেখিল রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়রহতে সেবা করিতেছিল তারায় সেখানে নাই তদবধি রামজীবন মৌলিকের বাড়ীতে ঠাকুর ও রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়রহ কেহ নাহি। ইতি স ১৭৭৯ তে ২৯ মহরম মাহে।"

এতে ফার্সি শব্দের প্রচুর ব্যবহার করা হয়েছে। 'ইত্যাদি' বাচক ফারসি 'ওগয়রহ' শব্দের প্রয়োগও লক্ষণীয়। আর আছে কয়েকটি হিন্দী শব্দ। ভাষাগত দিক থেকে দলিলটির ঐতিহাসিক মূল্যের কথা বলেন আচার্য সুকুমার সেন মহাশয়[২]। তৎসমশব্দ ও ক্রিয়ার ব্যবহার একে মোটামুটি সাধুগদ্যের চেহারা দিয়েছে।

এই ধরনের বেশ কিছু প্রাচীন বাংলা পত্রের একটি সংকলন সম্পাদনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়। 'প্রাচীন বাংলা পত্র সংকলন' নামক এই গ্রন্থের পত্রগুলির লিপিকাল অষ্টাদশ শতকের পরবর্তী কালের বলে জানা যায়। অধিকাংশ পত্র সংস্কৃত—আরবি—ফার্সি ও দেশি-বিদেশি শব্দের মিশ্রিত সাধুগদ্যের ঢঙে লেখা। কোন কোন পত্রে স্থানীয় কথ্যভাষার কিছু কিছু উপাদান দেখতে পাওয়া যায়। তবে

---

১. বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর প্রকাশিত 'প্রতিভা' ১৩২০ ও ড. সুকুমার সেন প্রণীত 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত

২. বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য, ৫—৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

বেশির ভাগ পত্রেই রীতি বা স্টাইল মানতে গিয়ে ভাষার স্টাইল বা স্বাভাবিক রূপটা হারিয়ে গেছে।

তবু আমরা অবাক হয়ে যাই, ঐ রকম সাধুগদ্যের নড়বড়ে দেয়াল বেয়ে সরু লতার মত সেকালের কথ্যভাষাকে উঠতে দেখে। 'আমার পর নেক নজর' (পত্র ৯), 'গোসাঞির কারসাজিতে' (পত্র ১১), 'আমার ছাওাল' (১১), 'রাজার সপরিবারে বেহার পাঠাও' (পত্র ১১), 'আমার বাড়ীতে চড়াও' (১১), 'সাত টাকা একুনে' (১৮), 'ছিয়ানব্বৈ টাকা দেওয়া গেল' (১৮) প্রভৃতি পত্রের মধ্যে দিয়ে সেকালের কথ্যগদ্যের চেহারাটা কিছুটা আন্দাজ করা যায় বইকি।

তবে প্রচুর আরবি-ফার্সি শব্দ-প্রয়োগে ভাষা অনেকটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। যেমন :

আওলাদ, আদালত, ওয়াসিলাত, ওয়াস্তা, ওগয়বহ, ওজর, জোনাব, জমাইত প্রভৃতি আরবি শব্দ ; আঞ্জাম, আবকারি, আবতরী, জরদার, গ্রফতার, মজবুতি, বেমোবাফিক প্রভৃতি ফারসি এবং আড্ডাদার (ডাকপিওন), আপোস, বেগারী, মিলাপ লারকা, লালাচে প্রভৃতি হিন্দী ও আপরেল (পত্র ৩) বিদেশি শব্দের প্রয়োগ ক্রমশ গদ্যে স্থান করে নিয়েছিল।

সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে অর্থাৎ ১৬৯৬ খৃস্টাব্দে লেখা ঢাকা অঞ্চলের কথ্যভাষা মিশ্রিত একটা চুক্তিপত্রের সন্ধান দেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি বৃটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহ থেকে এই পত্রের একটি প্রতিলিপি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়[১] প্রকাশ করেন। চুক্তিপত্রটি এই ঃ

১১০৩ সাল = ১৬৯৬ খৃস্টাব্দ

শ্রীকৃষ্ণ

সাখি শ্রীধর্ম।

শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল / মহাসহেষু—

লিখিত শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস আগে আমরা দুই লুকে, করার করিলাম জে কিছু বাঁরে (= কারে?)

সুনা। রগায় ওগর খ (?) রি করিয়া আরম্ভ দলালি লইব।

আর কুন দায়া নাই বরাক সমেত এই নি। অমে করা। [র]

পত্র দিলাম স ১১০৩। ৩ ১৪ আ। গ্রান-

শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস

পত্রের পিছন পৃষ্ঠায় পুরাতন ছাঁদের ইংরাজি হাতের লেখা ঃ

The Bramanies Carackter from Dacca. The Metropolis of Bengali in the East Indies.

আচার্য সেন মহাশয় অনুমান করেন যে, কোন কৌতূহলী ইংরেজ প্রাচ্যলিপি বিশেষের নমুনা রূপে এটি সংগ্রহ করে নিয়ে যান অষ্টাদশ শতকের গোড়ায়। হাতের লেখা সবচেয়ে পুরাতন চুক্তিপত্র এটা।

পত্রটির ছাপা অনুলিপির মধ্যে সেকালের বাংলা ছাঁদের হাতের লেখা দেখতে পাই। যেমন—

১. সাঃ পঃ পঃ ১৩২৯, ৩য় সংখ্যা

"র" এর বদলে "ক" (কতকটা পেটকাটা 'ব' এর মত) বর্ণ লক্ষ্য করা যায়, "ক" অনেকটা হিন্দী 'ক' এর মত ; মাত্রার পাশে শূন্য দিয়ে অনুস্বর (ং) বোঝানো হয়েছে।

পত্রের ভাষায় আঞ্চলিকতা তথা ঢাকা অঞ্চলের কথাভাষার ছাপ স্পষ্ট। যথা-- সুনারগায়ে, আরত, দায়া, লুকে, কুন (সোনার গাঁয়ে, আড়ত, দায়, লোকে, কোন) প্রভৃতি শব্দগুলো প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে এই রূপটা ফুটে উঠেছে।

মিত্রি গই ও মিত্রি গারবেল হচ্ছে মিঃ Mr. Gay ও Mr. Garbell.

তিনটি সাধুরূপের ক্রিয়াপদ ছাড়া গোটা চুক্তিপত্রটি কথ্যভাষায় লেখা। তাতে ভাষায় কোথাও বক্তব্য প্রকাশে বিঘ্ন দেখা দেয়নি। বরং এই শতকের অন্যান্য সাধু বা মিশ্র-সাধু-গদ্যে রচিত ভাষার চেয়ে ঢাকা অঞ্চলের কথ্যগদ্যের সজীবতা ও স্বেচ্ছাবিহারী রূপটা আমাদের বেশি মুগ্ধ করে। চলিত গদ্যের ক্রমব্যবহারের ইতিহাসে চুক্তিপত্রের ভাষারূপের মূল্য কিছু কম নয়।

২

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে লেখা অপরাপর গদ্য বা গদ্য জাতীয় রচনার কথা জানা গেছে। এদের মধ্যে বৈষ্ণব সাধকদের কয়েকটা প্রশ্নোত্তরমূলক ছোট ছোট নিবন্ধ, বা কড়চা, বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এগুলোর মধ্যে সপ্তদশ শতকে লেখা একমাত্র বৈষ্ণব 'দেহকড়চ', ছোট ছোট বাক্যে লেখা ও সাধুগদ্যে রচিত। রচয়িতার নাম নরোত্তম দাস। লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য নরোত্তম দাস ঠাকুর এবং দেহকড়চের লেখক যদি একই ব্যক্তি হন, তবে গ্রন্থটির রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।[১] গদ্যে রচিত হলেও সাহিত্যিক গদ্য বলতে অনেকেরই আপত্তি।[২]

অষ্টাদশ শতকে লেখা দলিল ও অন্যান্য গ্রন্থের ভাষা সাধু। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী না পরকীয়া প্রণয়িনী এই নিয়ে ১১৩৮-এর বৈশাখে ইস্তফা ও পরাজয়পত্র। তাছাড়া কোচবিহার মহারাজার সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সন্ধিপত্র (১৭৭২ ডিসেম্বর) এবং একাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা গদ্য অনুবাদ বিশেষ করে স্মৃতি ন্যায় জ্যোতিষ চিকিৎসা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৩] এই শতকের আরও একটি বাংলা গদ্য বিক্রমাদিত্য-বেতাল কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এসব রচনার ভাষা সাধু অথবা আঞ্চলিক উপাদান-মিশ্রিত সাধু।

৩

পোর্তুগীজ ক্যাথলিকদের রচনা

বাংলা গদ্যভাষার ইতিহাসে প্রথম যে অঘটন ঘটলো তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক। এদেশে ধর্মপ্রচারের কাজে সুবিধা হবে মনে করে পোর্তুগীজ পাদ্রীগণ বাংলা গদ্যভাষাকে

১. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ড. সুকুমার সেন, ৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য
২. ঐ
৩. ঐ

অপরিহার্য জ্ঞান করলেন। সেজন্য তারা প্রশ্নোত্তরমূলক ধর্মীয় ব্যাখ্যা, ব্যাকরণ ও শব্দকোষ জাতীয় কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। ইতিপূর্বে ইউরোপীয় দেশগুলোতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন হয়। পোর্তুগালও তা থেকে পেছনে ছিল না।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পোর্তুগীজরা আসতে শুরু করে। তারা দেশের নানা উপকূল অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়ে অত্যাচার আর উৎপাত করতো। অন্যদিকে ধর্মপ্রচার করে এদেশের মর্মলোকে আঘাত হানতে সচেষ্ট হয়। ফলে সেই কাজেই তারা বাংলা ভাষা শিখে নিয়ে বাংলা বই রচনায় মন দেয়।

জন্ মিল ভেইরা নামে একজন পোর্তুগীজ ষোড়শ শতকের একেবারে গোড়ায় (১৫১৮ খৃঃ) বাংলায় আসেন। তিনি এদেশে থেকে এখানকার বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞান লাভ করেন। তারপর সপ্তদশ শতকের শেষ নাগাদ (১৬৮৩) ফাদার মার্কস আন্তোনিও সান্তচ্চি নামে একজন পাদ্রী গোয়া থেকে লিখেছেন যে, ওই সময়ে বাংলাদেশের পোর্তুগীজ ফাদারগণ বাংলা ভাষায় জ্ঞানলাভ করে ছোট ছোট খান কয়েক বাংলা বই রচনা করেন। তার মধ্যে বাংলা অভিধান সংকলন, ব্যাকরণ রচনা, প্রার্থনা পুস্তক ও খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক উল্লেখযোগ্য।[১]

ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পোর্তুগীজ রোমান-ক্যাথলিক পাদ্রীদের রচিত এই ধরনের কয়েকটি পুস্তকের রচনার কথা জানা যায়। কিন্তু মাত্র দুটো পুস্তক ও একটি শব্দতালিকা ছাড়া বাকিগুলো হয় ছাপা হয়নি, অন্যথায় বিনষ্ট হয়ে গেছে। বিনষ্ট না হওয়া পুস্তকের প্রথমটির নাম 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ,' দ্বিতীয়টি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'।

প্রথম পুস্তকটির রচনা কাল ১৭২৬ খৃস্টাব্দ বলে আম্বোকিয়ো নামে এক পোর্তুগীজ পাদ্রীর বিবরণীকে থেকে জানা যায়। তিনি ওই সময় ঢাকার গীর্জায় আন্তোনিওর ওই গ্রন্থের একটি পুঁথি দেখেছিলেন--পুঁথিটি বাংলায় লেখা, তার সঙ্গে পোর্তুগীজ অনুবাদও ছিল।[২]

১৯৩৮ খৃঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুঁথিটি ড. সুরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মূল পুঁথিতে কোন নাম না পেয়ে 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' নামকরণ করেন। তিনি পোর্তুগালের অ্যাভোরা শহরের গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত পুঁথি থেকে নকল করে আনেন।

গ্রন্থটির লেখক দোম আন্তোনিও দো রোজারিও। পুঁথিতে তাঁর সম্বন্ধে দুচারটে কথা বলা হয়েছে। তাতে জানা যায়, লেখক ভূষণার রাজপুত্র। মগদস্যুরা তাঁকে ধরে নিয়ে পালাবার সময় ফাঁদার মানোয়েল দো রোজারিও নামে একজন পোর্তুগীজ পাদ্রী তাঁকে উদ্ধার করেন। পরে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করে দোম আন্তোনিও দো রোজারিও নাম রাখেন। কালে সেও পাদ্রী হয়ে ওঠেন ও হিন্দুধর্মের অসারতা দেখিয়ে খৃস্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে প্রশ্নোত্তরমূলক পুস্তক রচনা করেন। বাংলা গদ্যের দুর্লভ প্রাচীন নিদর্শন রূপে এটি স্বীকৃত। অষ্টাদশ শতকের প্রথম পর্বে পাদ্রী মানোয়েল দো আসসুম্পসাম পোর্তুগীজ ভাষায় বইটির লিপ্যন্তর করেন।

১. পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন (১ম খণ্ড), সম্পাদক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
২. ১১৩ পৃঃ মধ্যে প্রথম ৮৩ ও শেষ ২ পৃষ্ঠা ছাপেন।

'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থে পূর্ববঙ্গীয় কথ্যভাষার উপাদান থাকলেও আগাগোড়া সর্ববঙ্গীয় সাধুরূপে লেখা।[১] এতে আছে পোর্তুগীজ পাদ্রীর সাথে একজন ব্রাহ্মণের নিজের নিজের ধর্মের ব্যাপার নিয়ে বাক্-বিতণ্ডা। পড়লে কেমন এক কৃত্রিম বা সাহেবী বাংলা রূপেরও সন্ধান মেলে। অবশ্য এই কৃত্রিমতা এসেছে পোর্তুগীজ হরফ থেকে বাংলায় রূপান্তর করতে গিয়ে। যেমন :

ব্রাহ্মণ। তোমি কারে ভজো? রোম। পরমেশরেরে পূর্ণোব্রমেরে। ব্র। তবে তোমোরা বরো উতম ভজোনা ভজো, আমোরা তাহারে ভজি। রো। যদি তোমোরা সেই পূর্ণোব্রমেরে ভজো তবে কেনো এতো কুবিত কুধরাণ নানা অধর্মো ভজোনা দেখি? ব্র। তুমি এমত গিয়ামন্তো হইয়া আমার দিগের পরমেশরেরে নিন্দা করহ? এহাতে তুমারদিগের শাস্ত্রে অপারনিমান নাহি? রো। আমারঘোর শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যেজন ধর্মো নিন্দা করে, সে বড়ো নারোকী এবং যেজন অর্ধমোরে ধর্মো বলে সে মহা নারোকী?

এখানে তোমি (তুমি), উতম (উত্তম), ব্রমেরে (ব্রহ্মেরে) এহাতে (ইহাতে), পরমেশরেরে (পরমেশ্বরেরে) ইত্যাদি শব্দগুলোর সাহেবী উচ্চারণ লক্ষণীয়। অথচ লেখক স্বয়ং বাংলার সন্তান এবং কিঞ্চিৎ সংস্কৃত জ্ঞানের অধিকারী।

এই রকম আর একটা সংলাপে লক্ষ্য করি কর্তুতধারী, তোলুনা, শতুর, প্রথিবী, বসোদেব, অগাসোর, বগাসোর, ক্রীরা, ছপর্ণো, যাধোবংশো, চোরি, গুনি, অবতীন্তো, মুর্তিখে প্রভৃতি বিকৃত উচ্চারণ দেখে একে বাংলা বলতে সন্দেহ জাগে। কেননা, এই শতকের পদ্যভাষার সুললিত ভাষারূপের পাশে এই গদ্যের রূপ একেবারে বেমানান। এমন কি এর আগে বা সমকালীন সময়ের চিঠিপত্র ও দলিলের ভাষায় গদ্যের চেহারা এর থেকে বহুগুণ গতিশীল বলে মনে হয়েছে। অথচ এই শতকের গদ্যে-পদ্যে আরবি-ফার্সির দাপটে ভাষার নাড়ি ছাড়ো ছাড়ো যেখানে, সেখানে 'সংবাদে' ভাষাকে লেখক অদ্ভুতভাবে দূরে রেখে দিতে সক্ষম হন। এই সংশয়ের উত্তরে বলতে হয়, 'হয় দোম আন্তোনিও বড় বেশি সাহেব হয়ে পড়েছিলেন, নয় মূল রচনার ভালো বাংলা ভাষা দুরূহ পোর্তুগীজ উচ্চারণ পদ্ধতির বাধা লঙ্ঘন করে লিপ্যন্তরিত করতে গিয়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।'[২]

তবে লিপ্যন্তরীকরণ করতে গিয়ে কোন কোন শব্দের বিকৃতি ঘটে যে দুরূহতার সৃষ্টি করেছে সেটা অনুমান করা শক্ত নয়। তার কারণ যেখানে মধুকৈটোর, বিষ্ণু, কামোদ্ভব, সৃষ্টি কমণ্ডুল, তপস্যা, পরশুরামো, অচৈতন্য, প্রতারণা জাতীয় তৎসম শব্দের প্রয়োগ পাই, তারই পাশে তোমি, তোলুনা, শতুর প্রথিবী, পুর্ণোব্রমো, ছপর্ণো, বসোদেব, চোরি, গুনি প্রভৃতি বিকৃত উচ্চারণ দেখে অবাক হতে হয়।

পুরো গ্রন্থটি সাধুভাষার আদর্শে লিখিত হলেও দুই বঙ্গের মুখের ভাষার উপাদান এতে দেখতে পাই। যথা ঃ

চলিত ক্রিয়া ।। দিন গেলে, শীতকাল গেলে, সর্বো কর্তা কোল্যো, নিতে কহিলেন, ধর্মাধর্মো না বুঝে।

চলিত সর্বনামপদ।। তোর।

কাব্যিক ক্রিয়া।। জ্বলিলে, জিজ্ঞাসিলা,

১. ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য দ্রষ্টব্য।
২. বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, ড. শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

গ্রাম্যশব্দ।। আমারদিগের, তোমার দিগের, তাহান, আমারঘোর, রাইত্রে, মুনিষ্যের, মৈধ্যে, জর্মে, পেরথিবির, দেওন, উতোর (উত্তর)।

তৎসম।। পরীক্ষা, পরলোক, জননী, পুণ্য, অযথার্থ, ললাটে, মস্তোক, নরলোক, নির্মল, কাম প্রভৃতি।

অর্ধতৎসম।। ধুগদো, নামান্তর, প্রতখ্যে, ত্রেলোক

তদ্ভব।। গোচোনা, নিখোন, মরু, পথ।

এছাড়া বেশ কিছু যুক্তব্যঞ্জন বা সমাসবদ্ধ-শব্দের প্রয়োগ রয়েছে, যথা—ধর্মাধর্মতোনুসারে, মহাপাতকাদি, জিতেন্দ্রিয়, কামাতুর, ভোগাভোগ প্রভৃতি।

ভাষায় বাক্‌রীতির ব্যবহারের দিক থেকে দুবঙ্গের কথ্যভাষার কিছু কিছু প্রয়োগ দেখা যায়। যথা :

পশ্চিমবঙ্গের বাক্‌রীতি।।

অনেক রাজা অনেক খানে, যে দেশ যে রাজা, চাকর নফরে করে, এক কৃষ্ণ এত গোপিনী, যশোদা যে কৃষ্ণের পেটে, ধর্মাধর্মো না বুঝে, তিনি সংসারী মাত্রো, সঙ্গদোষে মুখ নষ্ট, রজো গণে ব্রর্মোসৃষ্টি করেন, সত্যে গুণে বিষ্ণো পালন করেন, তমোগুণে শিব সংহার করেন, এই তিন কর্মো তিনে করেন ইত্যাদি।

পূর্ববঙ্গের বাক্‌রীতি।।

মুনিষ্যের মত কার্য্যে করোন উচিত, যশোদা ছাওয়ালের কালে মারিতে, বারীতে উঠানে দাবাইয়া দেখিলো, তোমার সঙ্কে গুচিবে, কেমতে ভজিবো, আমার এক যাত থাকিবা, তোমার জলে আমি তোষ্ঠো হইবো প্রভৃতি।

অতএব দেখা যাচ্ছে, 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদের' ভাষা সাধুরূপের উপর দাঁড়িয়ে, কিন্তু তবু এতে দুই বঙ্গের কথ্যরূপের উপাদান বর্তমান। তবে পশ্চিমবঙ্গের তথা সর্বজনীন চলিত ক্রিয়া ও সর্বনামপদের ব্যবহার খুব কম। আশ্চর্যের ব্যাপার যে এই কালের সাহিত্যের আরবি-ফার্সি শব্দের প্রভাব এতে নেই বললেই চলে। সেই তুলনায় বিকৃত সংস্কৃত বা অর্ধতৎসম শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট বেশি। বলা বাহুল্য পরবর্তীকালে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারে যে ভাষাভাবনার সন্ধান পাই 'সংবাদে' তার ক্ষীণ সংকেত দেখতে পেলাম।

পোর্তুগীজ ক্যাথলিক মিশনারীদের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'[১]। রচনা ১৭৩৪ খৃঃ, ছাপা হয় ১৭৪৩ খৃঃ লিসবনে। তবে ছাপার সময়ে রোমান হরফ ব্যবহার করা হয়। বাংলা ভাষায় রচিত এটাই প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। বইটার টাইটেল পৃষ্ঠায় লেখা আছে ঃ

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' শিষ্যগুরুর বিচার ফাদার মানুয়েল দ্য আসসুম্পসাঁও লিখিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন বেঙ্গালাতে ভাওয়াল দেশে, সন হাজার সাত শহ পঁয়ত্রিশ বছর, প্রকাশের স্থান অ্যাভোরা শহর।

সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে এটিও 'সংবাদের' মত প্রশ্নোত্তর মূলক। সংবাদে ব্রাহ্মণ ও পোর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীর বাদানুবাদ। এতে শিষ্য গুরুর বিচার। তবে এর লেখক খাঁটি পোর্তুগীজ এবং সেই জন্যে এতে প্রচুর অবাঙালি বাক্‌-ব্যবহার দেখা যায়।

১. গ্রন্থটির আরও দুটি সংস্করণের কথা জানা গেছে।

লেখক এক সময় ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলে থাকতেন। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' সেখানেই রচিত হয়। অতএব এতে ভাওয়াল অঞ্চলের উপভাষার প্রচুর উপাদান রয়েছে। তবু এই বইটা আগাগোড়া 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদে'র মত সাধুরূপেই লেখা। মধ্যে মধ্যে পোর্তুগীজ বাক্‌রীতির মত বাক্যপ্রয়োগ ও সেই ধরনের অনুবাদ। তাতে অনেক জায়গায় অর্থবহতা নষ্ট হয়নি।

আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় মন্তব্য করেন যে, প্রথমে বাংলা অক্ষরে লেখা হয়, পরে রোমান হরফে লিপ্যন্তরিত করা হয়। তার প্রমাণ লিবিয়া (libia), আছিল (axin), তিরাসের (Tiraxe) ইত্যাদি।[১]

তবে সাধুরূপের চেয়ে এখানে ভাওয়াল অঞ্চলের উপভাষার প্রয়োগ অনেক বেশি সার্থক হয়েছে। যথা :

'ফ্লান্দিয়া দেশে এক শিপাই বড় তেজোবন্ত আছিল, লড়াই করিতে করিতে বড় নাম তাহার হইল, এবং রাজায় তাহারে অনেক ধন দিলেন। ধন পাইয়া তাহার পিতামাতার ঘরে গেল। তাহার দেশে রাত্রে পৌঁছিল, তাহার এক বইন আছিল, তাহারে পন্থে লাগাল পাইল, ভাইয়ে বইনেরে চিনিল, তাহারে বইনে না চিনিল। তখন সে বইনেরে কহিল : তুমি নি আমারে চিন? না ঠাকুর, বইনে কহিল। সে কহিল, আমি তোমার ভাই। ভাইয়ের নাম শুনিয়া, উনি বড় প্রীত হইল, ভাইয়ে ঘরের খবর লইল, জিজ্ঞাসা করিল, আমারদিগের পিতামাতা কেমত আছেন? বইন, কহিল কুশল।)'.......

এতে গল্প বলার ঢঙ চমৎকার, ছোটো ছোটো বাক্যে পূর্ব বাংলার কথ্যভাষায় নানা ধরনের গল্প শুনতে শুনতে আমরা অবাক হই এই ভেবে যে, এত সহজ-সরস করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজি যুগের আগে বাংলা গদ্য যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' শাস্ত্রীয় তত্ত্বকথার অর্থভেদ করতে গিয়ে লেখকের এই গুণটিকে প্রসাদগুণ বলতে দোষ নেই। আর এখানেই মানোএলের কৃতিত্ব বেশি।

৪

কোম্পানির আমলে ছাপা আইনের অনুবাদ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলাদেশের শাসনভার চলে যাবার পর কোম্পানি তার বিলিতি কর্মচারীদের বাংলাভাষা শেখবার প্রয়োজন বোধ করে। ফলে বাংলা গদ্যে রচিত হয় একের পর এক ইতিহাস। বাংলা ব্যাকরণ রচনা, ছেনি কেটে বাংলা হরফের জন্ম এবং মুদ্রণ শিল্পের সূচনা—সবই ১৭৭৮ খৃস্টাব্দের ঘটনা।

এই নতুন কালের বিশ্বকর্মারা হচ্ছেন ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড (Nathaniel Brassey Halhed) স্যার চার্লস উইলকিন্স (Sir Charles Wilkins) এবং পঞ্চানন কর্মকার।

রাজকর্মচারীদের ভাষা শেখাবার সুবিধের জন্যে হ্যালহেড সাহেব লিখে দিলেন ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ (A Grammar of the Bengal Language)। সেটা ছেপে বের করার দায়িত্ব সরকারি ভাবে তুলে দেওয়া হল সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত উইলকিন্স

১. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ১১—১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সাহেবের উপর। তিনি ছেনি দিয়ে কেটে বাংলা টাইপ তৈরি করে দিলেন এবং হুগলির প্রেস থেকে ছেপে বার করা হল।

পরে তার কাছ থেকে টাইপ তৈরি শিখে নিয়ে পঞ্চানন কর্মকার কলকাতা ও শ্রীরামপুরের জন্যে প্রয়োজনীয় টাইপ নির্মাণ করে দেন।

উইলকিনস সাহেব এত ভাল সংস্কৃত শেখেন যে একসময় ভগবদ্‌গীতার ইংরাজি অনুবাদও করেন। ১৭৮৫ খৃঃ লণ্ডনে সেটা ছাপা হয়। তার এক বছর আগে প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষা ও সংগ্রহের জন্যে উইলকিনস সাহেব ও স্যার উইলিয়াম জোন্‌সের মিলিত চেষ্টায় কলকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলা গদ্যে এর পরের ইতিহাস আর এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের অপেক্ষায় ছিল। গদ্যের হাঁটি হাঁটি-পা-পা-র যুগে ছাপার অক্ষরে আইন বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ গ্রন্থ আমাদের বিস্মিত করে। আচার্য সুকুমার সেন মন্তব্য করেন, ধারাবাহিক বাংলা গদ্যে ওই তিনটে বই ছাড়া আর কোন বই প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়নি।[১]

এই কাজের ভগীরথ তথা প্রথম অনুবাদকের নাম জোনাথান ডানকান (Janathan Duncan)। তিনিও ছিলেন কোম্পানির এক কর্মচারী। কোম্পানির সিবিলিয়ান হয়ে তিনি কলকাতায় আসেন এবং ১৭৭২ খৃঃ থেকে একটানা ষোল বছর কাটান। এর মধ্যে তিনি বাংলা ভাষা ভাল করে রপ্ত করে নেন। সেজন্যে তৎকালীন গভঃ জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে প্রসিদ্ধ, 'ইম্পে কোড'-এর অনুবাদের কাজে নিযুক্ত করেন। ১৭৮৪ খৃঃ কলকাতায় তাঁর সেই অনুবাদ বই ছেপে বের হয়।

তারপর ১৭৮৮ খৃঃ বারানসীর রেসিডেন্ট সুপারিন্টেনডেন্ট হয়ে তিনি চলে যান। সাত বছর কাটানোর পর সেখান থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বোম্বাই-এর গভর্ণর ছিলেন।[২]

দেওয়ানি আদালতের আইন বিষয়ক জোনাথানের অনুবাদ বাংলা অক্ষরে ছাপা সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ গদ্য বই।[৩] বইটার নাম 'রেগুলেশানস ফর দি এডমিনিস্ট্রেসন অব জাস্টিস ইন দি কোর্ট অব দেওয়ানি আদালত।'[৪]

গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৫+৩১ অর্থাৎ ২৪৬। শেষ ৩১ পৃষ্ঠা জুডিশিয়াল রেগুলেশনের Supplement রূপে সংযোজিত।

বইটার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

বাংলা গদ্য-অনুবাদের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা ইংরাজিতে মুদ্রিত। বইটি দ্বিভাষিক। দ্বিতীয়, প্রচ্ছদ থেকে গ্রন্থে পৃষ্ঠা গণনা শুরু করা হয়েছে। তৃতীয়, ছাপায় সেকালের হরফের চিহ্ন। যথা 'র' এর বদলে 'ব' (পেট কাটা 'ৰ'), 'ন' হিন্দীর এর মত। 'ধ' বোঝানো হয়েছে 'ব' এর মাথায় শূন্য (বঁ) দিয়ে, বাংলা '৬' (ছয়) এর মত 'ভ'. 'ং' অনুস্বরে কেবল শূন্য দিয়ে দেখানো হয়েছে (= যথা এব)।

১. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, সজনীকান্ত দাস, ৩৯-৪০ পৃঃ।
৩. ঐ, ৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
৪. কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে এর প্রথম মুদ্রিত একটি কপি পেয়েছি। সমালোচক শ্রীসজনীকান্ত দাস কেন এদেশে এর দর্শন পাননি, জানি না। (বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, ৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

চতুর্থ, ভাষায় অনেক জায়গায় ইংরাজি শব্দ অবিকৃত কিংবা কিছুটা বিকৃত করে শব্দভাণ্ডার বাড়ানো হয়েছে। যথা: গবনর জেনরেল, কৌসলি, দিক্রি, কমিটে, আপরিল ইত্যাদি।

পঞ্চম, একমাত্র বিশেষ বিশেষ স্থানে পূর্ণচ্ছেদে দাঁড়ি চিহ্ন ('।') ছাড়া আর কোন চিহ্নের প্রয়োগ নেই। ফলে বহু ক্ষেত্রে গোটা একটা প্যারার শেষে দাঁড়ি চিহ্ন দেওয়া হয়েছে—যেখানে হয়ত অনেকগুলো বাক্য পর পর আছে।

ষষ্ঠ, একই শব্দের পুনরাবৃত্তি দুই সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

সপ্তম, প্রথম পূর্ণাঙ্গ একটি নতুন বিষয়ের গদ্য-অনুবাদ সাধুরূপে করা হয়েছে, তবে প্রাঞ্জল গদ্য। বক্তব্য প্রকাশে জড়তা খুব কম। যথা :

'সদর দেওয়ানি আদালতে যদি কোন আপিলের বিষয়তে এমত জানা জায় যে মফস্বল আদালতে সে বিষয়ের সামুদায়িক বিচার হয় নাহি কিম্বা আর কোন কারণ জন্যে সদর দেওয়ানি আদালতে যদ্যপি উচিত বুঝেন তবে নুতন সাক্ষী যে আবশ্যক হয় তাহা লইয়া আপিলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন অথবা সেই বিষয়কে আজ্ঞাপত্র সম্বলিত পুনশ্চ সেই মফস্বল আদালতে পাঠাইবেন' (পৃঃ ১৯০/৯১)

ভাষায় বক্তব্য প্রকাশে অনুবাদক কোথাও কোন বাধার মুখোমুখি হয়েছেন বলে মনে হয়নি। সরল সাধুভাষায় আগাগোড়া অনুবাদ করা হয়েছে। আশ্চর্য হয়ে যাই এই ভেবে যে, প্রথম চেষ্টায় অনুবাদককে অযথা বাংলা শব্দচিন্তায় বেগ পেতে হয়নি। সাবলীল গদ্য। এতে না আছে জড়তা না আছে ভারি ভারি শব্দের আড়ম্বর। উপরের দৃষ্টান্তটির মধ্যে থেকে ক্রিয়াপদগুলো বদল করে দিলেই এই ভাষারূপকে কথ্য বলে চালানো যেতে পারত, এটাই এর বিশেষত্ব।

বইটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য অনুবাদকের অনুবাদ কর্মের স্বাধীনতা। কেন না, আইনের মত সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়কে অনুবাদক ইংরাজির হুবহু নকল না করে বিষয়টিকেই কেবল সরল গদ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন, যথা—

'The Judges of the Mofussil Dewannee Adauluts, respectively, may appoint the native officers thereof; Conformably to their respective establishments; except the Naibs of the Nazirs, and except the Mirdahs and the peons;' (৫ম ধারা)

এই অংশের বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে .

'মফস্বল দেওয়ানি আদালত সকলের ব্যবস্থাপক সাহেবেরা নাজিরের নায়েব ও মৃধা ও পেয়াদা ব্যতিরেক আর সকল এদেশীয় আমলা লোক আপন আপন স্বেচ্ছামতে রাখিতে পারিবেন'; (পৃঃ ২২)

'and may, from time to time, remove any such officer, and may, from time to time, When any Vacancy shall happen, appoint any other person duly Oualified, to the office Which shall become Vacant.' (৫ম ধারা)

অনুবাদ :

'এবং তাহার দিগের মধ্যে যাহাকে উচিত বুঝেন ছাড়াইয়া তাহার বদলে আর উপযুক্ত লোক আপন বিবেচনা মত রাখিতে পারিবেন।' (পৃঃ ২২)

দেখা যাচ্ছে, বাংলা অনুবাদে অনুবাদক বাংলা গদ্য ভাষার নিজস্ব স্বভাবের উপর নির্ভর করেছেন। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে কোথাও মূলকে পুরো অনুসরণ করেন। কোথাও নিজের ইচ্ছেমত অর্থ অনুযায়ী অনুবাদ করেছেন।[১] কিন্তু কোথাও ভাষাকে বিষয় ভারগ্রস্ত করে তোলেননি।

তাই দেখতে পাই, 'বড় সাহেব' হলেন Judges, 'কচহরি,' = Court, Company = কম্পানি, সিরিস্তাদার সাহেব = Registar of the Court, সাক্ষাৎ সাক্ষী = viva Voce, উকিল = Vakeel, তলব = order = আজ্ঞা = authorised rule; সম্ভ্রান্ত সাক্ষি = good and authentic Evidence সীমা সরহদ্দের মধ্যে = to their local Jurisdiction, প্রকাশ্যমান স্থান = Conspicious place, আমলা = native officer, আদালতের দিন = on Court days, সমস্ত লোকের সাক্ষাৎ = in open Court, হিসাব = Account, কর্জ = Dabits, সওয়াপত্র = Contract, Partnership = অংশাংশ ইত্যাদি।

জোনাথনের ভাষার আর একটি বিশেষত্ব সাধুগদ্যে কথ্য-উপাদানের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। যথা—কথ্য বা আঞ্চলিক ক্রিয়াপদ :

১ সেই চিঠি নাজিরের নামে লেখাজাবেক

২ চলন হবেক

৩ না পারিবেক

৪ আদালতের দিক্রি হওন ও নকল পাওনের কিম্বা দিতে চাহনের

৫ লেখা গেল

তাছাড়া যথেষ্ট কথ্যবাক্‌রীতির সাক্ষাৎ পাই। যেমন

১ আমি অমুক আপন সাধ্য মতে,

২ পহুছিলেন সাতরোজের মধ্যে,

৩ কিম্বা কোন ছল,

৪ তিনগুণ গুনাহগারি দিতে হবেক,

৫ সদর দেওয়ানি আদালতে যদি কোন আপিলের বিষয়তে—ইত্যাদি।

ডানকানের ভাষার উল্লেখযোগ্য বিষয় আরবি-ফার্সির কবল থেকে গদ্যকে স্বকীয়তা দান করা হয়েছে। সেজন্যে তিনি বহু গ্রাম্যশব্দ যেমন ব্যবহার করেন—তেমনি প্রয়োজন মত ইংরাজি শব্দও অবিকৃত রেখেছেন। এখানে তাঁর ব্যবহৃত নানা জাতীয় শব্দের তালিকা দিচ্ছি। যথা :

আরবি-ফার্সি : দেওয়ানি, সদর, আদালত, মফস্বল, ইনসাফ, নাজির, নায়েব, মৃধা, পেয়াদা, সরহদ্দ, উকিল, সাহেব, সিরিস্তদার, হাকিম প্রভৃতি।

১. ভূমিকা দ্রষ্টব্য (৩—৫ পৃঃ)।

ইংরাজী শব্দ : গবনর জেনরেল, কৌসলি, কম্পানী (কোম্পানি) দিক্রি, আগস্ত, অক্তোবর, আপরিল, মার্চ, এপরিল, কমিটে প্রভৃতি।

নীল বেঞ্জামিন এডমনস্টোন

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আর একজন সিবিলিয়ানও জোনাথান ডানকানের ছ'বছর পর (১৭৯১ খৃঃ) আর একটি আইনের অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। ওই অনুবাদ 'বেঙ্গল ট্র্যানস্লেশন অব রেগুনেশন ফর দি এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস, ইন দি ফৌজদারি অর ক্রিমিন্যাল কোর্টস, ইন বেঙ্গল, বেহার এণ্ড ওড়িষ্যা', (১৭৯১ খৃঃ) নামে এই অনুবাদ বইটিও কলকাতার দি অনারেবল কোম্পানির প্রেস থেকে মুদ্রিত।[১]

পার্লামেন্টের সদস্য স্যার আর্চিবল্ড এডমনস্টোনের পুত্র উপরোক্ত আইনের অনুবাদক।[২] ১৭৬৫ খৃঃ জন্ম। ১৭৮০ খৃঃ সবিলিয়ান রূপে কলকাতায় আসেন। তারপর সেক্রেটারিয়েট থেকে সরকারি ফার্সি-অনুবাদক, সেখান থেকে গভর্ণর জেনারেলের একান্ত সচিবের পদ অলংকৃত করেন। পরে ১৮১২ খৃঃ থেকে ছ-বছর সুপ্রিম কাউনসিলের সদস্য এবং শেষে ১৮২০ খৃঃ কোম্পানির একজন পরিচালকও নিযুক্ত হন। ১৮৪১ খৃঃ ৪ঠা মে তাঁর মৃত্যু হয়।

এডমনস্টোনের ভাষা ডানকানের তুলনায় অনেক বেশি আরবি-ফার্সি ঘেঁষা, দুরূহ ও দুর্বল[৩]। যথা :

'সেওয়ায় মহালাত মুতালুকে সহর মুরসিদাবাদ ও আজিমাবাদ ও জাহাগির নগর জে এই তিন মোকামে আদালতের সিরিস্তা আলাহিদা মোকরর হইল আর এই তিন আদালতের এলাকার সরঈ সাহেব জিলাদিগের তজবিজমতে হইবে মঞ্জুর হইল এবং সেওয়ায় সহর কলিকাতা জেবড় আদালতের তাবে আছে জারি থাকিবেক—'

অথবা আর এক জায়গায় :

'সকল ফেরকার লোককে রক্ষা করা হাকিমের কত্তর্ব্য কর্ম বিশেসত তাহাদিগে জাহারা সহজেই অত্যন্ত দুস্থ্ পেটার তালুকদারান ও রায়ত লোক ও আর খেত আবাদ করণওয়ালা দিগের ভালর নিমিথ্যে ও রক্ষা করিবার নিমিথ্যে নবাব গবর্ণর জানরেল বাহাদুর জখম, মনাছেব বুঝেন আইন করিবেন'—

এ অত্যন্ত দুর্বল ও দুরূহ গদ্য। এই ভাষার বারোয়ানা শব্দই আরবি-ফার্সি। মনে হয় অনুবাদক এডমনস্টোনের ফার্সি ভাষায় দক্ষতার জন্যে বাংলা অনুবাদে সেই মানসিকতার বড় ছাপ পড়েছে। এ গদ্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাহেবী গদ্যের চেয়েও নিকৃষ্ট।

হেনরি পিটস ফরস্টার (১৭৬৯–১৮১৫)

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আর একজন ইংরেজ সিবিলিয়ান আইনের বাংলা গদ্য অনুবাদক রূপে পরিচিত। এই তৃতীয় অনুবাদকের নাম Henry Pitts Forster, ১৭৬৯ খৃঃ

১. এই সংস্করণের কোন বই আমি জাতীয় গ্রন্থাগার, এসিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ল কলেজ এবং সাহিত্য পরিষদের তালিকায় পাইনি। এমনকি লণ্ডনে অবস্থিত ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতেও নেই বলে জানানো হয়েছে।

২. বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, সজনীকান্ত দাস, পৃঃ ৪১।

৩. ঐ।

জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৮৩ খৃঃ মাত্র বাইশ বছর বয়সে কোম্পানির সিভিলিয়ান হয়ে কলকাতায় আসেন। তারপর দশ বছর পর ত্রিপুরার কালেকটর ও পরের বছর চব্বিশ পরগনা জেলার দেওয়ানি আদালতের রেজিস্টার নিযুক্ত হন। ১৮১৫ খৃঃ ১০ ডিসেম্বর ফরস্টার কলকাতায় মারা যান। কোথায় তাঁকে কবর দেওয়া হয় জানা যায়নি।[১]

তাঁর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শ্রীযুক্ত নবাব গভর্ণর বাহাদুরের হজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন' বা সংক্ষেপে 'কর্ণওয়ালিস কোডের' (Cornwalles Code 1793) গদ্য অনুবাদ এবং 'এ ভোকেবুলারি ইন টু পার্টস ইংলিশ অ্যাণ্ড বেঙ্গলী, অ্যাণ্ড ভাইস ভার্সা', ১৭৯৯ খৃঃ প্রকাশিত। অভিধানমূলক দ্বিতীয় বইটা ছিল সে আমলের সাহেবদের ভাষা শেখার 'গাইড' বই। তাছাড়া ফরস্টার একটা সংস্কৃত ব্যাকরণও রচনা করেন (১৮১০ খৃঃ)।[২]

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারায় ফরস্টারের গদ্য যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। অথচ অনেক সমালোচকই ডানকানের মত তাঁকেও পাদটীকার বিষয় বলে মনে করেছেন। অথচ ফরস্টারের গদ্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজিয় গদ্য থেকে অনেক উন্নত।

ফরস্টারের 'কর্ণওয়ালিস কোডের' অনুবাদ ১৭৯৩ খৃঃ কলকাতায় ছাপা হয়। পরবর্তী কালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকেও আরও দুটি সংস্করণ ছাপা হয়। এই অনুবাদের মূল সংস্করণ বর্তমানে কলকাতার কোন গ্রন্থাগারে নেই। তবে কিছু অংশ আচার্য সুকুমার সেনের নিজস্ব সংগ্রহে আছে। তাছাড়া লণ্ডনে অবস্থিত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতেও মূল সংস্করণের একটি বই আছে।

মূল সংস্করণের অথবা আদি পাণ্ডুলিপি থেকে নকল করা দ্বিতীয় আইনের কিছু অংশ তুলট কাগজে লেখা ১৬টি পৃষ্ঠার একটা পুঁথি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথি সংগ্রহশালায় (সংখ্যা ৪০৫২) রক্ষিত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগ থেকে ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। গ্রন্থের নামকরণ করা হয় 'দুশ বছরের পুরানো বাংলা গদ্য পুঁথি।'

অজ্ঞতাবশত সম্পাদক এটির অনুবাদকের নাম উল্লেখ করতে ব্যর্থ হন। কারণ পুঁথিটির কোথাও অনুবাদকের নাম নেই। তাই তিনি একে, সরকারি প্রয়োজনে পেশাদার অনুবাদকের কর্ম বলে মন্তব্য করেন। এমনকি সম্পাদকের সন্দেহও হয়নি যে, এটা ১৭৯৩ সালের একমাত্র ইংরেজ অনুবাদক ফরস্টারের অনূদিত কিনা। অথচ ঐ সময় সরকারি প্রয়োজনকে সিদ্ধ করতে ফরস্টার ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি বা পেশাদার অনুবাদক, কেউ ছিলেন কিনা জানা যায় না। অথচ মূল ছাপা সংস্করণের অনুবাদে প্রতিটি Code-এর শেষে ইংরাজিতে অনুবাদকের নাম লেখা আছে।[৩]

এই ভুল তথ্যের ওপর নির্ভর করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তথাকথিত পেশাদার অনুবাদককে একজন বাঙালি পণ্ডিতের অনুবাদ বলে মন্তব্য করেছেন।[৪] পরে প্রকাশিত আর একটি

১. Dr S. K. Dey, Bengali Literature In the Nineteenth Century, p. 80

২. ঐ

৩. চিত্র দেওয়া হল।

৪. পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন (১ম খণ্ড), ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

গবেষণা গ্রন্থেও ঐ পুঁথির উপর হাস্যকর মন্তব্য আছে।[১] 'দেশ'-পত্রিকায় একটি লেখায় আমি তার ইঙ্গিত দিই।[২]

গদ্য পুঁথিটির ভাষা বিচার করলে অষ্টাদশ শতকের কোন বাঙালি গদ্য লেখকের কাছ থেকে কোন মতেই এই জাতীয় সাহেবী বাংলা আশা করা যায় না। যেমন--

চাশ, চাস, বিসএ, জে, সক্তি, জদি, জায়, জাবদিয়, চিঁটী, নদি, বেক্তি, উভএর, আপাত্য, স্নেৎসা, জস্য, মর্জ্যোদার, নিষ্পত্য, প্রবত্ত (প্রবৃত্ত), দুভক্ষ, মসাহেরা (মাসোহারা), প্রকত (প্রকৃত) ইত্যাদি শব্দগুলো কি কোন বাঙালি পণ্ডিতের?

দ্বিতীয়, ১৭৯৩ খৃঃ আইনের বাংলা অনুবাদকের মধ্যে কেউ বাঙালি ছিলেন বলে জানা যায় না। তেমন কোন ইংরাজিনবিশ বাঙালি অনুবাদক থাকলে ডানকান এডমনস্টোন ফরস্টারের কাছাকাছি না হোক পাদটীকায় নিশ্চয়ই স্থান পেতেন।

তবে শ্রদ্ধেয় সমালোচক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্যটিকে অন্যভাবে গ্রহণ করা যায়। ফরস্টারের বাংলা গদ্য বেশ প্রাঞ্জল, সহজবোধ্য ও আঞ্চলিক ভাষার উপাদানে গঠিত। এই সরলতা ও প্রাঞ্জলতার দিক থেকে ফরস্টারের গদ্যকে কোন বাঙালির ভাষার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

বলা বাহুল্য, পরবর্তীকালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অনেক বাঙালি গদ্য লেখকদের হাতে যে গদ্য দেখি, ফরস্টারের ভাষা তাদের চেয়ে উন্নত ও শক্তিশালী। এখন তাঁর ভাষার প্রমাণ নেওয়া যাক। ১৭৯৩ সালের দ্বিতীয় আইনের ৬ ধারা থেকে তুলে দিচ্ছি :

'সকল জেলার কালেকটর সাহেবেরা আপনারদিগের কার্য্য চলনের রোজনামা অর্থাৎ প্রতিদিনের বিবরণ ইংরেজি কিম্বা পারসি অথবা বাঙ্গালা ভাষায় লিখাইয়া আপনার দিগের স্থানে রাখিবেন এবং জে সময় জে ব্যাপার করেন তাহা তৎখনাতেই সেই রোজনামায় লেখাইয়া তাহাতে আপন২ দস্তখত করিবেন। ইতি'—

আগাগোড়া সহজ সাধুভাষায় লেখা। বক্তব্য বিষয়কে প্রকাশ করতে অনুবাদকের কোথাও কোন বেগ পেতে হয়নি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের গদ্যের চেয়ে এ গদ্য যথেষ্ট শক্তিশালী।

বর্ণ রূপের মধ্যে পুরাতন 'ঢঙ' বর্তমান।

যেমন 'র' = ৰ (পেটকাটা ব)

০ = ং (শূন্য দিয়ে অনুস্বর)

ন = ল (হিন্দীর মত)

তাছাড়া গোটা অনুবাদে লম্বালম্বা ইংরাজি বাক্যের মত বাংলা গদ্যে বাক্যের প্রয়োগ। তবে অনেক জায়গায় মাঝে মাঝে বিরামচিহ্ন দিয়ে আলাদা করে বোঝানো হয়। ডানকানের মত ফরস্টারও অনুবাদে স্বাধীনতা গ্রহণ করেন। ফলে, ভাষায় দেশি ও বিদেশি শব্দের মেলা বসেছে। কোথাও অনুবাদক নিজেই শব্দ সৃষ্টি করে নিয়েছেন। এই দিক থেকে তিনি যে

কোন বাঙালি গদ্য লেখকের অনেক কাছের শিল্পী।[১] যথা : Police এর অনুবাদ পুলিশ রাখা হয়েছে। আবার থানাবন্দী শব্দও সৃষ্টি করে নেন, চলিত ভাষা বোঝাতে লেখেন' চলনভাষা (সে স্থানের চলনভাষা)। আবার Dairy অনুবাদে রোজনামা তথা ফারসি ভাষার দ্বারস্থ হয়েছেন।

অনুবাদ কর্মে ফরস্টার যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তিনি ডানকান সাহেবকেও পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পেরেছেন। যথা—

"In the event of death, or removal, of a Collector, or of his absence from his station, the sinior assistant on the spot is to perform the duties of Collector, and the dewan and the public officers of the Collectorship are accordingly to obey his orders."

ফরস্টার অনুবাদ করেন, 'কালেকটর' দৈঁবাধিন মরিলে কিম্বা সাক্ষাৎ না থাকিলে অথবা আপনি কার্য হইতে স্থানান্তরে গেলে তথাকার এশিটেনশ অর্থাৎ ছোট সাহেবদিগের মর্দ্দে জে কেহ অগ্রগণ্য থাকেন সেই সাহেব কালেকটার সকল কার্য্য করিবেন এবং এ প্রকারে দেওয়ান প্রভৃতি আমলারা সেই এশিটেনশ সাহেবের তাবে রহিয়া তাহার হুকুমতে বিষয় ব্যাপার চালাইবেন। ইতি"—(চতুর্দশ ধারা)

অনুবাদক কত সহজে বাংলা ভাষার স্বকীয়তার উপর দাঁড়িয়ে অনুবাদের কলম চালিয়েছেন। তাই In the event of death —হয়, দৈঁবাধিন মরিলে ; In the event of removal —হয়, সাক্ষাৎ না থাকিলে ; The sinior assistant of the spot হলো, তথাকার এশিটেনশ অর্থাৎ ছোট সাহেবদিগের মর্দ্দে জে কেহ অগ্রগণ্য থাকেন ; কিংবা the dewan...to obey his orders হয়, 'দেওয়ান প্রভৃতি আমলারা...তাবে রহিয়া তাহার হুকুমতে বিষয় ব্যাপার চালাইবেন।'

গদ্যের হাঁটি—হাঁটি পা-পা-র যুগে ফরস্টারের বাংলা অনুবাদের এমন নিটোল রূপ বাংলা গদ্যের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লিখে রাখার ব্যাপার।

চলিত রূপের দিক থেকে ফরস্টারের এই সাধুগদ্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, পরবর্তী পর্যায়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজিয় সাধুতার চেয়ে এ গদ্য অনেক বেশি সরল সচল ও দুরূহ শব্দহীন ও গতিময়। এর সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলো বদলে দিলেই একে চলিত রীতির বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। এখানেই ফরস্টারের গদ্যের বৈশিষ্ট্য। দুটি একটি ক্রিয়ার রূপেও চলিত উপাদান পাই। যেমন: না হতে, দাঁড়চ্ছিল, স্থানান্তরে গেলে প্রভৃতি।

ফরস্টারের কোন মৌলিক অবদান নেই, তবু তাঁকে আমরা গদ্যের আলোচনায় বাদ দিতে পারিনি। আইনের অনুবাদ ছাড়াও তাঁর আরও দুটি অভিধান আছে, একটি ইংরিজি-বাংলা, অন্যটি বাংলা-ইংরিজি। মানোয়েল (১৭৪৩) ও আপজন (১৭৯৩) সংকলিত অভিধানের চেয়ে ফরস্টারের অভিধান আদর্শ-স্বরূপ এবং আধুনিক। সংস্কৃতকে ভিত্তি করেই তাঁর অভিধান সংকলিত। তাঁর চেষ্টা ও উদ্যোগের জন্যেই বাংলাভাষা সরকারি ভাষার মর্যাদা পায় এবং বাংলা ভাষাতেই পঠনপাঠন শুরু করার শিক্ষার মাধ্যম বলে গৃহীত হয়।[২]

৬৯ ধারা——

বোর্ড রিবিনিউর প্রধান সাহেব যে কালে পীড়া জন্য কিম্বা যদর কার

ঐ বোর্ড বৈঠকের দিনে তথায় উপস্থিত হইতে নাপারেন তাহা

তাহার শক্তি আছে যে সে দিনের বৈঠক তাহার আগামী বৈঠকের দি

পর্য্যন্ত মৌকুফ করেন। কিন্তু ঐ প্রধান সাহেবকে হুকুম নাই

নিরার্য্য দুইদিন উপরাউপরী বৈঠক মৌকুফ করেন অবধার্য্য দ্বিতী

দিনের বৈঠকে উপস্থিত নাহইতে পারিলে ঐ বোর্ডের অন্য যে সাহেবে

হাজীর থাকেন তাহার মধ্যে যে সাহেব অগ্র গণ্য হয়েন সেই সাহে

সে বৈঠকে ঐ প্রধান সাহেবের স্থানে স্থিত অর্থাৎ স্বরূপ হইবেন ইতি

৭০ ধারা——

বোর্ড রিবিনিউর প্রধান সাহেবকে যে সকল শক্তি সমর্পণ আছে তা

তাঁহার স্থানে স্থিত সাহেবকে ভার হইবেক এবং ঐ প্রধান সাহে

পীড়িত জন্য কিম্বা কারণান্তরে অসাক্ষাৎ হইলে সে কালে ঐ বোর্ডে

অন্য যে সাহেবেরা সাক্ষাৎ থাকেন তাহার মধ্যে যে সাহেব অগ্রগন্য হয়ে

সেই সাহেব ঐ প্রধান সাহেবের স্থানে স্থিত হইয়া প্রধান সাহেব মৌজুদে

হতে তাঁহার কর্ত্তব্য সকল কার্য্যের পর্য্যবশাণ করিবেন ইতি——

তামাম——

A True Translation,
H. P. FORSTER.

ফস্টারের 'কর্ণওয়ালিস কোডে'র একটি পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাঠ্য পুস্তকীয় গদ্যের জন্ম

(১৮০০–১৮১৫)

১৮০০ সালের শুরু থেকে বাংলা গদ্যের দ্বিতীয় যুগের সূচনা। কেন না, এখান থেকেই সাহিত্যিক গদ্য ও পাঠ্যপুস্তকের গদ্যের উদ্যোগ। অল্পকাল আগে ১৭৯৯ খৃঃ ১৩ অক্টোবর ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির দ্বিতীয় দলের শ্রীরামপুরে আগমন। তারপর নতুন ভাবে ধর্মপ্রচারের জন্য মিশন কর্তৃপক্ষ বাংলা ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ও খৃস্ট-মহিমা বিষয়ক কাব্য ও নিবন্ধ প্রচারে নেমে পড়েন।

এসব কাজ পরবর্তীকালে যাঁর নেতৃত্বে বটগাছের মত বিরাট কর্মযজ্ঞে রূপ নেয়, সেই উইলিয়াম কেরি শ্রীরামপুরে আসেন ১৮০০ সালের ১০ জানুয়ারি। সাথী ছিলেন জন টমাস (John Thomas) নামে আর এক বন্ধু ও রাজ কর্মচারী। তারপর জমি সংগ্রহ, ব্যাপটিস্ট মিশন ও ছাপাখানার পত্তন হয় ধাপে ধাপে দ্রুতলয়ে।

ইতিপূর্বে টমাস আর একবার কলকাতায় আসেন। তাঁর বেশি আগ্রহ ছিল বাংলা ভাষার উন্নতি ঘটানো। তাই রামরাম বসু নামে এক বাঙালি মুন্সীর সহায়তায় তিনি কিছুকাল বাংলা চর্চা করেন। কিন্তু পরে তাঁকে লণ্ডনে ফিরে যেতে হয়। দ্বিতীয়বার কেরিকে সপরিবারে কলকাতায় আনেন, আর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথেই শ্রীরামপুরে কাটান। বাংলা গদ্যভাষার উন্নতির জন্যে তিনি কেরির মত একজন যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে আনেন, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

শ্রীরামপুর মিশনে যোগদানের পর কেরিই হলেন প্রধান। সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ড (William Ward) ও জেশুয়া মার্শম্যান (Joshue Marshman)।

ছাপাখানা পত্তনের পর খৃস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এখান থেকে খৃস্টমহিমা বিষয়ক কিছু বই ছাপা শুরু হয়। সেজন্যে গোড়া থেকেই বাইবেলের বাংলা অনুবাদের কাজে হাত দেওয়া শুরু হয়।

১৮০১ সাল থেকে মিশনের মুদ্রাযন্ত্রে বাইবেলের প্রথম খণ্ড নিউ টেস্টামেন্ট একখণ্ডে এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট ১৮০২ সাল থেকে ১৮০৯ সালের মধ্যে চারখণ্ডে অনুবাদ করে ছাপানো হয়। ছাপার কাজে বাংলা হরফ তৈরির জন্যে প্রথমে হুগলির পঞ্চানন কর্মকারকে নিয়োগ করা হয়। পরে মনোহর এসে দায়িত্ব নেন।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে নিউ টেস্টামেন্ট ও ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম অংশ ছাপা হবার (১৮০১ সাল) মাস কয়েক আগে ১৮০০ খৃঃ মে মাসে Gospel of St. Mathew–র অংশ মূল গ্রীক থেকে বাংলায় 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর' নামে অনূদিত হয়ে বের হয়। এটাই এই মিশনের প্রথম ছাপা বই।[১]

এই পুস্তকের গদ্যে ক্রিয়ার ব্যবহার সাধুরূপে দেখানো হয়। অপরাপর শব্দ প্রয়োগের ব্যাপারে আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় কিছু বিশেষত্বের কথা[২] উল্লেখ করে একে তত্ত্বব শব্দ

১. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ড. সুকুমার সেন, ১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. ঐ, ঐ

বহুল কথ্য ভাষানুযায়ী এক প্রকার সহজ রূপের কথা বলেছেন। যথা :

'সে দিনে যেশু ঘর হইতে যাইয়া বসিলেন সমুদ্রের তিরে। এবং হেন বড় মানব্য একত্তর হইল তাহার স্থানে তাহাতে তিনি জাহাজে যাইয়া বসিলেন ও সকল মানব্য তটের উপরে ডাণ্ডাইল। এবং তিনি হিৎ উপদেশে কহিলেন অনেক বিষয় তাহার দিগের বলিয়া দেখ এক বীজ বুনক বীজ বুনিতে গিয়াছে।...বুনিতে বুনিতে কিছু পড়িল পন্থের পার্শ্বে ও পক্ষেরা আসিয়া তাহা গ্রাস করিল। কতক পড়িল পাযাণ স্থলে বিস্তর মৃত্তিকা নহে ও ততক্ষণে তাহা গাছিল একারণ তাহার মৃত্তিকার গভীরতা নহে। কিন্তু সূর্য্য উদয় হইলে তাহা পুড়িল ও তাহার সিকড় না হওনের কারণ সুষ্ক ভাব হইয়া গেল। কতকও পড়িল কণ্টক গাছের মধ্যে এবং কণ্টক গাছের বৃদ্ধি হইয়া তাহা খাইয়া ফেলাইল।'

ভাষায়--'যাইয়া বসিলেন, হইল, গিয়াছে, পড়িল, করিল' প্রভৃতি সাধু ক্রিয়ার ব্যবহার রয়েছে। 'আবার না হওনের, ফেলাইল' ইত্যাদি আঞ্চলিক ক্রিয়ার রূপও বর্তমান। তৎসম শব্দের বানান অর্ধতৎসমের মত। যথা--ঘৃণা, ঘেন্না, একত্তর, অন্যাসন (অন্বেষণ) আকর্ষিৎ, পক্ষ ইত্যাদি।

'মঙ্গল সমাচার মাতিউর' বইটার অনুবাদের কাজে বা সংশোধনের ব্যাপারে রামরাম বসুর কতকটা হাত আছে। বাইবেলের অনুবাদে ও রামরামের রচনায় কিছু কিছু শব্দ প্রয়োগের সাদৃশ্যের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[১]

শ্রীরামপুর ও কলকাতা থেকে ধর্মপুস্তক বা বাইবেলের অনেকগুলো সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক বারে ভাষায় মাজা-ঘষা রূপ দেখা যায়। তৎসম শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক বাড়ে।

২.

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের রচনা

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নবাগত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশিয়দের সঙ্গে কাজের সুবিধার জন্যে দেশিয় ভাষা শিক্ষা দানের জন্যে ১৮০০ সালে কলকাতায় উইলিয়াম কেরির নামে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গঠিত হয়। পরের বছর এখানে বাংলা বিভাগ খোলা হয়।[২] সেই বিভাগের অধ্যক্ষ হলেন কেরি। দুজন পণ্ডিত ও ছজন সহকারী নিয়ে শুরু হয় বাংলা বিভাগ। পণ্ডিত দুজন হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাচস্পতি। সহকারীরা হলেন শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দ চন্দ্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসু। সিভিলিয়ানদের পড়াতে গিয়ে কেবি বাংলা গদ্য গ্রন্থের অভাব দেখে তিনি ১৮০১ থেকে ১৮১৫ খৃঃ পর্যন্ত নিজে ও কলেজের পণ্ডিত ও সহকারীদের উৎসাহিত করে তেরটা গদ্য বই ছাপিয়ে বার করলেন। এই ভাবেই উনবিংশ শতকের সূচনায় বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাতরূপে পাঠ্য গদ্য পুস্তকের আবির্ভাব ঘটলো।[৩]

কেরির মত একজন বিদেশিয় পাদ্রীর নিষ্ঠায় ও কলেজের ব্যয়ে কলেজের পণ্ডিত মুন্সীদের লেখা গদ্যবই ছাপিয়ে বের করা সেকালে অসাধ্য ব্যাপার ছিল এবং কেরি সেই

১. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২. বাংলা ছাড়া--মারাঠী, ফারসী সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, তেলুগু, তামিল, কানাড়ীভাষা শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। তার উপর শাসনবিধি, দেশিয় আইন, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা, ইতিহাস প্রভৃতির চর্চা হতো।

৩. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ১৭ পৃঃ।

আসাধ্য সাধন করে বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের দরজা খুলে দিয়েছেন। এখানে ঐ কলেজের প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর একটা তালিকা দেওয়া যাচ্ছে :

লেখক	রচনা	প্রকাশ
রামরাম বসু	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র.	১৮০১
	লিপিমালা	১৮০২
উইলিয়াম কেরি	A Grammar of the Bengalee Language	১৮০১
	কথোপকথন	১৮০১
	ইতিহাসমালা	১৮১২
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার[১]	বত্রিশ সিংহাসন	১৮০২
	রাজাবলি	১৮০৮
	হিতোপদেশ	১৮০৮
	প্রবোধচন্দ্রিকা	১৮৩৩
গোলোকনাথ শর্মা[২]	হিতোপদেশ	১৮০২
তারিণীচরণ মিত্র	ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট ঈশপের গল্প অনুবাদ	১৮০৩
চণ্ডীচরণ মুন্সী	তোতা ইতিহাস	১৮০৫
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	১৮০৫
রামকিশোর তর্কচূড়ামণি,	হিতোপদেশ	১৮০৮
মোহনপ্রসাদ ঠাকুর	Vocabulary Bengali and English	১৮১০
হরপ্রসাদ রায়	পুরুষপরীক্ষা[৩]	১৮১৫

উপরোক্ত তালিকাব বাইরে হিন্দুস্থানী, সংস্কৃত, আরবি ও ফারসিতে ছাপা অনেক বইও ছাপা হয়। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য সেগুলো নয়। ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত কলেজ সক্রিয় ছিল। কিন্তু রামমোহন রায় ও কিছু সাময়িক পত্রপত্রিকার আবির্ভাবে গদ্যের প্রসার অব্যাহত থাকে। ফলে কলেজিয় গদ্যের প্রয়োজনীয়তা ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে গেল।

১৮৫৪ সালে বোর্ড অব এগজামিনার্স-এর সঙ্গে কলেজকে এক করে দেওয়ায় কলেজের আলাদা কোন অস্তিত্ব আর থাকল না।

৩.

রেভারেণ্ড উইলিয়াম কেরি (১৭৬১—১৮৩৪)

বহু বিচিত্র ঘটনায় ভরা কেরির জীবন। ১৭৬১ সালের ১৭ আগস্ট নরদামটশায়ের পলাস পিউরি গ্রামে কেরি এক তাঁতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পরে পেশা বদল

১. মৃত্যুঞ্জয়ের নামে আরও কয়েকটি প্রকাশিত গ্রন্থের সন্ধান মেলে। ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' নামে একটি পুঁথির সন্ধান পান ও প্রকাশ করেন।

২. ইনি কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

৩. পুরুষ পরীক্ষার রচয়িতা নিয়ে বিতর্ক আছে।

করে গির্জার কাজে যোগ দেন। ফলে বাল্যকাল থেকে তিনি ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যে থেকে নানা বিষয়ের গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এক সময় ভাল করে ল্যাটিন ভাষা শিখে নেন।

অল্প বয়স থেকে কেরিকে জীবিকার জন্যে কৃষিকাজ, জুতো তৈরি প্রভৃতি নানা রকম বৃত্তি নিতে হয়। তারপর ১৭৮২ সালে স্থানীয় ব্যাপটিস্ট মিশনে যোগদান করেন এবং খৃস্টধর্ম প্রচারের জন্যে ভারতে তথা বাংলাদেশে প্রেরিত হন (১৭৯৩ সালের ১৩ জুন)। সঙ্গী ছিলেন জাহাজের ডাক্তার জন টমাস। আগেই বলা হয়েছে, তিনি আরও একবার ভারতে আসেন।

কলকাতায় পা দিয়ে কেরি প্রথমেই টমাসের বাঙলা শিক্ষক রামরাম বসুর সঙ্গে পরিচিত হন। পরে তাঁকে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে মুন্সী নিযুক্ত করলেন। কিন্তু কিছুদিন পর কেরিকে মালদহের এক কুঠি বাড়ির দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়।

সেখানে কুঠির তদারকি ও বাংলা শিক্ষা দুটোই চলতে থাকল। কিন্তু কিছুকাল বাদে এক নারী ঘটিত অপরাধে রামরাম বসুকে বিদায় দিতে বাধ্য হন কেরি।

আবার যখন শ্রীরামপুরে ১৭৯৫ সাল নাগাদ ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হল, তখন কেরিকে সেখানে টেনে আনা হয়। তারপরের ইতিহাস কেরির জীবনে বহু ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ। বাইবেলের অনুবাদ ও মুদ্রাযন্ত্র বসিয়ে বই ছেপে বের করার সাথে সাথে কেরি বাংলা গদ্যের যাত্রাপথ সুগম করে আনলেন।

১৮০১ সালে বাইবেলের অনুবাদ বেরিয়ে যায়। সেই অনুবাদের কাজে রামরাম বসুও সাহায্য করেন। ঐ বছরেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ চালু হয়ে যায়। কেরিকে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মনোনীত করা হল। কেন না, বাইবেলের অনুবাদের জন্যে ইতিমধ্যে বাংলা জানা ইংরেজ বলে কেরির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।[১] পরে অবশ্য তিনি সংস্কৃত শেখেন এবং আরও কিছু আধুনিক ভারতীয় ভাষাও আয়ত্ত করেন।

কেরির উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বাংলা গদ্য পাঠ্য পুস্তক রচনা। তাছাড়া পুরাতন বাংলা গ্রন্থ সম্পাদনা, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষারও কিছু বই রচনা বা সম্পাদনা করেন। তিনি ইংরাজিতে বাংলা ব্যাকরণ (১৮০১), বাংলা ইংরাজি অভিধান সংকলন (১৮১৮—২৫), কৃত্তিবাসের সমগ্র রামায়ণ (১৮০২) ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের চারটে পর্ব (১৮০২) সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এসব কাজে তিনি দেশিয় পণ্ডিত ও মুন্সীদের সহায়তা নেন বলে জানা যায়।

বাংলা গদ্য রচনায় কেরির সৃষ্টি সুদূর প্রসারী নয়, তবু গদ্যের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্বে তাঁর আন্তরিক উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে, সেকথা বলা যায় না।

১৮০১ সালে প্রকাশিত প্রথম গদ্যপাঠ্যবই—'কথোপকথন' (Diologues-intended to facilitate the acquaring of the Bengalee Language) শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত।

নামকরণ দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না, গ্রন্থটির বিষয়বস্তু কী। এটির রচনা প্রসঙ্গে আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় অনুমান করে বলেন যে, এটা কেরির রচনা নয়, একাধিক বাঙালি মুন্সী

১. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ড. সুকুমার সেন, ১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বা পণ্ডিতদের রচনা। কেননা, কেরি নিজেই এর ভূমিকায় লিখেছেন : 'I have employed sum (Sic) sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precesely in the natural style of the presons supposed to be speakers.'

সুতরাং সেইসব sensible natives[১]-দের সংগৃহীত ও রচিত সংলাপগুলো সম্পাদনা ও ইংরাজিতে অনুবাদ করাই ছিল কেরির কাজ। সেই কারণে কেরির নামেই গ্রন্থটি ছাপা হয়।

বইটি দ্বিভাষিক, একদিকে বাংলা অপর দিকে ইংরাজি। বিদেশিদের পক্ষে ব্যবহারের ও শিক্ষার উপযোগী এই সব সংলাপগুলো প্রকাশ করে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করে কেরি একটা নতুন দিক তুলে ধরেন।[২]

সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের মুখ থেকে কথোপকথনের ভাষাগুলো প্রায় যথাযথ ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। চাকর ভাড়াকরণ, সাহেব ও মুনশি, মহাজন আসামি, মজুরের কথাবার্তা, খাতক মহাজনি, ঘটকালি, স্ত্রীলোকের কথোপকথন প্রভৃতি সংলাপগুলোর মধ্যে চাকর, মুন্সী, মহাজন, খাতক, মালি, মজুর, স্ত্রীলোক, হাটুরে, যাজক, জমিদার, রায়ত ইত্যাদি সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মুখ থেকে সংগৃহীত।

সংলাপগুলোর ভাষারূপে কিছু অবিমিশ্র সাধুরূপ, কিছু সাধুমিশ্রিত কথ্যরূপ দেখতে পাই। মনে হয়, সংগ্রাহকরা একাধিক অঞ্চল থেকে এগুলো সংগ্রহ করে এনেছেন বলে, কথাবার্তার ভাষায় বিভিন্ন অঞ্চলের রূপ ফুটে উঠেছে।

'কন্দল' অংশ থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

'ওলো। তোর শাপে আমার বাঁ পার ধূলো ঝাড়া যাবে। তোর ঝি পুত কেটে দি আমার ঝি পুতের পায়। যা লো যা বারোদুয়াবি ভাড়ানি হাট বাজার কুড়ানি খানকি যা। তোর গালাগালিতে আমার কি হবেলো কুন্দেলি। আই ২। এমন কর্ম কি ও দেখে করেছে তা নহে। ও ও পোয়াতি বটে। যা বুন। তুইও যা। ও যাউক। আর ঝকড়া কন্দলে কায নাই। পাড়া পড়সি রাতি পোয়াইলেই দেখা হবে এত বাড়া বাড়ি কেন।'

আগাগোড়া আটপৌরে কথ্যরূপে লেখা। মানোএলের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের' পর কেরিই কথাবার্তার ভাষা আবার ব্যবহার করলেন।[৩] প্রায় দুশো বছর আগেকার রচনায় আর কোথাও এমন সংলাপ দেখা যাবে না। পরবর্তীকালে প্রায় উনষাট বছর বাদে দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকে নিম্নবর্ণের চরিত্রের মুখে এই জাতীয় সংলাপ দেন। ঝাড়া যাবে, কেটে দি, দেখা হবে প্রভৃতি যৌগিক ক্রিয়ার সমাপিকা ও অসমাপিকা—দুটো অংশেই কথ্যরূপ বর্তমান। আঞ্চলিক বা গ্রাম্য ক্রিয়ার নিদর্শন পাই যেমন, 'জ্বরে ঝাউরে পড়েছে'। এখানে 'ঝাউরে' শব্দটি ঝিমিয়ে অর্থে ব্যবহৃত।

অবিমিশ্র কথ্যরূপের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি : স্ত্রীলোকের কথোপকথন। 'আসোগো ঠাকুরঝি নাতে যাই। ওগো দিদি কালি তোরা কি রেন্ধেছিলি।

আমরা মাচ আর কলাইর ডাইল আর বাগুন ছেচকি করেছিলাম। তোরদের কি হইয়াছিল। আমারদের জামাই কালি আসিয়াছে রামমুনিকে নিতে। তাইতে শাকের ঘন্ট

১. বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, প্রমথনাথ বিশী, ৩১ পৃঃ।
২. 'কেরির আগে এ চেষ্টা কেউ করেছেন বলে জানি না'। প্রমথনাথ বিশী, বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, ৩১ পৃঃ।
৩. ড. সবিতা চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক, ২৩৭ পৃঃ।

সুক্তনি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলসা মাছের ভাজা ঝোল ডিমের বড়া আর পাকাকলার অম্ল হইয়াছিল।

কে রান্ধেছিল বড় বৌ না মেঝে বৌ। বড় বৌই রান্ধিয়াছিল। তিনি কুটনা বাটনা করে দিয়াছেন। তোদের বৌ কেমন। রান্ধিতে বাড়িতে পারে।[১]

কথ্যভাষায় লেখা। তদ্ভব শব্দের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। আর কিছু আঞ্চলিক মৌখিক ক্রিয়ার প্রয়োগ সাধুরূপে গৃহীত হয়েছে। যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহারে একটা অংশ কথ্যরূপ পাই। যেমন: আসিয়াছে রামমুনিকে নিতে, কুটনা বাটনা করে দিয়াছেন, নিয়া লড়িতে পারি না ইত্যাদি।

আবার সংগ্রাহকদের ভাষাজ্ঞানের অভাবে একই ক্রিয়া বা শব্দের একাধিক রূপ পাচ্ছি। রেন্ধেছিল কথ্যক্রিয়ার পাশে, রান্ধিয়াছিল সাধুক্রিয়া দেখি। অথচ রান্ধেছিলও দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু যে সব সংলাপের মধ্যে সমাজের উচ্চকোটি মানুষের সংলাপ দেখি, যেমন, যাজক, মহাজন, ভদ্রলোক, ঘটক প্রভৃতি সেখানে ভাষা তৎসম শব্দপ্রধান এক কৃত্রিম সাধুর রূপই ফুটে উঠেছে। তার সঙ্গে—অনাহুতেরদিগকে, দানোৎসর্গের , সময়ক্রমে, কমললোচন, আদ্যোপান্ত, তত্ত্ববৃত্তান্ত, তত্ত্বাবধারণ প্রভৃতি ভারি ভারি শব্দের প্রয়োগ করা হয়।

আবার কাজ কারবারের জগতের মধ্যে থাকেন এমন মানুষের সংলাপের ভাষায় আরবি ফার্সি শব্দের বাহুল্য রয়েছে। তাদের মধ্যে জমিদার, রায়ত, মহাজন, খাতক প্রভৃতি পর্যায়ের লোক বিদ্যমান। যেমন : মালগুজারি, জামিন, মাতবর, বেওরা, পেষগী, ইজারা, মহল, মুনাফা, লোকসান, ওম্মেদাওয়ারি, আড়ত্‌দার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মনে করা যেতে পারে, কেরি কথোপকথন সংকলনের কাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাহায্য নেন, তাদের মধ্যে যেমন সংস্কৃত জানা পণ্ডিত ছিলেন, আরবি-ফারসি, জানা মুন্সীও ছিলেন। কিন্তু কথ্যভাষার রূপের প্রয়োগ দেখাতেও যেমন ভোলেন নি, সাধুরূপের বেলাও তাই। কেরির বড় কৃতিত্ব এইখানেই, বাংলা গদ্যে যে কালে যে সময়ে সাধুরীতিই একমাত্র বাহন, তখন তিনিই প্রথম গদ্যলেখক যিনি ছাপার অক্ষরে কথ্যরীতিকে অগ্রাহ্য বা অসম্মান করে সরিয়ে রাখেননি। বরং কথ্যভাষার শক্তি কতটা, সংলাপের মধ্যে হাতে কলমে তার প্রয়োগ দেখিয়ে দেন। তাই বাংলা কথ্যগদ্যের ব্যবহারের দিক থেকে কেরির সংগ্রহ বা চেষ্টা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪.

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২–১৮১৯)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজি যুগের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও গদ্যলেখক ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। পাণ্ডিত্য ও ভাষার গুণ বিচার না করেও শুধু রচিত গ্রন্থের সংখ্যাধিক্যেই তিনি কলেজ-গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন। ১৮০২ খৃঃ থেকে ১৮১৩ খৃঃ পর্যন্ত তিনি বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলি ও প্রবোধচন্দ্রিকা রচনা করেন। এর মধ্যে প্রবোধচন্দ্রিকা তাঁর মৃত্যুর পরে ১৮৩৩ খৃঃ প্রকাশিত হয়।[১]

১. মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী, সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। (রঞ্জনা পাবলিশিং হাউস, আষাঢ় ১৩৪৬)।

বাংলা সাধুগদ্যের একেবারে শিশু পর্যায়ে আরবি ফার্সি শব্দ-ভারে জরজর দুর্বোধ্য, গদ্যের যুগে, প্রথম যাঁর গদ্য সঠিক পথ পায়, তিনিই বাংলা গদ্যের একজন আসল জনক[১]-- মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। পরবর্তী কালে সাধুগদ্যের কায়াগঠনে বিদ্যাসাগর অনেকখানি প্রভাবিত হন অথবা আদর্শ খুঁজে পান এইখান থেকে। বাংলা গদ্যে তিনিই প্রথম গদ্যরীতি নিয়ে পরীক্ষা চালান। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে একাধিক গদ্যরীতিতে রচনা করার দুঃসাহস দেখান। সমালোচক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই মন্তব্য করেন ঃ 'ঐ শিশুভাষার ভবিষ্যৎ বিচিত্র সম্ভাবনার কথা সর্ব্ব প্রথম তাঁহারই মানস নেত্রে ধরা পড়িয়াছিল এবং কোন প্রাচীন আদর্শের অভাবে তিনিই নানা আদর্শ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক যে সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় জ্ঞানী মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত রীতিকে যত দূর সম্ভব প্রাধান্য দিয়াছেন, কিন্তু খাঁটি বাংলা রীতিকেও তিনি উপেক্ষা করেন নাই'।[২]

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, কেরি কথোপকথন গ্রন্থে প্রথম ছাপার অক্ষরে কথ্য গদ্যের সম্মান দেন। তাই বলে কেরিকে চলিত গদ্যের শিল্পী বলা যায় না, চলিত গদ্যের সংগ্রাহক মাত্র। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় 'প্রবোধচন্দ্রিকার' কোন কোন অংশে সাধুগদ্যের সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক বা কথ্যভাষার কিছু সাহায্য নেন। ভাষাকে সহজ করতে ও গল্পরস পরিবেশন করতে সেসব স্থানে তিনি অনায়াসে চলিত প্রয়োগ দেখান। এটা ঠিক নমুনা সংগ্রহ বা দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর গদ্যে এসেছে তা নয়, সচেতন ভাবেই তিনি তা করেছেন। এখানেই কেরির চেয়ে তাঁর কৃতিত্ব বেশি। প্রবোধচন্দ্রিকা থেকে দুটি উদাহরণ দেখিয়ে আমরা তার প্রমাণ দিতে পারি। যথা ঃ 'পুত্র স্নেহে অস্তব্যস্ত হইয়া মহারাজমাতা কুন্তী মুহুর্মুহু বিলাপ করিতে করিতে অত্যন্ত কুপিতা হইয়া দাসীবর্গকে আজ্ঞা দিলেন ওলো দাসীরা দেখতো সে সর্ব্বনাশে অল্পায়ে পোড়াকপালে হাবাতে কোথা আছে।'

(তৃতীয় স্তবক, দ্বিতীয় কুসুম)।

কাঠামো পণ্ডিতি গদ্যে। কেবল সংলাপের ভাষায় এই রকম কিছু কিছু মৌখিক উপাদান মিশ্রিত সাধুর ব্যবহার পাচ্ছি। তবে তাকে ঠিক চলিতরীতি বলা চলে না। আর একটা কুসুমে দেখি ঃ 'শৃগাল এই চিন্তা করিয়া...নিষ্ঠুর কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল ওলো ছেঁচড়া লক্ষ্মী ছাড়া মাগী তোর ভাতার অলক্ষণে ছেঁচড় বেটা কমনে গেল [?] আমার যে এক শত ভার সদ্যঃ স্নিগ্ধ, নিরস্থি উপাদেয় আম মাংসপিণ্ড কর্জ ধারে তার কি তা মনে নাই [?] যেমন গর্ভ তেমনি ঋণগ্রহণ সময়ে বড় সুখ [।] মোচনকালে মার্গ চড়২ করে [।] দুঃশীল ব্যলীক বেটাকে প্রায় একমাস হইল। আমি প্রত্যহ খুঁজিতেছি [।] দেখাই পাওয়া যায় না আমি যে শৃগাল মহাজন মহাশয় বসিয়া আছি তাহার খোজ খবরই নাই [।] নিশ্চিন্ত হইয়া নাভিতে তেল দিয়া আমার দত্ত মাংসভোজনে মাগুকে চিক্না করিয়া পিণ্ডীশুর গেহনদী বেটা বসিয়া আছে [।] আন মাগী আজি বেবাক সকল মাংস লইব তবেই উঠিব।'

(তৃতীয় স্তবক, তৃতীয় কুসুম)

এখানে অনেক গ্রাম্যশব্দ আছে। বাংলা গদ্যের এই কালে মৃত্যুঞ্জয় একজন শাস্ত্রবিদ হয়েও সংলাপের ভাষায় বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে তিনি সেগুলো নিঃসঙ্কোচে তাঁর গদ্যে

১. মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী, সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। (রঞ্জনা পাবলিশিং হাউস, আষাঢ় ১৩৪৬)।

২. ঐ, শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় দ্রষ্টব্য।

স্থান করে দেন। 'মাগী' বা 'ভাতার' জাতীয় শব্দকে এখন অনেকে বেশ পালিশ করে প্রয়োগ করেন। গদ্য শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় আবর্জনার মত ছুঁড়ে ফেলতে পারেননি। চলিত গদ্যের ক্রম ব্যবহারের ইতিহাসে তাই মৃত্যুঞ্জয়ের ক্ষীণ সংযোজনকে অস্বীকার করা যাবে না।

৫.

রামরাম বসু (১৭৫৭–১৮১৩)

বাংলা গদ্যের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, রামরাম বসুর নাম তাঁদের কাছে অজ্ঞাত নয়। তিনিই হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যিক যাঁর লেখা বাংলা গদ্য গ্রন্থ প্রথম ছাপা হয়ে বের হয়। তাঁর রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রই' বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাঙালি রচিত প্রথম মৌলিক রচনা।[১]

রামরাম বসু ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রর' ভূমিকায় রামরাম বসু নিজেকে বঙ্গজ কায়স্থ বলে উল্লেখ করেন। তাঁর জন্মস্থান চুঁচুড়া ও শিক্ষাস্থান ২৪ পরগনার নিমতা গ্রাম বলে জানা যায়।[২]

বাল্যজীবন না জানা গেলেও কর্মজীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য বা প্রমাণ পাবার উপায় আছে। সেগুলো থেকে তাঁর জীবনীকারগণ জেনেছেন, রামরাম বসু জন টমাস ও উইলিয়াম কেরির মুন্সী ছিলেন। পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হলে চল্লিশ টাকা বেতনে সহকারী পণ্ডিত রূপে যোগদান করেন।

মিশনারীরা তাঁর বহু গুণের কথা স্বীকার করেন। তিনি সেযুগে ইংরেজি লিখতে বলতে পারতেন। কেরি লিখেছেন, রামরাম ভাল ফার্সি জানতেন। জন ক্লার্ক মার্সম্যান বলেছেন, তিনি বাংলায় ব্যঙ্গরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

রামরাম বসু দ্রুত লিখতে পারতেন। ১৮০১ সালের মে মাসে কলেজে ঢুকে জুলাই মাসে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ছাপা হয়ে যায়। আবার পরের বছর 'লিপিমালা' আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম গ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ফার্সি শব্দ বহুল সাধুগদ্যের প্রথম মৌলিক পাঠ্যপুস্তক। নানা কারণে গ্রন্থটি বিশিষ্ট হয়ে থাকবে। প্রথম গদ্যজীবনী, প্রথম বাঙালির রচনা এবং বাংলা হরফে ছাপা বই।

ভাষায় ফারসির বাহুল্য ও অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের ভারে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রর' ভাষা যথেষ্ট আড়ষ্ঠ। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই প্রমাণ মিলবে। যথা :

'একটা চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত হইয়া শূন্য হইতে মহারাজার সম্মুখে পড়িল অকস্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন পশ্চাৎ জানিলেন তিরে বিদ্ধিত চিল্ল পক্ষি। লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ চিল্লকে কেটা তির মারিয়াছে।'

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লিপিমালা' ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়। এটি একটি পত্রপ্রবন্ধ, কেউ কেউ একে সাহিত্য গ্রন্থ না বলে Letter Writting বই বলে উল্লেখ করেন।[৩] গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক এই গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেছেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলের লোক বাংলাদেশে

১. সাহিত্য সাধক চরিতমালা, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য। বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, প্রমথনাথ বিশী, ২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. সাহিত্য সাধক চরিতমালা, প্রথম খণ্ড।
৩. বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, ড. শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮৪ পৃঃ দ্রঃ।

বাস করছেন। সুতবাং এখানে দুধরনের ভাষারূপ চালু। বিদেশিদের সেটা না জেনে কাজ কববার অসুবিধা হতে পাবে। অতএব বিদেশি শিক্ষার্থীদের যাতে সহজেই এখানকার 'চলন ভাষা' ও 'লেখাপড়ার ধারা' অভ্যাস করে যাতে 'রাজক্রিয়াক্ষম' হতে পারেন সেই দিকে নজব দিয়ে গ্রন্থটি রচিত। প্রথম ধাবায় পনের ও দ্বিতীয় ধারায় পঁচিশটি লিপি আছে। দ্বিতীয় ধারার 'সামান্য চাকরকে লিখিত মনিব' থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

'ভরা অদ্যাপি বিক্রী হয় নাই অতএব তুমি পত্রপাঠ ভবানীপুর গ্রামে যাইয়া পাঁচ সাত দিবস সেই স্থানে থাকিয়া তিন ভরা কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া টাকা শীঘ্র পাঠাইবা এখানে ব্যয় ব্যসনের বড়ই অপ্রতুল হইয়াছে এবং আর কতকখানি নৌকার চালান দিতে হইবেক। আমি এখান হইতে কানাই মাঝীকে শীঘ্র বিদায় করিব তুমি তাহার অপেক্ষা করিবা না আর ওখানে কি মত চোদ্দ পদ ও ষোল পদ নৌকার ভরা বিক্রী হইতেছে তাহা জানিয়া লিখিবা.....।'

মাত্র এক বছরের মধ্যে রামরাম বসু গদ্যের রূপ বদলে দেন। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' থেকে 'লিপিমালা'র ভাষা অনেক পরিচ্ছন্ন ও ফার্সিশব্দ ব্যবহারমুক্ত। ভাষায় সাধু ক্রিয়ার রূপ বর্তমান, আবার আঞ্চলিক বা কথ্যক্রিয়াও আছে। যথা: পাঠাইবা, করিবা, লিখিবা। সুতরাং লিপিমালার ভাষারূপকে অনায়াসে কথ্যঘেঁষা সাধুরূপ বলতে পারা যায়। কিন্তু লেখকের দাবি অনুযায়ী একে তখনকার 'চলন ভাষা' অর্থাৎ চলিতরূপের কথা বলা হয়েছে। দুশো বছর আগে এখনকার মত ব্যাপকতব শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। সে সময়কার ভাষারূপের মধ্যে একেবারে পরিচ্ছন্ন কথারূপ আশা করা অমূলক। সেই কারণে সাধুভাষা বা 'লেখা পড়ার' ভাষার রূপটা তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু চলিত বা কথ্য রূপটা অবহেলায় কানা গলিতেই ঘুরে মরতো। 'লিপিমালার' মধ্যে দিয়ে গদ্যলেখক রামরাম বসু সেই রূপটাকেই কুড়িয়ে এনে সাহিত্যের পাতে দিয়েছেন। আর একটি পত্রে লিখেছেন :

'লিখিয়াছ আপনকার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ রায়ের পুত্রের সহিত হইয়াছে তাহার কুল মর্য্যাদা একশত টাকা দিতে হইবেক এ সম্বন্ধ ভাল বটে কিন্তু টাকার সাংগত্য বৃহৎ ব্যাপার এক্ষণে তাহার সংস্থানকি একশত টাকার পণ দিতে হইবেক তদভিন্ন আপনাদের ব্যয় তিন চারিশত টাকা ন্যূনে হইতে পারিবেক না। তাহার সকল সঙ্গতি এক্ষণে হইতে পারিবেক না। আমার এখান হইতে একশত টাকার সুসার হইতে পারিবেক ইহার অধিক কপর্দ্দক হইবে না বক্রি চারিশত অন্য কোন স্থান হইতে সঙ্গতি করিতে পার এমত স্থান আমি দেখিতে পাই না। অতএব সুতরাং ও সম্বন্ধ, হইতে পারিবেক না'...

এতে দেখা যাচ্ছে ভাষা বেশ সরল। ক্রিয়ার রূপে বেশ কিছু আঞ্চলিক মৌখিক শব্দের ব্যবহার ঘটেছে, যেমন—দিতে হইবেক, হইতে পারিবেক না ইত্যাদি। এগুলো এখনো কোন কোন অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। অতএব লেখকেব চলন ভাষার দাবিকে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না।[১] কেননা কালে কালে সাহিত্য ভাষা যেমন একভাবে ছিল না, কথ্যভাষা বা চলন ভাষাও তেমনি নানারূপ বদল করতে করতে এগিয়ে চলেছে।

১. 'এই ভাষা রামরাম কথিত চলন ভাষা না হোক, একেবারে ফার্সি বিহীন।' ড. শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, ৮৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মপস্বল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম ——

শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলের সাহেবলোক বিচারের যে নিয়ম ও ধারা ইঙ্গরেজি ১৭৭২ সনের ২১ আগস্ত মাসে বাঙ্গালা ১১৭৯ সনের ৮ ভাদ্রে নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহাতে পাটনা ও মুরশিদাবাদ ও ঢাকা ও দিনাজপুর কিম্বা পূর্ণিয়া ও বর্দ্ধমান ও কলিকাতা এই সকল স্থানেতে মপস্বলের দেওয়ানি আদালতের ও সহর কলিকাতায় সদর দেওয়ানি আদালত আপিলের কচহরি স্থৈর্য্য হইয়াছিল তাহার পর ইস্তক ১৭৭৪ সন নাগায়দ ১৭৭৯ সন ইঙ্গরেজি সেই সদর আদালত স্থগিত ছিল পরে ১৭৮০ সনে শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলি সাহেব লোকের আজ্ঞামতে পুনশ্চ স্থৈর্য্য হইল কিন্তু শ্রীযুত বড় সাহেব ও কৌসলি সাহেব লোক অনবকাস জন্যে কখন সেই সদর আদালতে বসিতে পারেন নাই একারণ সেই সনের অক্তোবর মাসের ২৪ বাঙ্গালা সন ১১৮৭। ১১ কার্ত্তিক তারিখে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে সদর আদালতে

এক জন

জোনাথান ডানকানের অনুবাদ গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

গদ্যশিল্পের সূচনা

(১৮১৫–১৮৪৭)

রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)

যাঁর রচনার প্রবাহে বাংলা গদ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজিয় প্রভাব খাটো হয়ে যায়, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে প্রথম যিনি গদ্যকে টেনে আনলেন--তিনি ভারতপথিক রামমোহন রায়। তিনি ছিলেন সত্যকার আধুনিক ভারতের অগ্রদূত। ধর্ম সমাজ শিক্ষা রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি নতুন করে প্রেরণা দান করেন। এসবের জন্যে একাধিক বার তিনি দেশে বিদেশে দূত হয়ে ছুটে যান।

আধুনিক কালে বাংলা ভাষার সাহায্যে বাংলাদেশে দার্শনিক জ্ঞান চর্চার সূত্রপাত করে বাংলা গদ্যের পুরিপুষ্টি সাধনে তিনি অক্লান্ত চেষ্টা করে যান। তাঁর রচনায় সাহিত্যরস ছিল না, তবে তাঁর ভাষা ছিল বক্তব্যের উপযোগী ও প্রাঞ্জল।[১] ঈশ্বর গুপ্ত তাই মন্তব্য করেন, 'দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন।' তাঁর শাস্ত্র বিচার ও তৎসংক্রান্ত বিবাদ মূলক রচনার সাহায্যে বাংলা গদ্যের গুরুত্ব যে যথেষ্ট বেড়ে যায়, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি একদিকে যেমন প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র সমূহকে বাংলা গদ্যে অনুবাদ করে ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করেন, অন্যদিকে ভাষায় প্রকাশভঙ্গির দৃঢ়তা ও মননশীলতা সঞ্চার করে তাকে ঋজু, সতেজ ও পুষ্ট করে তোলেন।[২]

মোট কথা, তাঁর গদ্যে আবেগ ছিল না, কিন্তু গতি ছিল। এই গতি সঞ্চারই রামমোহনের বড় কৃতিত্ব। সমসাময়িক বাংলা গদ্যের দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে রামমোহনের দৃষ্টি ছিল সজাগ। তাই তাঁর রচনাভঙ্গি পূর্বতনদের চেয়ে কিছু সবল ও সুষম হয়ে ওঠে।[৩]

কিন্তু সেকালের লেখার দুটো দোষের জন্যে সুগম হতে পারেনি—প্রথম, ছেদ চিহ্নের স্বল্পতা, দ্বিতীয় দূরান্বয়।[৪] এই বিষয়ে তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থ বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় পাঠককে সচেতন করে দেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্ত সার (১৮১৫), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, প্রর্বতক ও নিবতর্কের সম্বাদ, গোস্বামীদের সহিত বিচার, পথ্য ও প্রদান (১৮২৩), গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮২৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া একাধিক ভাষায় কিছু পত্র পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

তিনি সকল রচনা বাংলা সাধুগদ্যে লেখেন। তবে সেকালের গদ্য লেখকদের তুলনায় তিনি ভাষাকে যথেষ্ট সরল করে লেখার চেষ্টা করেন। তাঁর 'পথ্য ও প্রদান' থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে :

'অর্থাৎ পাঁচ শিকা গোসাঁইকে দিলেই স্বামী থাকিতেও পূর্ব্ব বিবাহের খণ্ডন হইয়া স্ত্রীর

১. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ড. সুকুমার সেন, ৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ১ম খণ্ড, ৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
৩. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ড. সুকুমার সেন, ৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
৪. ঐ, ঐ

বৈধব্য হয়, আর পাঁচ শিকা পুনরায় প্রদানের দ্বারা তাহার সহিত অন্যের বিবাহ হইতে পারে, অতএব ধর্মসংহারক, এরূপ বৈধব্যের ও পুনরায় বিবাহের উপায় আপন করস্থ থাকিতে অন্য যে প্রশ্ন করেন সে বুঝি তাঁহার স্বমতের প্রবলতার নিমিত্ত হইবেক।' (১৮২৩ সাল)।

সাধুগদ্যে লিখিত। আপন যুক্তিকে কত সহজে প্রকাশ করা যায়, এখানে তারই প্রমাণ পাই। তবে প্রথম দিককার রচনার চেয়ে এতে কমা চিহ্নের ব্যবহার বেড়েছে।

২.

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–৯১)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মাঝখানে গদ্য নিয়ে যিনি বেশি চিন্তাভাবনা করে বাংলা গদ্যকে সঠিক শিল্পসম্মত করতে সমর্থ হন, যিনি অনুবাদক ও পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হয়েও সার্থক গদ্যশিল্পী[১]—তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নে তিনি গোটা জাতির মুখোমুখি দাঁড়ান। শিশুশিক্ষা ও সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যবই রচনা করে এবং নারীশিক্ষার প্রসারে সহযোগিতা করে তিনি উত্তরকালের মানুষের কাছে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

ঊনবিংশ শতকের রত্নপ্রসবিনী বাংলাদেশের মনীষীদের সঙ্গে নানা ক্ষেত্রে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। কিন্তু কারো সঙ্গেই তাঁর সাদৃশ্য ছিল না। নিজের হৃদয়কে খুলে ধরার মতো একজন বন্ধু তাঁর কেউ ছিল না। এই একক নিঃসঙ্গ বিদ্যাসাগরচিত্তের কারণ বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন[২]।'

সেই নিঃসঙ্গতার মধ্যে একাকী বিদ্যাসাগর বাঙালি জীবনের নানা দিকে উন্নতির যে চেষ্টা করে যান, এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে কখনো সংঘর্ষে, কখনো এড়িয়ে গিয়ে, তার দৃষ্টান্ত আর কোন ব্যক্তির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

মেদিনীপুরের বীরসিংহের মতো একটা ছোট্ট গ্রামে দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করে, পরবর্তী কালে গোটা জাতির মধ্যে একটা বড়মাপের দুর্লভ মানুষ হয়ে উঠতে যে নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও উদ্যোগের প্রয়োজন—বিদ্যাসাগর সমস্ত জীবন দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাই যথার্থই মন্তব্য করেন[৩], 'তাঁর দেশের লোক যে-যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন, বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড়ো যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করবে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে; বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল; এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।'

সেইযুগে বসেও তাই তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা, নারী শিক্ষা, শিশুশিক্ষা, বিধবা বিবাহ প্রথা প্রবর্তন ইত্যাদি অনেক বিষয় নিয়ে আন্দোলন করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সফল হন। এক কথায় তাঁর জীবন ছিল অসংখ্য ঘটনাবহুল ও শিক্ষণীয়, যা সমগ্র বাঙালি জাতিকে অনন্তকাল

১. কেউ কেউ 'জনক' আখ্যাও দিয়ে থাকেন।
২. বিদ্যাসাগর চরিত, চরিত্রপূজা।
৩. ঐ

ধরে মেরুদণ্ড সোজা করে চলার প্রেরণা দিয়ে এসেছে।

সেই হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটা বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্বে বিদ্যাসাগর শক্ত হাতে কলম ধরেন। সমর্থন করলেন সাধুগদ্যরীতিকে। কেবল কলম ধরা নয়, গদ্যকে যথার্থ ভাবে সাহিত্যিক গদ্যে রূপ দিতে রামমোহন পর্যন্ত যা বাকি ছিল, বিদ্যাসাগর তার সব দিক পূরণ করে বাংলা গদ্যের প্রাণসঞ্চার করে মৌলিক সৃষ্টির পথকে সুগম করে দিলেন।

রামমোহন পর্যন্ত বাংলা গদ্যের শব্দবিন্যাস ও বাক্যগঠনে নানান দোষ ছিল। তখন একাধিক বাক্য-সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা গ্রথিত হোত একাধিক বাক্য। সুতরাং ভাবের বিরুদ্ধতার এবং বাক্যের ভারসাম্যহীনতার জন্য গদ্য 'কর্কশ' ও 'লালিত্যহীন' হোত। বিদ্যাসাগর আনলেন 'লালিত্য' ও 'নমনীয়তা'। পদ্যের মতো গদ্যেরও একটা বিশিষ্ট ছন্দ বা তাল আছে (rhythm)। উনবিংশ শতকের গদ্য লেখকদের মধ্যে বিদ্যাসাগরই প্রথম সেটা অনুভব করেন। তাই আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় মন্তব্য করেন যে, প্রত্যেক ভাষায় গদ্যের যতির রূপ বিভিন্ন। বাংলা গদ্যের নিজস্ব যতি অনুসারে বিদ্যাসাগর সাহিত্যের ভাষায় সজ্ঞান ভাবে সুষম বাক্যগঠন-রীতি প্রবর্তন করেন।[১]

বলা বাহুল্য এই যতি-ব্যবহার অর্থ সমাপ্তির উপর অর্থ বা পূর্ণ যতির প্রয়োগ। আর সেটা নিয়ন্ত্রণ করে শ্বাসবায়ু। তাঁর প্রথম[২] অনুবাদ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিলে তার প্রমাণ মিলবে :

'কলিঙ্গদেশে। যজ্ঞশর্ম্মা নামে। ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি, অনেক কাল,। অনেক দেবতার। আরাধনা করিয়া,। একমাত্র পুত্র। প্রাপ্ত হয়েন। ঐ পুত্র,। অল্পকাল মধ্যে,। সর্ব্ব শাস্ত্রে। সবিশেষ পারদর্শী হইল ;। এবং,। অনন্যকর্মা ও অনন্যধর্মা হইয়া,। নিরন্তর পিতা মাতার। সেবা করিতে লাগিল। (চতুর্বিংশ উপাখ্যান)

"শকুন্তলা" থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত :

'প্রিয়ংবদা কহিলেন,। সখি!। তুমিই যে কেবল। তপোবন বিরহে। কাতর হইতেছ,। এরূপ নহে,। তোমার বিরহে,। তপোবনের। কি অবস্থা ঘটিতেছে,। দেখ। জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল,। হরিণগণ ;। আহার বিহারে। পরাঙ্মুখ হইয়া,। স্থির হইয়াছে। মুখের গ্রাস। মুখ হইতে। পড়িয়া যাইতেছে,।...মধুকর মধুকরী। মধুপানে। বিরত হইয়াছে ও গুণ গুণ ধ্বনি। পরিত্যাগ করিয়াছে।'[৩]

দেখা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্যের লাগাম ছাড়া রূপটা আষ্টেপৃষ্ঠে শাসনের নিগড়ে বাধা পড়েছে। তাতে বাক্য আগের চেয়ে ভাববাহী ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আর সেই গদ্যের শরীরে খুশি মত শব্দকে যেখানে ইচ্ছে চালিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। আর সে দায়িত্ব 'শাব্দিক গদ্যশিল্পী' বিদ্যাসাগর কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেন। সংস্কৃত থেকে তিনিই অজস্র শব্দ বাংলায় চালিয়ে দিয়ে ভাষার সম্পদ বাড়িয়েছেন।

অথচ বাংলা গদ্যে এতখানি ক্ষমতা নিয়ে কলম ধরলেও বিদ্যাসাগরের ভাগ্যে স্বাধীন চিন্তার অবসর মেলেনি। পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা মেটানো, প্রবল প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে

১. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. কেউ কেউ প্রথম রচনা 'বাসুদেব চরিত' এর কথা বলেন। এর পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি।
৩. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সম্পাদনা দেবকুমার বসু, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

বিধবা বিবাহ প্রথা প্রবর্তন, নারী শিক্ষার প্রসার--প্রভৃতি বড় বড় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি অনেক সময় বহু মানুষের সহযোগিতা পেয়েছেন, কখনো তাঁর ভাগ্যে জুটেছে বঞ্চনা।

কেউ কেউ পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা ও অনুবাদক বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বকে লঘু করে দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা ভাবতেই পারেন না, যেকালে বাংলা ভাষায় মৌলিক চিন্তার ক্ষেত্রই তৈরি হয়নি এবং যখন বাংলা ভাষায় পাঠোপযোগী আখ্যানমূলক কোন কিছুই ছিল না, সেই সময়ে বিদ্যাসাগরের পাঠ্যবই ও আখ্যানমূলক গদ্য রচনা ছাত্রদের অন্ধকারে থেকে আলোয় আনার পথ করে দিয়েছে। 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি তখন ঘরে ঘরে সকলের সমাদরের বস্তু। তাঁর অনুবাদকর্ম সাহিত্যকর্মের মতো সমান পাঠক খুঁজে নিয়েছে, তখন তাঁর সেই অনুবাদকর্মকে ছোট করে দেখার পেছনে ঈর্ষা বা দৃষ্টির ক্ষীণতা প্রমাণ করে।

কিন্তু আশ্চর্য হই, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো একজন প্রতিনিধি স্থানীয় সাহিত্যিকের কলম দিয়ে বিদ্যাসাগর-প্রতিভাকে ছোট করে দেখানোর প্রচেষ্টায়।[১] আরও বিস্মিত হই যখন দেখি বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেয়ে প্যারীচাঁদের ভাষাকে বাংলা ভাষার উন্নতির সোপান রূপে মন্তব্য করেন। বলেন যে, 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকেই বাংলা ভাষায় প্রাণ সঞ্চার হয়েছে।[২] বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় যথার্থই মন্তব্য করেন যে, বিদ্যাসাগরের যশে বঙ্কিমচন্দ্র কিঞ্চিৎ ঈর্ষালু ছিলেন।[৩]

বস্তুতপক্ষে, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ গদ্য লেখকগণ যে গদ্যের উপর দাঁড়িয়ে আধুনিক সাহিত্যের প্রাসাদ গড়ে তোলেন, তার পাকা ভিত গেঁথে দেন গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগর। তাঁর কৃতিত্বকে একনজরে দেখাতে গেলে ভাষাকে দুভাগে ভাগ করতে হয়। যথা : (ক) রূপগত দিক, (খ) ভাবগত দিক।

রূপগত দিকের উন্নতি বলতে গদ্যদেহের নির্মাণ ব্যাপারকে বলা হচ্ছে। যেমন,

এক।। বাংলা গদ্যের পদবিন্যাসরীতি তাঁরই অবদান। কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া-অব্যয় প্রভৃতি পদের অবস্থান তিনি যেমন যেমন দেখিয়েছেন আজও গদ্যে সেই বিদ্যাসাগরীয় রীতি অব্যাহত।

দুই।। ইচ্ছেমত সংস্কৃত শব্দ বাংলায় চালিয়ে দিয়ে ভাষাকে আরবি-ফারসির প্রভাব থেকে মুক্ত করেন। আর, ভাষার শব্দভাণ্ডার বাড়িয়ে ভাষাকে শক্তিশালী করে গদ্যকে মাজাঘষা করে তোলেন।

তিন।। পদ্যের মত বাংলা গদ্যেরও একটা ছন্দ আছে, শিল্পী বিদ্যাসাগর তা প্রথম উপলব্ধি করেন, ইংরাজি ভাষা থেকে খুশি মত বিরামচিহ্ন বাংলায় চালিয়ে গদ্যকে অর্থবহ ও ছন্দময় করে তোলেন।

ভাবগত দিক বলতে সৃষ্টি-ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। যেমন,

এক।। সাহিত্যগুণ সম্পন্ন রচনা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের সৃষ্টি। সব রকমের ভাবপ্রকাশের পক্ষে বাংলা গদ্য যে উপযুক্ত, তিনি তা প্রমাণ করেন নানা গ্রন্থের অনুবাদে বা আলোচনায় সব রকম ভাব বর্ণনা বা ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে।[৪]

১. ক্যালকাটা রিভিউ, ১৮৭১, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ।
২. বাঙ্গালা ভাষা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৩. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য।
৪. বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, ড. শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩২ পৃষ্ঠা।

দুই।। অনুবাদের মধ্যে দিয়ে ভাষা শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু অনুবাদকর্ম যথার্থ সাহিত্য গুণসম্পন্ন হওয়া অনুবাদকের অন্যতম কৃতিত্ব। বিদ্যাসাগর সেই কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি অনুবাদ সাহিত্যের গোড়াপত্তন করে সৃষ্টিশীল আধুনিক সাহিত্যের দোর খুলে দেন।

তিন।। নিপুণহাতে গল্পরস পরিবেশন তাঁর আর এক কীর্তি। বর্ণ পরিচয়ের মধ্যে টুকরো টুকরো গল্প বলে শিশু-মনকে পাঠের দিকে টেনে আনার প্রথম গৌরব তাঁর। তাতে 'ভুবনের গল্পটি'কে প্রথম মৌলিক ছোটগল্প বলতে আপত্তি নেই।

দ্বিতীয়ত, বাঙালি পাঠক প্রথম 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' ও 'ভ্রান্তি বিলাসের' মধ্যে আখ্যান রস পান করবার সুযোগ পেল। এই সব অনুবাদের উপস্থাপনার দিক দিয়ে, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে একেবারে প্রথমেই এদের স্থান দিলে বোধ হয় খুব একটা অমূলক হবে না বলে মনে করি।[১]

বিদ্যাসাগর বাংলা সাধুগদ্যকে সমর্থন করেন, কিন্তু সমকালীন লেখকদের থেকে তাঁর কৃতিত্ব এইখানে যে, বিষয় অনুযায়ী এক এক রকম সাধুরীতি নির্মাণ করে দেখিয়েছেন। 'বেতালপঞ্চবিংশতির' অনুবাদে বড় বড় সমাসবদ্ধ ও গুরুগম্ভীর শব্দের ব্যবহারে ভাষা যেমন কিছু আড়ষ্ট 'শকুন্তলা'য় তাই আবার মাধুর্যমণ্ডিত আরেক রূপ। আবার বিভিন্ন 'প্রস্তাব'-এর মধ্যে দেখতে পাই তথ্য ও মননে গুরুভার-মন্থর আরেক চেহারা। আত্মজীবনীতে সাধুরূপ কিছু লঘু। আবার 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' বা 'ভ্রান্তি বিলাসে' গল্পরস পরিবেশন-উপযোগী রমণীয় আরেক গদ্য। আবার এত বৈচিত্র্যের মধ্যেই শিশুপাঠ্যে সরল অনাড়ম্বর ভিন্ন স্বাদের অন্য এক সাধুগদ্য, যার স্রষ্টাও বিদ্যাসাগর। এখানে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা তাঁর বিচিত্র-গদ্যনির্মাণক্ষম প্রতিভার পরিচয় লাভ করতে পারি। যথা :

'জয়শ্রীর জ্ঞানোদয় হইল। তখন, সে প্রিয়তমকে মৃত স্থির করিয়া সখীর নিকটে গিয়া পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপার তাহার গোচর করিয়া কহিল, সখি! আমি এই বিষম বিপদে পড়িয়াছি'। (বেতালপঞ্চবিংশতি)

দৃষ্টান্তটি সাধুরূপের তবে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার চেয়ে এ অনেক বেশি সরল। তবে গোড়ায় ভাষা কিছু আড়ষ্ট ছিল।

আবার শকুন্তলায় গদ্যরূপ আর এক ভঙ্গিতে দেখতে পাই। যথা :

'বালক, শকুন্তলাকে দেখিবা মাত্র, মা মা করিয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, এবং জিজ্ঞাসিল, মা! ওকে, ওকে দেখে তুই কাঁদিস কেন? তখন শকুন্তলা গদ্‌গদ্‌ বচনে কহিলেন, বাছা! ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।'

বাংলা গদ্যে সংলাপ ব্যবহারের এমন সরস মধুর রূপ বিদ্যাসাগর-পূর্ব গদ্যে আর নেই। পরবর্তী কালে গল্প উপন্যাসে এর ব্যাপক প্রয়োগ দেখতে পাই। তাছাড়া শকুন্তলার সাধুরূপ চলিত ভাষার অনেক কাছের বলে মনে হয়। এর ক্রিয়াপদগুলো সাধু এবং বাকি পদের সঙ্গে চলিতের পার্থক্য বড় নেই।

আবার 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'-এর ভাষারূপও মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনের থেকে অনেক বেশি যুক্তিনিষ্ঠ অথচ সরল। যথা :

১. আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় এগুলোকে মৌখিক রচনার পর্যায়ে ফেলেন। বাংলা সাহিত্যে গদ্য ৫৯ পৃঃ।

'অতএব, যখন মনু, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ বিষয় বিশেষে স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহের অনুমতি দিয়াছেন, যখন তাঁহারা ঐ বিবাহকে প্রথম বিবাহের ন্যায়, সংস্কার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যখন মন্ত্রহীন অবৈধ স্ত্রীপুরুষ সংসর্গকে সংস্কার বলা যায় না, যখন ঋষিরা দ্বিতীয় বিবাহের নিমিত্ত স্বতন্ত্র মন্ত্র নির্দেশ করিয়া যান নাই,...তখন প্রথম বিবাহের মন্ত্রই যে দ্বিতীয় বিবাহের মন্ত্র, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় ঘটিতে পারে না।'[১]

একেবারে যুক্তিনিষ্ঠ গদ্য, অথচ তথ্যসর্বস্ব হয়ে উঠেনি। এমন গদ্য অধুনা চলিতরূপে অবাধে চলেছে। রামমোহনের যুক্তিজাল-সমাচ্ছন্ন জটিল গদ্যের চেয়ে এ অনেক আধুনিক, ভারমুক্ত ও কথ্যাশ্রয়ী।

আবার শিশুপাঠ্যে লক্ষ্য করি :

'গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন, তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভাল খাব, ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না।

গোপাল আপনার ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে বড় ভালবাসে। সে কখন তাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাদের গায়ে হাত তুলে না।' (বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ, ১ম পাঠ)।

এ গদ্যকে কথ্য বলা ঠিক। ক্রিয়াপদে কিছু সাধুরূপের প্রয়োগ, কিছু চলিতও আছে। 'তার', 'তাদের', 'তাকে'—সর্বনামপদ পর্যন্ত চলিত রূপের। ছোট ছোট বাক্য। শিশুদের মনে রাখার মত করে আটপৌরে চেহারার গদ্য বিদ্যাসাগরের আর এক সৃষ্টি।

বিদ্যাসাগর-প্রতিভার অমর 'সৃষ্টি' 'সীতার বনবাস' ও 'ভ্রান্তিবিলাস' অনুবাদ। চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে কোন আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও তার মধ্যে সমাজচিত্রকে ফুটিয়ে তোলা আধুনিক উপন্যাসের ধর্ম। শকুন্তলায় তার প্রথম সূচনা দেখতে পাই এবং 'সীতার বনবাস' ও 'ভ্রান্তিবিলাসে' আর একধাপ এগিয়ে যেতে দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে নির্মল আনন্দ পরিবেশনই অনুবাদকের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। সমালোচক প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে : 'তাঁহার রচিত সাহিত্য তাঁহার কর্মজীবনের প্রক্ষেপ মাত্র। কর্মের একটা স্বাভাবিক সীমা আছে, তাহার পরে কর্মের মধ্যে আর যাওয়া সম্ভব নয়। কর্ম যেখানে থামিয়াছে, সাহিত্যের সেখানে সূত্রপাত হইয়াছে।'[২]

১৮৬৯ খৃঃ 'ভ্রান্তিবিলাসের' রচনা কালে দেখা যায় লেখক ধীরে ধীরে তাঁর কর্মজীবনের থেকে সরে এসেছেন মানুষের হৃদয়লোকে। কোন উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করতে লেখক 'কমেডি অব এরর'-এর অনুবাদের কাজে হাত দেন নি। পাঠককে নির্মল আনন্দ দিতেই 'ভ্রান্তি-বিলাসের' সূচনা। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে[৩] সেকথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

প্রথমে সীতার বনবাস থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে :

'সীতা দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, তাইত, ঠিক যেন আর্যপুত্র হরধনু উত্তোলিত করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন, আর পিতা আমার, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আ মরি মরি, কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে' (৩য় খণ্ড)।

১. বিদ্যাসাগর রচনাবলী (২য়), ২৯২—২৯৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার (১ম সং)।
৩. 'কিছুদিন পূর্বে, ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি শেক্সপীয়রের প্রণীত ভ্রান্তিপ্রহসন পড়িয়া আমার বোধ হইয়াছিল, এতদীয় উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত হইলে লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে। তদনুসারে ঐ প্রহসনের উপাখ্যান ভাগ বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত ও ভ্রান্তিবিলাস নামে প্রচারিত হইল।'

দেখতে পাচ্ছি, এখানে সাধুগদ্য কর্কশরূপ পরিত্যাগ করে উর্বরা শ্যামল মাটিতে নেমে এসেছে। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সেখানেই উপন্যাসের ফসল ফলিয়েছেন।

'সীতার বনবাসের' আর এক জায়গায় দেখি :

'রামের সহিত সমাগম হইলে, যে সকল ব্যাপার ঘটিতে পারে, তিনি তৎসমুদয় আপন চিত্তপটে চিত্রিত করিতে আরও করিলেন। তিনি একবার বোধ করিলেন, যেন তিনি রামের সম্মুখে নীত হইয়াছেন, রাম লজ্জায় তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না ; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন রাম, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, স্নেহভরে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেছেন, তিনি কথা কহিতেছেন না,...অভিমান ভরে বদন বিরস করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন ;...আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন হিরন্ময়ী প্রতিকৃতি অপসারিত হইয়াছে ; তিনি, রামের বামে বসিয়া, যজ্ঞক্ষেত্রে সহধর্মিণীর কার্য সম্পন্ন করিতেছেন।'

মনে হচ্ছে যেন বিদ্যাসাগর এখানে উপন্যাসের কোন এক হতভাগিনী নায়িকার পুনর্মিলনের সকরুণ ছবি আঁকছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে বাংলা গদ্যে এই নির্মাণক্ষমতা বিদ্যাসাগরই সূচনা করে দেখালেন। সাধুভাষা মৌলিক সৃষ্টির পক্ষে যে উপযোগী হয়ে উঠেছে, বিদ্যাসাগর তা প্রমাণ করে দেখালেন।

আবার, 'ভ্রান্তিবিলাসে' দেখি :

'চিরঞ্জীব নিতান্ত অধৈর্য হইয়া বলিলেন, কিঙ্কর! তুমি বড় নির্বোধ, যত আমার ভাল লাগিতেছে না, ততই তুমি পরিহাস করিতেছ ; বারংবার বারণ করিতেছি, তথাপি ক্ষান্ত হইতেছ না ; দেখ, সময়ে সকলই ভাল লাগে ; অসময়ে অমৃতও বিস্বাদ ও বিষতুল্য বোধ হয়। যাহা হউক, আমি তোমার হস্তে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছি, তাহা কোথায় রাখিলে বল। কিঙ্কর বলিল, না মহাশয়! আপনি আমার হস্তে কখনই স্বর্ণমুদ্রা দেন নাই। তখন চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্কর! আজ তোমার কি হইয়াছে বলিতে পারি না। পাগলামির চূড়ান্ত হইয়াছে, আর না, ক্ষান্ত হও।'[১]

এখানে দেখতে পাচ্ছি—ভাষায় যথেষ্ট কথ্য উপাদান রয়েছে। আমরা যে ভাষায় সচরাচর কথাবার্তা বলি, এখানে তার সঙ্গেই ক্রিয়া ও সর্বনামপদে সাধুরূপ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বিদ্যাসাগরীয় গদ্যকে উৎকট বা পণ্ডিতীভাষা বলে বর্ণনা দেন, তাঁরা 'ভ্রান্তিবিলাস' পড়লে সে অভিযোগ তুলে নিতেন।

এ সব ছাড়াও বিদ্যাসাগর অনেক জায়গায় সরাসরি কথ্য উপাদান ব্যবহার করেছেন। যাতে মনে করা যেতে পারে তিনি কথ্যরীতির প্রয়োগ জানতেন। কিন্তু কোন কারণে প্রয়োগ করেন নি। এখানে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর কথ্য ব্যবহারের প্রমাণ পেতে পারি। যথা :

'আপনি জানেন না, এ ঋষিকুমার নয়।' 'ওকে ওকে দেখে তুই কাঁদিস কেন?' (শকুন্তলা) 'এই পরাধীনতার ভয়েই বুঝি তুমি বিবাহ করিতে চাও না।' 'বিলাসিনী হাস্যমুখে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ ও এক কারণ বটে,' 'এই তোমার পাগলামির ফল ভোগ কর ;' 'আমি এখন আর সে চন্দ্রপ্রভা নই, তোমার পরিণীতা বণিতাও নই।' 'ও কি হে, তুমি যে আমায় একবারে অবাক করিয়া দিলে।' (ভ্রান্তিবিলাস)

এসব ক্ষেত্রে ভাষারূপই কথ্য নয়, 'দেখে', 'নয়', 'চাও না', 'নই' প্রভৃতি ক্রিয়াপদেও

১. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, ৩৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কথ্যরূপের প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছি। আবার 'ওকে', 'তুই', 'তোমার', 'আমার' প্রভৃতি সর্বনামের ব্যবহারেও কথ্যরূপ রয়েছে।

৩.

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের কাল (১৮১৮–১৮৭২)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও ব্যক্তিত্বপ্রধান গদ্যের যুগে, বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের উদ্ভব গদ্যের বিকাশকে তরান্বিত ও প্রভাবিত করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। একদিকে পাঠ্যপুস্তকের গদ্য, আর একদিকে অনুবাদ-গদ্য—দুটোই সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করছিল। সেকালের সাধারণ বাঙালি পাঠক সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতীবাংলা ও আরবি-ফার্সিবহুল আদালতি বাংলার রসহীন গতানুগতিক পথে বিচরণ করতে বাধ্য হোত। এমন সময় সংবাদপত্র-সাময়িকপত্রের মধ্যে তারা আরও একটা সরল, সুগম বিষয়ী বাংলার সন্ধান পান।[১] গদ্যকে সব কাজে প্রয়োগ এবং সর্বজনের ব্যবহারযোগ্য করে তুলতেও এই সব পত্র-পত্রিকার ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। 'গদ্য সাহিত্য সাহিত্যিক গদ্যে পৌঁছতে গেলে মাঝখানে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের যুগকে অতিক্রম করতে বাধ্য হয়, ওটা একেবারেই অপরিহার্য। ওতে গদ্য সাহিত্যের নমনীয়তা বাড়ে, শব্দ-সম্ভার বাড়ে, সর্ব কাজে ব্যবহারযোগ্যতা বাড়ে, আর সেই সঙ্গে বাড়ে সর্বজনের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা।'[২]

আঠারো শতকের গোড়ায় যাঁরা 'নব্য ইংরেজি' গড়ার কাজে হাত দিয়েছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই সাময়িকপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যেও যাঁরা 'নব্য গদ্য' গড়তে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই কোন না কোন ভাবে পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁদের মধ্যে প্রধান।[৩]

ঐতিহাসিক তথ্যগতভাবে ১৮১৮ খৃস্টাব্দটিই বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশের কাল বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। আর তখন থেকে চলতি কাল পর্যন্ত অজস্র পত্রপত্রিকা ঘিরে বাংলা গদ্যভাষার বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি ঘটেই চলেছে। সুতরাং চলিতরূপ তথা গদ্য রূপের আলোচনায় এই সব পত্রপত্রিকার আলোচনাও সহজেই এসে যায়। মোটামুটি ১৮১৮ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৭২ খৃস্টাব্দ 'বঙ্গদর্শন'-এর কাল পর্যন্ত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার কাল।

বাংলা ভাষায় সর্ব প্রথম সাময়িকপত্র রূপে শ্রীরামপুর মিশনারিদের প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন'-এর কথা জানা যায়। প্রকাশকাল এপ্রিল ১৮১৮ খৃস্টাব্দ। সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। বাংলা ভাষায় এর আগে আর কোন সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়নি। ইংরাজি ও বাংলাতে এর আখ্যাপত্র ছাপা হোত এই ভাবে—"Dig–Durshun or, The Indian Youth's Magazine" এবং "দিগদর্শন"। অর্থাৎ যুবলোকের কারণ নানা উপদেশ।"

বলা বাহুল্য এতে খৃস্টীয় উপদেশ থাকত না, এটা সম্পূর্ণই ধর্মনিরপেক্ষ পত্রিকা। তাই যুবকদের জ্ঞান বাড়াতে এতে ভূগোল, ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নানান আবিষ্কারের ঘটনা, উত্তমাশা অন্তরীপ যুগে এদেশে আসার জলপথ আবিষ্কারের কাহিনী, ভারতে জন্মে অথচ ইংলণ্ডে জন্মে না এরূপ বৃক্ষকুলের বিবরণ ইত্যাদি স্থান পেত। তাই

১. প্রমথনাথ বিশী, বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, ৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. ঐ, ৪৯ পৃঃ দ্রঃ।
৩. ঐ।

প্রকাশের আট মাসের মধ্যেই 'স্কুল বুক সোসাইটি' কর্তৃক পত্রিকাটি বিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসেবে অনুমোদিত হয়।[১]

১৮১৮ খৃস্টাব্দের মে মাসে আরও দুটো বাংলা সাময়িকপত্র আত্মপ্রকাশ করে। এদের একটি 'সমাচার দর্পণ', অন্যটি 'বাঙ্গাল গেজেটি' (Bengal Gazatte)। 'সমাচার দর্পণের' সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। সম্পাদক নামেই ছিলেন[২], আসলে বাংলা সংবাদ রচনা ও সংকলনের কাজে তাঁর প্রধান সহকারী ছিলেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। পত্রিকাটি শ্রীরামপুর মিশনারিদের পরিচালিত ছিল বলে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এতে হিন্দুধর্মকে হীন করে লেখা ছাপা হোত। পাল্টা প্রতিবাদী কোন লেখা ছাপানোর অবকাশ ছিল না। এই পত্রিকার ভাষা-মাধ্যম ছিল সাধু গদ্য।

'বাঙ্গাল গেজেটির' সম্পাদক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। এটা ছাপা হোত কলকাতা থেকে। এই পত্রটির প্রথম প্রকাশকাল ও সম্পাদকের নাম নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। আমরা তাই সমালোচক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতটিকেই স্বীকার করে নিচ্ছি।[৩] তিনি জানিয়েছেন, ১৫ মে ১৮১৮ খৃস্টাব্দেই 'বাঙ্গাল গেজেটের' প্রকাশকাল। ঐ পত্রে সরকারি বিজ্ঞাপন, আইন, কর্মচারি নিয়োগ সংক্রান্ত নানা সংবাদ ও সরল বাংলায় স্থানীয় লোকের রুচিকর নানা কথা থাকত। সহমরণ বিষয়ে রামমোহন রায়ের 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ' প্রবন্ধটি এতে পুনর্মুদ্রিত হয়। এর সডাক মাসিক মূল্য ছিল দুটাকা। বাঙালি প্রবর্তিত এটাই ছিল প্রথম বাংলা সংবাদপত্র--The first native weekly Journal Printed in India.[৪] এ পত্রের ব্যবহৃত গদ্যও সাধু।

'সমাচার দর্পণের' পাল্টা হিন্দুধর্ম ও সমাজের পক্ষে রামমোহন, ভবানীচরণ ও আরও কিছু উৎসাহী ব্যক্তি ১৮২১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে সাপ্তাহিক 'সম্বাদ কৌমুদীর' জন্ম দিলেন। অল্পকাল পর সমাজ সংস্কার বিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতের অমিল হওয়ায় 'কৌমুদীর' সম্পর্ক ত্যাগ করে রামমোহন ১৮২২ খৃঃ মার্চ থেকে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে নতুন আর একটি সাপ্তাহিকের সূচনা করলেন।

এসব পত্রের ভাষারূপ সাধারণত সাধুগদ্য। তবে রামমোহনের এই নতুন পত্রের ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল। যথা, 'গ্রীকদেশে একজন পণ্ডিত অবিরোধে কালযাপন করিতেন। এক সময় তিনি আপন আপন মিত্রদিগের সহিত পথভ্রমণ করিতেছিলেন, ইত্যবকাশে এক ব্যক্তি গোঁয়ার আসিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিল। তাহাতে তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না, ইহা দেখিয়া তাঁহার মিত্রেরা কহিল, 'একি! আপনি ইহাকে যে কিছু কহিলেন না।' পণ্ডিত কহিলেন, 'কোন ব্যক্তি যদি গর্দ্দভের নিকট যায় এবং সে গর্দ্দভ চাইট মারে তবে কি গর্দ্দভের নামে কেহ নালিশ করিয়া থাকে?'

(—১৮২৩, ক্ষমাশীল পণ্ডিত উপাখ্যান)

একালের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র 'বঙ্গদূত' ১৮২৯ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

১. ড. সবিতা চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক, ৩৭৭পৃঃ দ্রঃ। বাঙ্গালা সাময়িক পত্র (১ম), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪ দ্রঃ।

২. সাহিত্য সাধক চরিত মালা, ১ম খণ্ড, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩. ঐ

৪. Friend of India, Quarterly Series, 1820, p. 135.

সম্পাদক ছিলেন নীলরত্ন হালদার। পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন--রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি সেকালের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি।

১৮৩১ সালের ২৮ জানুয়ারি থেকে সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর' আত্মপ্রকাশ করে। পরে ১৮৩৬ সালের ১০ আগস্ট থেকে এর পুনঃ প্রকাশ ঘটে বারত্রয়িক রূপে। শেষে ১৮৩৯-এর ১৪ জুন বাংলা ১লা আষাঢ় ১২৪৬ সন থেকে এটি বাংলা ভাষায় প্রথম দৈনিক হয়ে জন্ম নেয়।

'সংবাদ প্রভাকর' অনেক কাল বেঁচেছিল। ক্রমে এটি এক উচ্চাঙ্গের বাংলা সংবাদপত্র হয়ে ওঠে। আর সেকালের বাংলা সাহিত্যের ভাগ্যবিধাতাও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্রের মত কালজয়ী লেখকদের হাতেখড়ি এখান থেকেই। বহু সম্ভ্রান্ত ধনবান কৃতী লেখক ও পাঠক এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

এতে বাঙালির সমাজ, অর্থনীতির কথা, যুদ্ধ-বিগ্রহের সংবাদ, দেশিয় ঐতিহ্য-প্রীতির বিবরণ, শিক্ষা-সংস্কার, নীলকর সাহেবদের প্রজাপীড়ন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সূর্যাস্ত আইনের জন্য জমিদারি নিলাম ও প্রজাদের কষ্টের চিত্র প্রভৃতি ছিল মুখ্য। তার উপর নতুন বই প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি, প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী ও রচনা বহু কষ্টে সংগ্রহ করে এনে নিয়মিত প্রভাকরে প্রকাশ করে ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা সাংবাদিক জগতের গোড়াপত্তন করে যান।

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যবহৃত গদ্য ছিল সাধু। বাক্য দীর্ঘায়ত ও অনুপ্রাসবহুল। আচার্য সুকুমার সেন তাই মন্তব্য করেছেন যে, পদ্যের মত গদ্যে ঈশ্বর গুপ্তের অতটা দক্ষতা দেখা যায়নি।[১] তবে সাধারণ সংবাদের ভাষায় সরল সাধুরূপ উল্লেখ করার মত। যথা, 'নীলকর সাহেবেরা প্রজাদের উৎপীড়ন করেন।...তাহার উপর আইনবলে মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে। তাঁহারা পনের দিনের জন্য কারাবাস ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করিতে পারেন। তাঁহাদের সেই আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা চলে না। সেই আইনের প্রতিবাদ করা হইয়াছে।'[২]

'প্রভাকর' ছাড়া সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ রত্নাবলী', 'পাষণ্ড পীড়ন' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' নামে আরও তিনটি সাপ্তাহিকের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন।

৪

'সংবাদ প্রভাকরের' পরে উল্লেখযোগ্য সাময়িক 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৮৪৩ খৃঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাময়িক পত্র-ধারায় এক নতুন কালের সূচনা করল। সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর ভাষায়, 'আমাদের এই স্বল্পায়ুর দেশে—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দীর্ঘজীবন একটি বিস্ময়। তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র রূপে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রিকাখানির সৃষ্টি হলেও বাংলা সাহিত্যে এর পরোক্ষ প্রভাবটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এর প্রভাব ও দান অপরিসীম।'[৩]

এই পত্রে নানা যুক্তিবাদী মননধর্মী ও জ্ঞানগর্ভ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ থাকত। তাই বিষয় গৌরবের জন্যে পত্রিকাটি সেকালে হুগলি কলেজের ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট

১. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৪৪—৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. সংবাদ প্রভাকর, সম্পাদকীয়, ২রা আষাঢ় ১২৫৫, ১৮৪৮ জুন।
৩. বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, ৭০ পৃঃ দ্রঃ।

ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ছাড়া বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসুর মতো সেকালের চিন্তাশীল গদ্য-লেখকগণ এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অক্ষয়কুমার প্রথম বারো বছরের সম্পাদক ছিলেন। পরে অল্প কিছুকাল বিদ্যাসাগর মহাশয় এটির সম্পাদক হন।

সম্পাদক অক্ষয়কুমারের কৃতিত্ব: 'বাংলা গদ্যরীতি পরিণত হয়ে ওঠবার পরে জন্মগ্রহণ করলে অক্ষয় দত্ত বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক লেখক হতে পারতেন। কিন্তু তখন অনেক অবান্তর কাজ তাঁকে করতে হয়েছে; বাংলা গদ্যরীতি তৈরি ক'রে নিতে হচ্ছে, অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে--পুরো মনটা তিনি দিতে পারেননি বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনার কাজে। তবু তাঁর প্রধান কীর্তি এই যে, তিনি সর্ব্ব প্রথমে দেখিয়ে গিয়েছেন যে, বাংলা ভাষাতে যুক্তি-সন্নিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক রচনা সম্ভব।[১]

তবু সমালোচক প্রমথনাথ বিশী মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, গদ্যরীতির বিচারে অক্ষয় কুমারের স্থান বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথের নীচে।[২] তাছাড়া তাঁরা নিয়মিত ভাবে গোড়ার দিকে অক্ষয়কুমারের লেখা সংশোধন করে দিতেন।[৩]

তাঁর প্রথম রচনা 'অনঙ্গমোহন কাব্য' ১২৪৮ সনের আগে প্রকাশিত হয়।[৪] গদ্য লেখার সূচনা ঈশ্বর গুপ্তের অনুরোধে।[৫] ১৮৪০ খৃঃ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হলে অক্ষয় কুমার তার শিক্ষক নিযুক্ত হন। তারপর ১২৪৮ সনে তিনি ছাত্রপাঠ্য একটি ভূগোল বই লেখেন। সেটাই তাঁর গদ্যের প্রথম বই।

১৮৫৫ খৃঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তারপর অক্ষয়কুমারের হাত দিয়ে আরও কয়েকটি গদ্যগ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেগুলোর মধ্যে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫২ ১ম খণ্ড, ১৮৫৩ ২য় খণ্ড), চারুপাঠ (১ম ভাগ ১৮৫১, ২য় ভাগ ১৮৫২ ও ৩য় ভাগ ১৮৫৯), ধর্মনীতি (১৮৫৫), পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১ম ১৮৭৬, ২য় ১৮৮৩) গ্রন্থটি তাঁর আর একটি সমাদৃত গদ্য বই। তাঁর মৃত্যুর পরে পুত্র রজনীনাথ দত্ত তত্ত্ববোধিনীর কিছু ভাল প্রবন্ধ সংকলিত, সম্পাদিত ও পরিবর্তিত করে 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার' (১৯০১) নামে প্রকাশ করেন।

এই সব গ্রন্থে অক্ষয়কুমার তৎসম শব্দবহুল এক প্রকার গম্ভীর সাধুগদ্যের প্রয়োগ করেন। যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক রচনা সঠিক ভাবে প্রথম তাঁরই কীর্তি। আচার্য সুকুমার সেন তাই তাঁর রচনায় মাধুর্যগুণের অভাব লক্ষ্য করেও স্বীকার করেন যে, তাঁর রচনা ছিল প্রকাশক্ষম, বাহুল্যবর্জিত, ব্যবহারোপযোগী ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। তাই তাঁর গদ্য তৎসম শব্দবহুল সাধু।[৬]

কিন্তু চিঠিপত্রের মধ্যে গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমারের সহজ অনাড়ম্বর মূর্তির পরিচয় মেলে। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা তাঁর একটি পত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় :

'প্রভাকর সম্পাদক আপনাকে একটী প্রার্থনা জানাইয়াছেন। মেদিনীপুরের সংবাদগুলি

১. বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, ৭১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. ঐ
৩. বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, রাজনারায়ণ বসু, ২৫-২৬ পৃঃ।
৪. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ড. সুকুমার সেন, ৪৮ পৃঃ।
৫. সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১ম), অক্ষয়কুমার দত্ত, ১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। অক্ষয় চরিত।
৬. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃঃ ৫২

তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলে তিনি চরিতার্থ হইবেন, এবং আপনার নিকট যাবজ্জীবন বাধিত থাকিবেন। ঝক্‌ড়া, মারামারি, ডকাইতি, গৃহদাহ, চুরি, নরহত্যা প্রভৃতি যত প্রকার সর্ব্বনাশের ব্যাপার আছে, সকলই লিখিয়া দিবেন। বাস্তবিক দেখিবেন, মনুষ্যের অমঙ্গল সমাচারই অধিক লিখিত হইবে। এই সকলই লোকের কার্য্য।'

৫.

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম গদ্যশিল্পী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মানুরাগের প্রেরণায় নতুন একটি শাখার সৃষ্টি করলেন, ধর্মোপদেশের শাখা। বাংলা গদ্য সাহিত্যে এটি একেবারে নতুন।[১] কেননা, কথকতা পাঁচালি প্রভৃতি গদ্যের মধ্যে দিয়ে সেকালে মুখে মুখে ধর্মোপদেশের চলন ছিল। কিন্তু লিখিত গদ্যে তাকে উপস্থাপিত করা দেবেন্দ্রনাথের আগে আর কেউ করেন নি। পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রীর হাত ঘুরে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-স্পর্শে শাখাটি পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।[২]

অন্যদিকে তাঁর অসাধারণ সামাজিক প্রতিভা ছিল যার সাহায্যে তিনি বহুতর সামাজিক সংগঠন গড়ে সেই শক্তির পরিচয় দেন। সেই শক্তির জোরেই দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' মতো একটি সিরিয়াস পত্রিকার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। সমালোচক প্রমথ-নাথ বিশী তাঁর সম্বন্ধে যথার্থই মন্তব্য করে বলেছেন, 'প্রথম আমলে উইলিয়াম কেরী সাহিত্যিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে বাংলা গদ্যরচনার সূত্রপাত করেছিলেন, পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ যেমন নিজ নিজ মুখপত্রের সূত্রে সাহিত্যিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথও তেমনি করে বা তার চেয়েও বেশি করে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলেছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীকে। দেবেন্দ্রনাথ যদি আর কিছু নাও করতেন তবু এই কারণের জন্যেই অমর হয়ে থাকতেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে।[৩]

বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত ভাষণ ও উপদেশগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নিয়মিত ছাপা হোত। পরে বই হয়ে সেগুলি 'ব্রাহ্মধর্ম' (১৮৫২), 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' (১৮৬২), 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (১৮৬১—৭২) প্রভৃতি নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর স্বরচিত 'জীবন চরিত' (১৮৯৮) বাংলা সাধুগদ্যের এক অমূল্য সম্পদ।

তাঁর গদ্যের বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর নিজস্ব গদ্যভঙ্গি বা স্টাইল। খুশিমত শব্দের সাজ পরিয়ে ভাবকে স্বাচ্ছন্দ্যচারী করতে সেই সময়ে তাঁর মত, এক বিদ্যাসাগর ছাড়া, আর কারো গদ্যে দেখা যায়নি। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর 'জীনচরিত' থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে : 'পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর। আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটা-জুট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার

১. সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১ম), অক্ষয়কুমার দত্ত প্রবন্ধ।
২. প্রমথনাথ বিশী, বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, ৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
৩. বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, ৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি তবে ইহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব। ফলতঃ তাহাই হইল।...তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।'[১]

সাধুগদ্যের এমন সহজ সরল অথচ নিপুণ গাঁথুনি লক্ষ্য করে সমালোচক প্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাই মন্তব্য করেছেন, 'দেবেন্দ্রনাথের কলম যদি জীবনের লৌকিকক্ষেত্রে, প্রাত্যহিক সুখদুঃখের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতো তবে হয়তো এ পর্বকে কেবল বিদ্যাসাগরের যুগ না বলে দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের যুগ বলা যেত।'[২]

৬.

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬–১৮৯৯)

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে, এমন গদ্য লেখকদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু অন্যতম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যেসব মনীষী জন্মগ্রহণ করেন, রাজনারায়ণ বসু তাঁদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ইংরাজি শিক্ষাদীক্ষা পেয়েও তিনি জাতীয় বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বজায় রাখতে পেরেছিলেন।[৩] নিজের সম্বন্ধে 'আত্মচরিতে'[৪] মন্তব্য করেছেন, 'আমার ধাতু বরাবর বাঙ্গালীতর, আমার কলেজে শিক্ষা উহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলমের ন্যায় উহা আমার প্রকৃতির উপর গাঢ় রূপে বসে নাই।' যেমন নিজের সম্বন্ধে তেমনি বাংলা সাহিত্য চর্চাতেও একই মাপকাঠি দিয়ে তাঁকে মাপা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, 'রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরাজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ। কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহে শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন।'[৫]

তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থই প্রথমে বক্তৃতা ও পরে তত্ত্ববোধিনীতে 'প্রস্তাবাকারে' ছাপা হয়েছিল। এদের মধ্যে 'রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা' (১ম ভাগ, ১৮৫৫ ; ২য় ভাগ ১৮৭০) ব্রহ্ম সাধন (১৮৬৫), ধর্মতত্ত্ব দীপিকা (১ম ভাগ, ১৮৬৬, ২য় ভাগ ১৮৬৭), বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা (১৮৭৮), 'আত্মচরিত' (১৯০৯) উল্লেখযোগ্য। ইংরাজিতেও তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

বাংলা গদ্যে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ঝরঝরে সাধুগদ্যের ব্যবহার করেন। এই গদ্য পাঠ করে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে এক পত্রে লেখেন, 'সেদিন আমি তাহা দেখিতে দেখিতে আমার নয়ন ও মন তৃপ্তিরসে আর্দ্র হইতেছিল, তোমার সে রচনা আর আমার নিকট পুরাতন হয় না। আদিম ঋষির রচনার ন্যায় তোমার এ রচনা।'[৬]

১. বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক ২৯–৩০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, ৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
৩. শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৪র্থ) রাজনারায়ণ বসুর উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।
৪. আত্মচরিত, পৃঃ ৬৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
৫. জীবনস্মৃতি, ৯৩ পৃঃ (বিশ্বভারতী সং) দ্রষ্টব্য।
৬. পত্রাবলী, পৃঃ ২৫ দ্রষ্টব্য।

৭.

তত্ত্ববোধিনী পরবর্তী থেকে বঙ্গদর্শন পর্যন্ত সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' আদর্শ পরবর্তী কালে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভ' প্রভৃতি পত্রিকার মধ্যে দিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' ও দ্বিজেন্দ্রনাথের 'ভারতী'তে নবরূপ লাভ করে।[১] বিবিধার্থ সংগ্রহের সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১৮৫১ সালে 'ভার্ণাকিউলার লিটারেচার সোসাইটির' আনুকূল্যে মাসিকপত্র রূপে প্রকাশিত হয়। প্রকৃত সাহিত্য সমালোচনা এখান থেকেই শুরু।

১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মাসিক পত্রিকা'। এই পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যার শীর্ষে এই সম্পাদকীয় মন্তব্য থাকত :

'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।' তারপর সত্যি সত্যিই সপ্তম সংখ্যা ১৮৫৫ সাল থেকে 'আলালের ঘরের দুলাল' নামে নতুন গদ্যের রূপে একটি 'উপন্যাস' ছাপা শুরু হয়। তবে সম্পাদকের দাবি অনুযায়ী 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভাষাকে পুরোপুরি লেখক কথিত সচরাচর কথাবার্তার ভাষায় লেখা হয়নি। যথা : 'কিয়ৎক্ষণ পরে বর মণিরামপুরে গিয়া উত্তীর্ণ হইল—বর দেখিতে রাস্তার দোধারি লোক ভেঙ্গে পড়িল—স্ত্রীলোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—ছেলেটির শ্রী আছে বটে কিন্তু নাকটি একটু টেকাল হলে ভাল হইত—কেহ বল্‌তে লাগিল রংটি কিছু ফিকে একটু মাজা হলে আরও খুল্‌তো।'[২]

এখানে ক্রিয়াপদের ব্যবহারে কতক সাধুও আছে চলিতও আছে। আবার যৌগিক ক্রিয়ায় দুটো রূপই একসঙ্গে রয়েছে। সাধুচলিত মিশ্রিত এক প্রকার মিশ্ররূপ এতে বর্তমান। তবে ভাষায় অভিনবত্ব এল তা বলা যায়। অন্তত কথ্যরূপ 'মাসিক পত্রিকা' পরবর্তী পত্র-পত্রিকায় প্রভাব বিস্তার না করলেও, সাধুগদ্যের একচ্ছত্র রাজ্যে কিছুটা স্বীকৃত আসন করে নিতে পেরেছে, এটা বলা অন্যায় হবে না।

এরপরেই মনে আসে 'বঙ্গদর্শনের' কথা। তত্ত্ববোধিনী-পরবর্তী এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় সাময়িক পত্রিকা বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় ১৮৭২ খৃঃ প্রকাশিত হয়। এখান থেকেই সৃজনধর্মী সাহিত্যের ফসল ঘরে উঠতে থাকে একের পর এক। সমালোচনা, প্রবন্ধ, জীবনী, রচনা সাহিত্য, ঐতিহাসিক-সামাজিক উপন্যাস প্রভৃতি সম্পদ পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে 'বঙ্গদর্শন নিজেই একটা যুগ হয়ে রয়েছে।

তবে সে সবই সাধুরূপে লেখা গদ্য। প্যারীচাঁদ-কথিত কথাবার্তার ভাষার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কিন্তু হুতোমের গদ্য বা মধুসূদনের নাটকীয় কথ্যরূপের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় ঘটে গেছে। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও চলিতরূপের বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন ও চলিতরূপের পক্ষেই মত দেন। কিন্তু নিজে সব কিছু সাধুগদ্যেই লিখে গেছেন। এই কারণে 'বঙ্গদর্শন' পর্যন্ত বাংলা সাময়িক পত্রের গণ্ডী টানাই সঙ্গত বলে মনে করি।

১. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য।
২. প্যারীচাঁদ রচনাবলী, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ৫০ পৃঃ দ্রঃ।

REGULATIONS

FOR THE

ADMINISTRATION

OF

JUSTICE,

IN THE

COURTS OF DEWANNEE ADAUL.

Passed in Council, the 5th July, 1785.

WITH A BENGAL TRANSLATION,

BY JONATHAN DUNCAN.

CALCUTTA:

AT THE HONORABLE COMPANY'S PRESS.

M,DCC,LXXXV.

জোনাথান ডানকানের অনুবাদ-গ্রন্থের প্রচ্ছদ।

চতুর্থ অধ্যায়

চলিত গদ্যের আবির্ভাব

(১৮৫৫–১৯০০)

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩)

বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের যুগে বাংলা সাধুগদ্য এক অনাড়ম্বর সরল মার্জিত আকার ধারণ করে। 'তত্ত্ববোধিনী' থেকে 'বঙ্গদর্শন' পর্যন্ত ২৯ বছর বাংলা সাধুগদ্য নানা চড়াই উতরাই বেয়ে এক বহুমখী সৃজনধর্মী ক্ষমতায় বলবান হয়ে ওঠে। কিন্তু তাতে তদ্ভব, দেশি-বিদেশি শব্দের তুলনায় তৎসম ও সংস্কৃত শব্দের বাহুল্যই চোখে পড়ে। সাহিত্যের ভাষা ক্রমশ কথাবার্তার ভাষা থেকে অনেক দূরে সরে যায়। সেই ব্যবধান কমিয়ে আনতে যেসব গদ্যলেখক প্রথম এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র অন্যতম। কেবল অন্যতম নয়, তাঁর কৃতিত্বই বেশি।[১] কেননা, তিনি সব চেয়ে আগে 'মাসিক পত্রিকার' মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে নিজের প্রচেষ্টাকে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চাইলেন। তারপর সত্যি সত্যিই 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশনার মাধ্যমেই বাংলা ভাষায় এক অভিনব আন্দোলন সূচনা করলেন, সেকথা আগেই বলা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে তিনি 'টেকচাঁদ ঠাকুর' নামে পরিচিত। এই ছদ্মনামে তাঁর প্রায় সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'আলালের ঘরের দুলাল' ছাড়া তিনি—'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), কৃষিপাঠ (১৮৬১) 'ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত' (১৮৭৮), 'বামাতোষিণী' (১৮৮১) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে 'আলালের' লেখক[২] বলেই তাঁর বেশি পরিচিতি।

'আলালের ঘরের দুলাল' বিলিতি আদর্শে লিখিত প্রথম উপন্যাস। অন্তত কাহিনীর সম্ভাব্য বাস্তবতার দিক থেকে এই জাতীয় রচনা 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম।[৩]

কিন্তু অনেকগুলো দোষের জন্যে একে উপন্যাস না বলে 'নক্সা-উপন্যাস' বলা সঙ্গত। প্রথমত, কাহিনী খাপছাড়া ধরনের, ঘটনা-প্রবাহ ধারাবাহিক নয়। বর্ণিত কথাবস্তু অনেক জায়গায় বিষয় ও চরিত্রের পরিণতির পক্ষে নিতান্ত গৌণ। দ্বিতীয়ত, একটি ছাড়া কোন চরিত্রই পূর্ণ বিকশিত নয়। তৃতীয়ত, নারী চরিত্রগুলো কাহিনীর পক্ষে অনেকটাই অবাস্তব। চতুর্থত, সাধারণত উপন্যাসে অপেক্ষিত প্রণয়রস একেবারেই নেই। এই সব কারণে অনেকে 'আলালের ঘরের দুলাল'কে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলতে চান নি।[৪]

কথাবস্তুর পরিকল্পনায় লেখক তাঁর পূর্বসূরী কোন কোন লেখকের কাছে কিছুটা ঋণী ছিলেন। 'হঠাৎ বড়লোকের' ছেলের উচ্ছৃঙ্খলতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাবুবিলাসে' ও 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যান' প্রবন্ধে মেলে। হাস্যরসের যোগান দিতে

---

১. বাংলা গদ্যের চারযুগ, ড. মনোমোহন ঘোষ, ১৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২. 'টেকোচাঁদ (অর্থাৎ সম্পূর্ণ মসৃণ ও গোলাকার) ঠাকুর (অর্থাৎ দেবতা) অর্থাৎ শালগ্রাম।' আচার্য সুকুমার সেনের ঐ মন্তব্যে (বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য দ্রষ্টব্য) ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্যারীচাঁদ রচনাবলী, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ড. সুকুমার সেন, ৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪. ঐ।

'আলালের ঘরের দুলালের' অনেকগুলো প্রস্তাব মূল কাহিনীর সঙ্গে অসম্বদ্ধ হলেও সংযোজিত হয়েছিল।[১]

কাহিনী-বিন্যাসে ও প্রকাশ নৈপুণ্যের অভাবে অনেক ঘটনা মাঝপথেই শেষ হয়েছে। যেমন, মতিলাল ও তার বাবা বাবুরামবাবুর বিয়ের দুটো ঘটনার সব কিছু বলা হয়েছে। তারপর বিয়ের আসরে ঝন্ঝাটের কথা পাই। কিন্তু রণদামামার মাঝখানে শেষপর্যন্ত বিয়ে হল কি না, তার জন্যে পাঠককে বিস্তর পরিশ্রম করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে একটা ঘটনার পরিণতি বুঝতে আর একটা ঘটনার উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন, রামলালের দেশভ্রমণ জানতে পারি। কিন্তু কাশীতে বাস করে বহু টাকা উপায় ও দানধ্যান করার ব্যাপার জানা যায়, তার মা ও ভগিনীর অর্থ সাহায্য চাইতে আসার সময়।

আখ্যানের নাম দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এ গল্পের নায়ক 'মতিলাল'। তাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর শেষ পরিণতি চোখে পড়ে। অথচ কেন্দ্রে 'ঠকচাচা' এসে পড়েছে। তার কার্যকলাপের উপর ঘটনার আবর্তন নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। 'সুতরাং ঠকচাচাই আলালের ঘরের দুলালের কেন্দ্রীয় চরিত্র।' সেই তুলনায় মতিলাল চরিত্র 'নিতান্ত অনুজ্জ্বল। আচার্য সেন ঠকচাচার চরিত্র অঙ্কনে ডিকেন্সের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন এবং আরও মন্তব্য করেছেন, 'ঠকচাচা কবিকঙ্কণের ভাঁড়ুদত্তের মতো উজ্জ্বল, জীবন্ত চরিত্র। সাহিত্যে অমরত্বের ছাড়পত্র তাহার আছে।'[২]

অসৎ প্রকৃতির চরিত্রগুলোর প্রতি 'থিয়সফিস্ট' প্যারীচাঁদের প্রসন্ন প্রশ্রয় ও স্নেহপ্রবণ মমতা ছিল। বরং সেই তুলনায় তাঁর আখ্যানের সৎ-চরিত্রগুলো কিছু নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। মতিলালের ভাই রামলাল ও তাঁর শিক্ষক বরদাবাবুর চরিত্র সমাজের আদর্শ স্থানীয়। কিন্তু হলধর-গদাধর-গোবিন্দ-মতিলাল চরিত্রগুলো অনেক বেশি সতেজ ও স্বাভাবিক মনে হয়। তবে দুধরনের চরিত্রই এতে সরলরেখায় টানা। এদিক থেকে আদর্শভ্রষ্ট মতিলালের স্বাভাবিক জীবনে ফেরা ও মা-ভাই স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার ঘটনা ছকে বাঁধা মনে হলেও, নীতিবাগিশ ও অধ্যাত্মপন্থী প্যারীচাঁদ-মানসিকতাই সেজন্যে দায়ী।[৩] এ সব কারণেই অনেকে 'আলাল'কে 'Tale' বা কাহিনী মাত্র বলতে চান, উপন্যাস বলতে রাজি নন।[৪]

'আলালের ঘরের দুলালের' বড় আকর্ষণ এর ভাষা। সাধুভাষার কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে থাকলেও তা সর্বসাধারণের বোধগম্য সরল ও সহজ ভাষা। সাধুভাষার যুক্তক্রিয়ার বদলে চলিত ভাষার ধাতুর ব্যবহার, তদ্ভব ও দেশি শব্দের বহুল প্রয়োগ, বড় বড় সমাসবদ্ধ শব্দের সীমিত প্রয়োগ, কথ্যভাষায় ব্যবহৃত ফারসি শব্দের ও কথ্যভাষাসুলভ বাক্যাংশের বা ইডিয়ামের এবং প্রবাদবাক্যের প্রয়োগ—এ ভাষায় বৈশিষ্ট্য এনেছে।[৫] সমালোচক ড. মনোমোহন ঘোষ তাই বলেছেন, 'অংশত কৃত্রিম ও শ্লথগতি সাধুভাষা বেশ বেগ্‌বান এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। সমাসাড়ম্বরে ও খাঁটি সংস্কৃত শব্দে পূর্ণ বিদ্যাসাগরীভাষা প'ড়ে প'ড়ে লোকে ভুলেই যাচ্ছিল যে, সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে মুখের কথার কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

১. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ড. সুকুমার সেন, ৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. ঐ ৭৬-৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
৩. প্যারীচাঁদ রচনাবলী, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভূমিকা, ২১-২২ পৃঃ।
৪. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৭৫ পৃঃ ও প্যারীচাঁদ রচনাবলীর ভূমিকা ২২ পৃঃ।
৫. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ড. সুকুমার সেন, ৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

'আলালের ঘরের দুলাল' এ সম্বন্ধে দেশের লোককে বেশ ভাল করেই জানিয়ে দিল। আর চলিত ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করেও লেখার মধ্য দিয়ে যে, উত্তম সাহিত্যরস পরিবেশন করা যায় একথাও প্রমাণ করলেন প্যারীচাঁদ।'[১]

তবে 'আলাল' আদ্যোপান্ত চলিতেও লেখা হয়নি, সাধুরূপেও নয়। দুই রূপের মিশ্রিত একটা সহজ সাধুগদ্যের প্রয়োগ করে গদ্যভাষাকে কথাবার্তার ভাষার কাছে টেনে আনাই ছিল লেখকের অভিপ্রায়। সেই জন্যে এতে একদিকে যেমন অক্ষয় দত্ত দেবেন্দ্রনাথের সাধুগদ্যের প্রভাব দেখতে পাই, অন্যদিকে কলকাতা ও চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের ভদ্র, অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালির মুখের ভাষার রূপও বর্তমান। আবার অক্ষয় দত্ত দেবেন্দ্রনাথের সাধুগদ্যের কালে তত্ত্বব ও ফার্সিবহুল সাধুগদ্যের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে টেকচাঁদ ঠাকুরের স্বকীয় গদ্যভঙ্গির মেজাজও লক্ষ্য করি। 'আলালে' তাই সাধু ও কথ্যরূপের তৎকালে প্রচলিত একাধিক ভাষারূপের সন্ধান মিলবে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা তার প্রমাণ নিতে পারি। প্রথমত, কলকাতা অঞ্চলের ভদ্রশ্রেণীর ব্যবহৃত কথ্যরূপ। যথা :

'রবিবারে কুঠীওয়ালারা বড় ঢিলে দেন—হচ্ছে হবে—খাচ্ছি খাব বলিয়া অনেক বেলায় স্নান আহার করেন। তাহার পরে কেহ বা বড়ে টেপেন—কেহ বা তাস পেটেন—কেহ বা মাছ ধরেন—কেহ বা তবলায় চাটি দেন—কেহ বা সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং করেন—কেহ বা শয়নে পদ্মলাভ ভাল বুঝেন—কেহ বা বেড়াতে যান—কেহ বা বহি পড়েন।'[২]

কিংবা :

'জাদু! তুমি আবার কেমন হবে বলিতে পারি না। ছেলে না হবার এক জ্বালা—হবার শতেক জ্বালা—যদি ছেলের একটু রোগ হলো, তো মার প্রাণ অমনি উড়ে গেল। ছেলে কিসে ভাল হবে এজন্যে মা শরীর একেবারে ঢেলে দেয়—তখন খাওয়া বল, শোয়া বল, সব ঘুরে যায়—দিন কে দিন জ্ঞান হয় না, রাতকে রাত জ্ঞান হয় না, এত দুঃখের ছেলে বড় হয়ে যদি সুসন্তান হয় তবেই সব সার্থক, তা না হলে মার জীয়ন্তে মৃত্যু—সংসারে কিছুই ভাল লাগে না—পাড়াপড়সির কাছে মুখ দেখাতে ইচ্ছে হয় না—বড় মুখটি ছোট হয়ে যায়, আর মনে হয় যে পৃথিবী দোফাঁক হও আমি তোমার ভিতর সেঁদুই।'[৩]

উদ্ধৃতি দুটোর মধ্যে চলিতক্রিয়া ও তত্ত্বব-দেশি-বিদেশি শব্দের ইচ্ছেমত প্রয়োগ দেখি। প্রথমটায় লেখক প্রত্যক্ষ ভাবে ও দ্বিতীয়টার মধ্যে পরোক্ষ ভাবে রয়েছেন বলে, ভাষারূপের পার্থক্যটা চোখে পড়ে। প্রথমটার মধ্যে 'বলিয়া' 'লইয়া', 'বুঝেন' প্রভৃতি ক্রিয়া এবং 'তাহার', 'কেহ' 'বহি' (বই) প্রভৃতি পদ সাধুগদ্যের রূপে ব্যবহৃত হয়ে কথ্য রূপটাতে কিছু কৃত্রিমতা এনে দিয়েছে। অন্যদিকে দ্বিতীয়টির মধ্যে একমাত্র 'বলিতে' ক্রিয়া ছাড়া সবই স্বাভাবিক কথ্যের রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই উদ্ধৃতির মধ্যে এমন অনেক কথ্য বাক্‌রীতির প্রয়োগ রয়েছে, যেগুলো আজকের কথ্যরূপের মধ্যেও সচল রয়েছে। এমন কি 'জীয়ন্তে', 'পাড়াপড়সি', 'দোফাঁক', 'সেঁদুই'—শব্দগুলো এখনো ভদ্র সমাজের মুখের ভাষায় জায়গা অধিকার করে আছে।

১. বাংলা গদ্যের চারযুগ, ১৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. প্যারীচাঁদ রচনাবলী, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
৩. ঐ, ২৬-২৭ পৃঃ দ্রঃ।

প্রথমটায় শিক্ষিত ভদ্রসমাজ, অন্যটিতে অল্পশিক্ষিত ভদ্রসমাজের কথাবার্তার ভাষা পাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর কথ্যরূপটাই টেকচাঁদের কলমে প্রত্যক্ষ ভাবে ধরা পড়েছে। টেকচাঁদের আগে এত জীবন্ত চলিত গদ্যরূপ আর কারো রচনায় দেখা যায়নি।

আবার এর পাশাপাশি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অল্পশিক্ষিত মুসলমান সমাজের মুখের ভাষাকেও পাই। যথা—

'ঠকচাচা। মুইবি সাথে সাথে থাক্‌ব, মোকে আদালত, মাল, ফৌজদারী, সৌদাগরি কোন কামই ছাপা নাই। মোর শেনাবি এসব ভাল সমজে। বাবু আপসোস এই যে মোর কারদানি এ নাগাদ নিদ যেতেচে—লেফিয়ে ২ জাহের হল না। মুই চুপ করে থাকবার আদমি নয়—দোশমন পেলে তেনাকে জেপ্টে, কেমড়ে মেটিতে পেটিয়ে দি—সৌদাগরি কাম পেলে মুই রোস্তম জালের মাফিক চলব।'[১]

এতে বাংলা শব্দের সঙ্গে ইচ্ছেমত আরবি-ফার্সি শব্দের মিশ্রণ দেখতে পাই, উত্তর চব্বিশ পরগনার মুসলমান প্রধান অঞ্চলে এই কথ্যরূপ এখনো বর্তমান। কিন্তু উপরোক্তদের মধ্যে কোন একটিকে বেছে নিয়ে আগাগোড়া সেই রূপে সাহিত্য সৃষ্টি হবে সে ধারণা তখনও টেকচাঁদের মনে হয়নি। তাই কথ্যরূপের সঙ্গে সঙ্গেই সেকালে প্রচলিত সাধুরূপকেও তিনি ফেলে দেননি। তবে তাতে খুশি মত তদ্ভব-দেশি-বিদেশি শব্দ বসিয়ে অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথের সাধুরূপকে তিনি নিজের মত করে গড়ে নিয়েছেন দেখতে পাই। যেমন : 'আসামিরা এ কথার ভাল মন্দ কিছু না বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকিল। এদিকে বিচার আরম্ভ হইয়া ফৈরাদির ও সাক্ষীর জবান্‌বন্দির দ্বারা সরকারের তরফ কৌনসুলি স্পষ্টরূপে জাল প্রমাণ করিল, পরে আসামিদের কৌনসুলি আপন তরফ সাক্ষী না তুলিয়া জেরার মারপেচি কথা ও আইনের বিতণ্ডা করত পেটিজুরিকে ভুলাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার বক্তৃতা শেষ হইলে পর রস্‌ল সাহেব মকদ্দমা প্রমাণের খোলসা ও জালের লক্ষণ জুরিকে বুঝাইয়া বলিলেন—পেটিজুরি এই চার্জ পাইয়া কামরার ভিতর গমন করিল,—জুরিরা সকলে ঐক্য না হইলে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারে না'।[২]

এখানে দেখতে পেলাম, উপরোক্ত দৃষ্টান্তের মধ্যে লেখক তদ্ভব শব্দের সঙ্গে অনায়াসে ফারসি ও ইংরোজি শব্দের প্রয়োগে সাধুগদ্যের শক্তি ও গতি বৃদ্ধি করেন। অথচ সেজন্যে ভাষা দুর্বোধ্য হয়ে পড়েনি। বরং 'চলিত ভাষার মতই সহজবোধ্য এবং লঘুগতি'[৩] সম্পন্ন সাধুগদ্যের প্রচলনে আমরা টেকচাঁদের স্বকীয়তার পরিচয় পাই।

তবু এত কৃতিত্বের মাঝখান থেকেও বলতে দোষ নেই যে, বাংলা গদ্যে টেকচাঁদ ঠাকুর কোন আদর্শ ভাষারূপ দিয়ে যেতে পারেন নি। চলিতরূপের ব্যবহার প্রথম দেখিয়েছেন, তবে তা সাধু-চলিতে মিশ্রিত রূপ। আর সেই মিশ্রিত কথ্য-ব্যবহারের মধ্যে নানা অসঙ্গতি চোখে পড়ে। যেমন : যৌগিকক্রিয়ার প্রয়োগে—গিয়া বলগে শিখেশি, বেঁচে থাকিলে দিকপাল হইবে, উঠে পড়িলাম, ধরে হিঁচুড়ে লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়াছে, লইয়া যাব, বিবাহ্ করে গিয়াছি, মস মস করিয়া বেড়াচ্ছে, বসিয়া ভাবছে, মারপিট করিয়া ছিনিয়ে পালায়, ভিড়তে চেষ্টা করিল, বেচতে আসিল, তেড়ে আসিয়া ডানহাত নেড়ে বলতে লাগিলেন ইত্যাদি।

১. প্যারীচাঁদ রচনাবলী, ৯২ পৃঃ।
২. ঐ।
৩. বাংলা গদ্যের চারযুগ, ড. মনোমোহন ঘোষ, ১৪৬—১৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কখনো বা কথ্যরূপ দিতে গিয়ে কোথাও কোথাও ক্রিয়াপদকে বিকৃত করে বসেন। যেমন : চারিদিকে ছড়িয়া (ছড়িয়ে) পড়ে, ঘাবড়িয়া (ঘাবড়িয়ে) যাইতে লাগিল, কাঁচিয়া ফলিলেন, মতিলাল ক্রমে ক্রমে মেরোয়া (মরিয়া) হইয়া উঠিল, ধড়ফড়িয়া (ধড়ফড়িয়ে) এগিয়া (এগিয়ে), পালিয়া (পালিয়ে), পৌঁছিয়া (পৌঁছিয়ে) প্রভৃতি।

কিন্তু বাংলা গদ্যে পুরোপুরি টেকচাঁদ ঠাকুরের হাতে নতুন রীতি ফুটে না উঠলেও, চলিত বাক্‌রীতি বা বাক্যাংশ ও গ্রাম্য ইডিয়ামের প্রচুর ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায় এবং তা অনেক ক্ষেত্রেই সুপ্রযুক্ত। যথা :

'এলোমেলো লোকেরা জল উঁচুনীচু বলিত,' 'ঐ বান্‌কে ছেলেটার জ্বালায় ঘুমান ভার!', 'ও আমার সবেধন নীলমণি,' 'পায়ের উপর পা', 'গণ্ড মূর্খ', 'চাউল কলা', 'পাই তাতে তো কিছুই আঁটে না', 'এ বেটা চাউল কলা খেকো বামুনকে কেমন করিয়া তাড়াই,' 'এ কি থুতব্বুড়ি দিয়া ছাতু গোলা?', 'হাড় কালি,' 'ঘুঘু চরিয়ে,' 'রাত ঝাঁ ঝাঁ কচ্ছে', 'বাবু ভাল নালা কেটে জল এনেছে—এ ছোড়া কান ঝালাপালা কল্লে—গেলে বাঁচি', 'গোকুলের ষাঁড়ের ন্যায় বেড়ায়', 'পাড়ার যত হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া—উন্‌পাঁজুরে—বরাখুরে ছোঁড়ারা', 'কান পাতা ভার', 'হাসির গররা ও তামাক চরস গাঁজার ছররা', 'জেলে পচে মরুক', 'ঢেঁকির কচকচি', 'আমার শাশুড়ী মাগি বড় বৌকাঁটকি', 'বৌছুড়ি আমাকে দু পা দিয়া থেত্‌লায়', 'আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে', 'কবে মরি কবে বাঁচি এই বেলা তার বিএটি দিয়েনি', 'কুড়িতে বুড়ার বিয়ে হয়' ইত্যাদি।

এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত 'আলালে' মেলে। টেকচাঁদ যে শুধু এগুলো গদ্যে টেনে এনে বোঝা বাড়িয়েছেন তা নয়, কথ্যবাক্‌রীতির এমন প্রয়োগ ইতিপূর্বে কোন গদ্যশিল্পীর কলমে বেরোয়নি। সমালোচক ড. মনোমোহন ঘোষের ভাষায় বলা যায়, 'বাংলা গদ্যের মধ্যে যে এমন সর্বজনভোগ্য রসোদ্রেক ক্ষমতা আছে প্যারীচাঁদের আগে পর্যন্ত তা কেউ ভালভাবে দেখাতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। উইলিয়াম কেরী তার 'কথোপকথন' (১৮০১) গ্রন্থে সর্বপ্রথম চল্‌তি ভাষার নানা চিত্তাকর্ষক নমুনা প্রকাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু 'আলালের' মত কোনো মনোজ্ঞ উপাখ্যানের অঙ্গীভূত না হওয়ায় সেগুলি রস-সৃষ্টির কারণ হয়ে ওঠেনি। তাই কেরীর কাছে প্যারীচাঁদের ঋণের কোন কথাই ওঠে না। 'প্রবোধচন্দ্রিকারও' স্থানে স্থানে চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে বটে, কিন্তু সংস্কৃতবহুল ভাষার চাপে পড়ে তার নিজের সহজ সৌন্দর্য ফোটেনি। এ সকল কথা বিবেচনা করলে, চলিত ভাষাকে সাহিত্যে তার যথাযোগ্য সম্মান দেওয়ার গৌরব প্যারীচাঁদকেই দিতে হয়।'[১]

পরিশেষে বক্তব্য, 'আলালের' মাধ্যমে টেকচাঁদ ঠাকুর অবশ্যই সাধুরূপের গতানুগতিকতার উপর আঘাত হেনেছেন, তাই বলে তাকে বাংলা গদ্যে নতুন কোন রূপের পথপ্রদর্শক আখ্যা দেওযা যায় না। কেননা, 'আলালের ঘরের দুলাল' আগাগোড়া কথ্যরূপের উপর দাঁড়িয়ে নেই। সে যদি থাকে তো, সে সাধুগদ্য। তা অবশ্য অক্ষয়-দেবেন্দ্রনাথের মতো খাঁটি সাধুগদ্য নয়। গ্রন্থের নানা পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে লেখক নানা অঞ্চলের কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন, ইতিপূর্বে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এই গতানুগতিকতা ভেঙে কথ্যরূপের আংশিক প্রয়োগের দিক থেকেই সমালোচক মনোমোহন ঘোষের পূর্বোক্ত মন্তব্য সঠিক বলে মনে করতে পারি।

১. বাংলা গদ্যের চারযুগ, ১৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

আবার কলকাতার ভদ্রসমাজের মুখের ভাষা 'আলালে' যতটা না ফুটে উঠেছে ঠক্‌চাচার মুখে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মুসলমান সমাজের মুখের ভাষা তার চেয়ে অনেক বেশি সার্থক হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঠক্‌চাচার ভাষা সব জেলার লোকের ব্যবহারযোগ্য ভাষা নয়। তাই সবার বোধগম্য হয় এমন আদর্শ মুখের ভাষাই সাহিত্যের বাহন হতে পারে। 'আলালে' আদর্শ কথ্যরূপটা দেখি, তবে জমাট বাঁধতে পারেনি। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়ানো ছিটোনো তা আগেই বলা হয়েছে। 'আসলে প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন হয়ত বুঝতে পারেন নি যে, আদর্শ কথ্যভাষার আশ্রয় কোথায়'[১]। তাই তাদের নতুন রীতির পথনির্দেশকের চেয়ে উৎসাহী ও দুঃসাহসী অভিযাত্রী বলা ঠিক। 'তাঁরা নিজেরা পথ খুঁজে ফিরছিলেন বটে, কিন্তু পথ খুঁজে পাননি'।[২]

বলা বাহুল্য, নতুন পথ খুঁজে না পেলেও গন্তব্যে পৌঁছানোর যথেষ্ট উপকরণ আলালের ভাষায় যোগান দিয়েছেন, যাতে ক্ষীণভাবে হলেও পরবর্তী যাত্রীদের পথ করে চলতে বেগ পেতে না হয়। জুনিয়ার টেকচাঁদ ঠাকুরের গদ্যে ও মধুসূদন-দীনবন্ধুর নাটকীয় গদ্যে আমরা তার প্রমাণ পাই।

২.

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০–১৮৭০)

প্যারীচাঁদ মিত্রের. কথ্যভাষা যাঁদের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে, কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁদের মধ্যে প্রধান। বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালি সাহিত্যিকের সেবায় তিনি নিতান্ত তরুণ বয়েস থেকে যে অনুরাগ দেখিয়েছেন, তার তুলনা নেই।[৩] মাত্র ত্রিশ বছরের জীবনে তিনি যে উচ্চ সাহিত্য-প্রতিভা ও অসাধারণ বদান্যতাগুণে নিজেকে এমন মহিমামণ্ডিত করে তুলতে সক্ষম হন যে, উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে তাঁকে আজ গণ্য না করে উপায় নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের দুবছর পরে জন্মগ্রহণ করে ১৮৭০ খৃস্টাব্দে যখন কালীপ্রসন্ন পরলোকগমন করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন কবিতা রচনা ও ইংরাজি সাহিত্যচর্চা ছেড়ে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' রচনা শেষ করেছেন। বঙ্গদর্শন-এর দর্শন তখনও মেলেনি। কালীপ্রসন্ন তখন সমাজে-রাষ্ট্রে ও সাহিত্যে এমন সব কীর্তি রাখলেন, যার আলোচনা একালেও আমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।[৪]

তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে—বাবুনাটক (১৮৫৪), বিক্রমোর্বশী নাটক (১৮৫৭), সাবিত্রী সত্যবান নাটক (১৮৫৮), মালতীমাধব নাটক (১৮৫৯), হিন্দু পেট্রিয়টের পরলোকগত সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ পুস্তক (১৮৬১), হুতোম প্যাঁচার নক্সা (১৮৬২–৬৪), The Calcutta Police Act (১৮৬৬) প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে 'হুতোমপ্যাঁচার নক্সা' লিখেই তিনি 'হুতোমপ্যাঁচা' বলে পরিচিত। নক্সা রচনার মধ্যে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ চলিত গদ্যের ক্ষমতার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল।

'হুতোমপ্যাঁচার নক্সা' কালীপ্রসন্নের রচনা কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। সাহিত্যের

১. বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, ড. শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. ঐ।
৩. শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, (১ম খণ্ড), ৫–৬ পৃঃ দ্রঃ।
৪. ঐ ৫–৬ পৃঃ দ্রঃ।

ইতিহাসকার সমালোচক সুকুমার সেন মহাশয় এ ব্যাপারে প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেছেন যে, বিদ্যোৎসাহিনী সভার নানা কাজ করাবার জন্য কালীপ্রসন্ন পণ্ডিত ও লিপিকর পুষতেন, লিপিকরদের একজন ছিলেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ঐ ভুবনচন্দ্রের লেখনীই হুতোমপ্যাঁচার নক্সার চিত্রকর।[১]

তাঁর এই সন্দেহ বাড়িয়ে তোলে নক্সার উপহার পত্রের তিনটি প্রসঙ্গ। যথা :

ক। প্রথম রচনাকুসুম কথা,

খ। মুলুকচাঁদ শর্মা নাম, এবং

গ। আসমান ঠিকানা।

নক্সার উপহার-পত্রে 'শ্রীল শ্রীযুক্ত মুলুকচাঁদ শর্মাকে' 'বিনয়াবনত দাস' 'শ্রী হুতোম প্যাঁচা' 'তাহার এই প্রথম রচনাকুসুম' শ্রীচরণে 'অঞ্জলি' দিচ্ছেন। আচার্য সেন বলেছেন যে, কালীপ্রসন্নের নামে আগেই কয়েকটি নাটক প্রকাশিত হয়। নক্সাটি তাই তাঁর প্রথম রচনা হওয়া সম্ভব নয়। এজন্যে তিনি বলেছেন যে, কালীপ্রসন্ন হুতোমপ্যাঁচা হতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, 'শ্রীমুলুকচাঁদ শর্মা'—এই ছদ্মনামটি কেন্দ্র করে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। কে এই মুলুকচাঁদ—ঈশ্বরচন্দ্র না ভুবনচন্দ্র?

শ্রদ্ধেয় আচার্য সেন 'মুলুক' এই আরবি শব্দ ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন এর অর্থ 'ঈশ্বর' নয়, 'ভুবন'। আর মুলুকচাঁদ বলতে তিনি নক্সার লিপিকর ভুবনচন্দ্রের কথা বলেছেন।

আবার আচার্য সেন মুলুকচাঁদ নামটি নক্সার একটি ছবির নীচে পরিচিতি হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখেন। গোড়ায় বই আকারে ছাপা হবার আগে দু-চারটে নক্সা পুস্তিকাকারে ছাপা হয়েছিল। তার প্রথম সংখ্যার প্রথমেই ছবিটি ছাপা হয়। ভুমগুলের উপর বহুরূপী সেজে টুপি মাথায় বসে আছেন একজন। সেই ছবির নীচে তিনি দেখেছেন 'মুলুকচাঁদ শর্মা আসমানে বসে নক্সা উড়োচ্ছেন।'[২] এই কারণেই তাঁর মনে হয়েছে—ইনি ভুবনচন্দ্র, একই ব্যক্তি বেনামিতে দাতা ও গ্রহীতা হয়েছেন।[৩]

তৃতীয়ত, নক্সায় হুতোমের ঠিকানা 'আসমান'। আচার্য সেন এই ঠিকানা দেবার রীতিও ভুবনচন্দ্রে প্রত্যক্ষ করেন। ১৮৭১—৭৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে লেখা ভুবনচন্দ্র 'হরিদাসের গুপ্তকথা' নামে একটি রহস্য উপন্যাস লেখেন, সেখানেও ঠিকানা দেওয়া হয় 'আসমান'। দুটি গ্রন্থের ভাষারীতিও এক। তাই আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় অনুমান করেছেন, হুতোম প্যাঁচার নক্সার লেখক কালীপ্রসন্ন নন, ভুবনচন্দ্র।

এবার আমরা আচার্য সেনের অনুমানগুলো বিচার করে দেখতে চাই।

কালীপ্রসন্ন, স্বনামে নাটক লিখেছেন, কিন্তু হুতোমের নাম দিয়ে নক্সার আগে কিছু নেই। সেখানে নক্সাটি হুতোমের প্রথম রচনাকুসুম বলে চিহ্নিত হওয়া অসঙ্গত হয়নি। কেননা, এটির লেখক কালীপ্রসন্ন নন, হুতোম।

তাছাড়া, নাটকগুলি হয় অনুবাদ, না হয় ভাবানুবাদ। সেখানে প্রথম মৌলিকত্বের দিক থেকে নক্সাটিকে 'প্রথম রচনা' বলা অযৌক্তিক হয়নি।

কালীপ্রসন্ন কেন হুতোম হতে গেলেন? তার উত্তর তাঁর মুখ থেকে শুনি। তিনি বলেন,

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২০০—২০৩ পৃঃ দ্রঃ।
২. ঐ।
৩. ঐ।

'নক্সাখানিকে আমি একদিন আরশি বলে পেশ কল্লেও কত্তে পাত্তেম, কারণ পূর্ব্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরশিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন, কিন্তু নীলদর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখেশুনে-- ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরশি ধত্তে আর সাহস হয় না, সুতরাং বুড়ো বয়েসে সং সেজে রং কত্তে হলো--পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবি মাফ কর্ব্বেন।'[১]

এর পরেও যদি ভুবনচন্দ্রের দাবি ওঠে, তাহলে ভুবনচন্দ্রের এমন একটি মন্তব্যকে তখন অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। 'ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'ত্রিংশৎ বৎসর পূর্বে "হরিদাসের গুপ্তকথার" জন্ম। সেই রহোন্যাসখানি আমার লেখনীলতিকার প্রথম ফুল--প্রথম ফল।'[২]

সত্যিই কি 'গুপ্তকথা' ভুবনচন্দ্রের প্রথম ফুল--ফল? তাহলে বাংলা সাহিত্যের পেট্রন 'সাহসের অদ্বিতীয় আশ্রয়' শ্রীযুক্ত হুতোমচাঁদ দাসকে উপহার দেওয়া 'সমাজ কুচিত্র' গ্রন্থটি যায় কোথায়?

আসলে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' লিখেই ভুবনচন্দ্রের খ্যাতি ও পরিচিতি। সেটা ভুবনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। সেই কারণেই মনে হয়, সেই রচনাকে 'প্রথম' শব্দে চিহ্নিত করতে চান।

আবার মুলুকচাঁদ শর্ম্মা নাম নিয়ে সন্দেহ আরও জটিল হয়ে ওঠে। নক্সায় প্রকাশিত ছবির তলায় মুলুকচাঁদ নামটি পাই না। প্রথম বছরের প্রথম অংশত প্রকাশিত 'চড়ক' শীর্ষক পুস্তিকার বিবরণে দুটি ছবির কথা জানা যায়। সমালোচক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন : "একখানি--হুতোমপ্যাঁচা আশমানে বসে নক্সা উড়াচ্ছেন," অপরখানি 'ঠন্‌ঠনের হঠাৎ অবতার।'[৩] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণেও মুলুকচাঁদ নাম পাওয়া যায় না। আছে 'হুতোমপ্যাঁচার নক্সা'। কেননা, যাঁকে গ্রন্থটি উপহার দেওয়া হয় সেই পূজনীয় ব্যক্তিকে সঙ সাজিয়ে প্রকাশ করা লেখকের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার।

তাহলে কে মুলুকচাঁদ? ঈশ্বরচন্দ্র না ভুবনচন্দ্র? উপহারপত্রের বয়ান দেখে বিদ্যাসাগরের কথা মনে আসে। তাতে বলা হয়েছে, 'সহৃদয় কুলচূড় শ্রীলশ্রীযুক্ত মুলুকচাঁদ শর্মার বাঙালি সাহিত্য ও সমাজের প্রিয়চিকীর্ষা নিরমুল বিনয়াবনত দাস শ্রী হুতোম প্যাঁচা কর্ত্তৃক (তাহার এই প্রথম রচনাকুসুম) শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদত্ত হইল'। এই কালের একমাত্র মানুষ যিনি বাংলা গদ্যে ও বাঙালি সমাজের সংস্কার-সাধনে আন্দোলন করে সমস্ত বাঙালির শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন--তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভুবনচন্দ্র নন।

কুড়ি বছরের তরুণ ভুবনচন্দ্র তখন 'পরিদর্শক' পত্রে কবিতা লেখা শুরু করেছেন। আর এই সূত্রেই কালীপ্রসন্নের সঙ্গে যোগাযোগ এবং পরিদর্শকপত্রের সহকারীর দায়িত্ব লাভ।[৪]

অতএব দেখতে পাচ্ছি, সময়ের হিসেবে ভুবনচন্দ্র কালীপ্রসন্নর চেয়ে দু' বছরের ছোট। তাই তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধার সম্পর্কের চেয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্কই গড়ে ওঠে। 'সমাজ কুচিত্র' গ্রন্থের উপহারপত্রে ও 'আমাদের গৌরচন্দ্রিমা' অংশে এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং সদ্য পরিচিত ভুবনচন্দ্রের সাহিত্যে ও সমাজে ১৮৬২ সালে এমন কোন কৃতিত্ব গড়ে ওঠেনি যার

১. হুতোম প্যাঁচার নক্সা ও অন্যান্য সমাজচিত্র, ১৩৫৫ সং, ভূমিকা।
২. ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর, ভূমিকা (অত্রথ আমন্ত্রণ) দ্রঃ।
৩. সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১), ৩৮ পৃঃ দ্রঃ।
৪. হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র, ভূমিকা দ্রঃ।

জন্যে সসম্মানে একটি নতুন ধরনের গ্রন্থ শ্রীচরণে অঞ্জলি দিতে হবে। কালীপ্রসন্নর পক্ষে সেই মানুষটি বিদ্যাসাগর হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু এত প্রমাণ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের মুলুকচাঁদ ছদ্মনাম নেবার পেছনেও সন্দেহ এসে পড়ে। দৃঢ়চেতা ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বিদ্যাসাগর কোথাও লুকো-ছাপা থাকার মানুষ ছিলেন না। সেখানে হুতোম প্যাঁচার কাছ থেকে নক্সা উপহার নেবার বেলায় এবং সাহিত্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার ঘোষণার কালে[১] মুলুকচাঁদ শর্মা হয়ে গেলেন--তার পেছনেও বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণও আমাদের জানা নেই। পুরস্কার ঘোষণার সময় আরও মজাদার ব্যাপার ঘটেছে, শ্রী মুলুকচাঁদ শর্মা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, আর বিদ্যাসাগর মশাই তার পরীক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর যদি মুলুকচাঁদ ছদ্মনাম নেন, তাহলে তিনি বেনামে পুরস্কার ঘোষণা করেন এবং স্বনামে পরীক্ষক নির্বাচিত হন। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হয় না। বলা বাহুল্য, এই পুরস্কার দানের পেছনেও কিন্তু কালীপ্রসন্ন। তিনিই মাঝে মাঝে স্বনামে ও বেনামে পুরস্কার ঘোষণা করে নবীন প্রতিভার সন্ধান করতেন।[২] তবে শেষ পর্যন্ত স্নেহধন্য কালীপ্রসন্নের ব্যাপার বলে সম্ভবত মুলুকচাঁদ হতে বিদ্যাসাগরের আপত্তি হয়নি বলেই ধরে নেওয়া যায়। অন্যথায় মুলুকচাঁদ নাম কালীপ্রসন্নেই বর্তাবে। তখন আচার্য সেন কথিত একই ব্যক্তির বেনামিতে দাতা ও গ্রহীতা হবার সার্থকতা মিলতে পারে।[৩]

সব শেষে ঠিকানা রহস্য। সেই সঙ্গে রচনার স্টাইলে মিল। হুতোমের ঠিকানা 'আশমান'। আবার শ্রীসবজান্তা ওরফে ভুবনচন্দ্রের রচিত 'হরিদাসের গুপ্তকথার' ঠিকানা 'আসমান' (বানানে কিন্তু মিল নেই)। গ্রন্থ দুটির রচনারীতিতেও মিল আছে। এটুকুতে বলা হয়, নক্শা আর 'গুপ্তকথার' লেখক একই ব্যক্তি এবং তিনি ভুবনচন্দ্র। আচার্য সেনের এই অনুমান নিছকই অনুমান। কেননা, 'আসমান' ঠিকানা 'হরিদাসের গুপ্তকথার' আগেই রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ 'আসমানের নক্শা—পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। আর তাঁর রচনারীতিও হুতোমের মত।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা নক্শার কথা উল্লেখ করতে হয়, সেটাও 'হরিদাসের গুপ্তকথার' আগে। ১৮৬৫ খৃঃ জানুয়ারিতে প্রকাশিত নক্শাটির নাম 'সমাজ কুচিত্র'। লেখক স্বয়ং ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এটির স্টাইলও হুতোমের অনুরূপ, তবে এখানে হুতোমপ্যাঁচাকে উপহার দেন 'নিশাচর' ছদ্মনামে। এর ঠিকানাটি কিন্তু 'আসমান' নয়—'চিড়িয়াখানা'।[৪] তাতেও কিন্তু হুতোমের নক্শার প্রতিধ্বনি শুনি। হুতোম কলকাতাকে চিড়িয়াখানার সঙ্গে তুলনা করেছেন। নিশাচর তাঁকে সমর্থন করেন[৫]। সুতরাং হুতোমের নক্শায় ভুবনচন্দ্রের (শ্রী সবজান্তা) ভাষা ও ঠিকানার মিল যে পরিমাণ আছে, 'সমাজ কুচিত্রে' হুতোমের ভাব-ভাষা ঠিকানার প্রত্যক্ষ প্রভাব লেখক নিজেই নানা স্থানে স্বীকার করেছেন।

এরপর জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগগুলো বিচার করে দেখবো। তিনি সাহিত্য

১. সংবাদ প্রভাকর ২৫ মার্চ খৃঃ।
২. সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ, ২৫ মার্চ, ১৮৬২।
সোমপ্রকাশ, ১ অক্টোবর ১৮৬০ খৃঃ।
৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (২য় খণ্ড) ২০২ পৃঃ দ্রঃ।
৪. জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় চিড়িয়াখানাকে কালীপ্রসন্নর মো'সাহেব মহল বলেন, সেটা ঠিক না।
৫. সমাজ কুচিত্র, সরস্বতী পূজা দ্রঃ।

পরিষৎ পত্রিকায়[১] 'হুতোমের মালিক' ও 'লিপিকা' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে আচার্য সেনকে সমর্থন করেছেন তাই নয়, কালীপ্রসন্নর অস্তিত্ব ধরে টান দিয়েছেন।

তাঁর প্রবন্ধে আগাগোড়া বহু বিতর্কিত প্রসঙ্গ পাই। সেগুলোকেও অভিযোগ হিসেবে দাঁড় করানো যায়। সেইজন্য গুরুতর কয়েকটি অভিযোগেরই আমরা উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি।

জীবানন্দবাবু বলেছেন ঃ 'কালীপ্রসন্নর বাল্যজীবন ও শিক্ষাদীক্ষা কোনো কিছুই সাহিত্যগত প্রমাণের পক্ষে নয়। যুগের হাওয়ায় কালীপ্রসন্নে দেখা দেয় সাহিত্য-যশখ্যাতির লোভ। নক্‌শার আগে বা পরে কালীপ্রসন্নর কোন মৌলিক রচনা নেই।'[২]

প্রথমে আমরা কালীপ্রসন্নর শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে চাই। এ ব্যাপারে আলোকপাত করেন সমালোচক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন যে, শৈশবে কালীপ্রসন্ন হিন্দু কলেজে পড়াশুনা করেন। কিন্তু কৃতী ছাত্র বলে তখন তাঁর সুনাম ছিল না। 'তিনি গৃহে বসিয়া উইলিয়াম কার্কপ্যাটারিক নামে একজন সাহেবের নিকট রীতিমত ইংরাজি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত এবং মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তাঁহার আশৈশব অনুরাগ ছিল। এই দুই ভাষাও তিনি পণ্ডিত রাখিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন।'[৩]

ছেলেবেলার কথা লিখতে গিয়ে হুতোম তাই জানিয়েছেন যে, ছেলেবেলায় আর পাঁচজন ছেলের মতই পাঠশালায় যেতেন। রাতে শোবার সময় রোজ ঠাকুরমার মুখ থেকে নানান লোকগল্প শুনতেন, কবিকঙ্কণ, কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের পয়ার শুনতেন। রোমাঞ্চিত শরীরে একসময় ঘুমিয়ে যেতেন। পরে সেই সব পয়ার স্কুলে ও বাড়িতে মায়ের কাছে আউড়িয়ে সন্দেশ প্রাইজ পেতেন। তখন সংস্কৃত শেখানোর জন্যে বাড়িতে পণ্ডিত আসতেন। চার বছরে মুগ্ধবোধ শেষ করেন, মাঘের দুপাত ও রঘুর তিনপাত পড়েই জ্যাঠামোয় ধরে। পণ্ডিত দেখলেই বা 'ছোঁড়াগোছের' কাউকে দেখলেই তর্কে হারিয়ে দিয়ে টিকি কেটে নিতেন।[৪]

একসময় স্কুল শেষ করে কলেজেও ভর্তি হন। হুতোম লেখেন, 'ক্রমে আমরা পাঠশালা ছাড়লেম কালেজে ভর্তি হলেম।' সে সময় সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছ থেকে উপদেশ লাভ করেন। বিনম্র চিত্তে সেকথা কালীপ্রসন্ন স্মরণ করে বলেন, 'ফলত বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠ্যাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লিখনী দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না।'[৫]

তবে কলেজ জীবনে কালীপ্রসন্ন কতদূর পড়েন, তার সঠিক কোন তথ্য পাই না। কিন্তু উচ্চতর পঠন পাঠন ও আইন বিষয়ে যে-কিছু জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, তার প্রমাণ পাই ১৮৬০ খৃঃ যখন তাঁকে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও 'জাস্টিস অফ পীস্' নিযুক্ত করা হয় এবং ১৮৬৬ খৃঃ The Calcutta Police Act নামে ১০৮ পৃষ্ঠার ইংরাজি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট থাকার সময় কলকাতা পুলিশ প্রধানের মৃত্যুর পর দুমাস তিনি পুলিশ প্রধানের দায়িত্বও পালন করেন।[৬] বিচারক হিসাবে তিনি সাদা চামড়া কালো চামড়া নির্বিশেষে যে দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন, সেকালের অসংখ্য পত্রপত্রিকায় তার

১. ৭৬—৭৮ তম বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র সংখ্যা।
২. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বৈশাখ—চৈত্র,
৩. সাহিত্যসাধক চরিতমালা (১ম), কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রবন্ধ।
৪. হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, ৫৬—৫৭ পৃঃ।
৫. মহাভারত, ১৮শ খণ্ডের উপসংহার দ্রঃ।
৬. সংবাদ প্রভাকর, ৩রা জুন ১৮৬৫, হিন্দু পেটরিয়ট, ৩১ অক্টোবর ১৮৬৪ খৃঃ।

প্রশংসা করে বিবরণ দিনের পর দিন ছাপা হয়েছে।[১]

ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে ঐ রকম উচ্চ সম্মান লাভ করে কালীপ্রসন্নকে কখনোই ইংরেজ সরকারের গোলামি করতে দেখা যায়নি। বরং উল্টো ভূমিকা পালন করতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-পত্রে বলা হয়েছে : "'ডেলি নিউসের' এক পত্রপ্রেরক বলেন, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট একদিন মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বিচারকালে হেলথ অফিসার ডাক্তার টনিয়র সম্মুখে ছিলেন, ডাক্তার টনিয়র বলিলেন, নেটিবদিগের সাক্ষ্য বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই কথায় কালীপ্রসন্নবাবু বলেন, অনেক মিউনিসিপ্যাল অফিসারের কথা শুনিয়া তাহার বিচার করিব না। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীদিগের সাক্ষ্যও আমি অগ্রাহ্য করিব না। সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় সাক্ষীদিগের কথা যতদূর বিশ্বাস করি, সম্ভ্রান্তদেশীয় লোকের কথা ততদূর বিশ্বাস করিব। একটুকুও ন্যূন করিব না"।[২]

এ ঘটনা শুধু পক্ষপাত শূন্যতার নজিরই নয়, খাঁটি দেশপ্রেমের দৃষ্টান্তও বটে। চারিত্রিক দৃঢ়তা না থাকলে রাজসম্মানকে উপেক্ষা করে ইংরেজদের সমালোচনা সেকালের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে অসম্ভব ঘটনা ছিল। কিন্তু কালীপ্রসন্ন অন্য ধাতের মানুষ ছিলেন।

'হিন্দুপেটরিয়টে' আর একটি ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট বাবু কালীপ্রসন্নর কাছে জনৈক পুলিশকর্তা একজন ভিক্ষুককে রাজপথে ভিক্ষা করার দায়ে হাজির করেন। কিন্তু বিচারকের অদ্ভুত বিচার দেখে পুলিশ অফিসারের মুখে খুশির বদলে রাগ ও বিরক্তিই ফুটে ওঠে। বিচারক লোকটিকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে নিজের পকেট থেকে দুটো টাকা দান করে প্রতিশ্রুতি দিলেন, প্রতিমাসে এক টাকা করে সাহায্য নেবার। তার উপর ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির সম্পাদককেও একপত্রে সাহায্য করতে নির্দেশ দিলেন।[৩]

এই সময়ে আইন ও আদালত নিয়ে তিনি এতটা মেতে ওঠেন যে, বাংলা রচনা ছেড়ে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে অবসর সময় তিনি চিন্তা ভাবনা করতেন। ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের জুনে তাঁর সেই চিন্তার ফসল ফলে The Calcutta Police Act নামে ১০৮ পৃষ্ঠার একটা গ্রন্থ রচনার মধ্যে দিয়ে। এতে তাঁর ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের পরিচয় বর্তমান।[৪]

সুতরাং এর পরেও কি কালীপ্রসন্নর মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার অভাব ছিল, ভাবা যায়? বৃটিশ সরকার আর যাই করুক শিক্ষাদীক্ষাহীন কোন দেশিয় ব্যক্তিকে বিচারকের বা পুলিশ প্রধানের দায়িত্বে রাখতেন না। কলেজি ডিগ্রি থাক বা না থাক বাড়িতে পণ্ডিত রেখে তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, তার প্রমাণ ঐ সমস্ত কর্মতৎপরতার মধ্যে দিয়েই মেলে। সেকালে এই পদ্ধতিতে ধনী পরিবারে বিদ্যাচর্চার রীতি ছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। কালীপ্রসন্ন সেভাবেই নিজেকে শিক্ষা দীক্ষায় গড়ে তোলেন।

আবার একাধিক ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানলাভ করেছেন, নিজের নামে বই লেখা ও সমালোচনাও তিনি করেন। তবু তাঁর মধ্যে সাহিত্যিক-দক্ষতার অভাব লক্ষ্য করেছেন

---

১. সোমপ্রকাশ, ৪ মে ১৮৬৩, ৬ জুন ১৮৬৪, ২৯ আগস্ট ১৮৬৪, ১৬ জানুয়ারি ১৮৬৫ ; হিন্দু পেটরিয়ট ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ ; সংবাদ প্রভাকর, ৩ জুন ১৮৬৫ ; সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২১ শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৫ ; ইণ্ডিয়ান ফীলড ২০ আগস্ট ১৮৬৪।

২. ১৮৬৫ খৃঃ ২৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যা দ্রঃ।

৩. ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ খৃঃ।

৪. নক্‌শার পরে বাংলা রচনা না থাকলেও, তিনি যে লেখাপড়া বিষয়ে চুপ করে ছিলেন না, এখানে তার প্রমাণ পাই।

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আসলে, জীবানন্দবাবু গোড়াতেই কালীপ্রসন্নর প্রতি একটা অবিচার করে বসে আছেন। তিনি সেকালের অসংখ্য 'আলালের ঘরের দুলাল'কে কল্পনা করে নিয়ে কালীপ্রসন্নর ছবি আঁকতে চান।[১] তা থেকে কালীপ্রসন্নর প্রতি সমস্ত অভিযোগগুলো হাতধরাধরি করে এসেছে। 'সাহিত্যগত দক্ষতার অভাব' তার একটি।[২] আমরা তার বিপরীত চিত্রই দেখতে পাচ্ছি।

প্রথমত, 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভা গঠন করে কালীপ্রসন্ন সাহিত্যচর্চার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন। সেখানে সদস্যদের প্রবন্ধপাঠ, আলোচনা, ভাষণদান, সাহিত্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা প্রভৃতি হোত। এতে কালীপ্রসন্ন নিজে অংশ নিতেন।

মাঝে মাঝে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নানা ধরনের নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ভাষণ দেবার আয়োজন করা হোত। আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—ডেভিড হেয়ার একাডেমির প্রধান শিক্ষক সি জি মনটেগিউ, কার্কপেট্রিক সাহেব প্রভৃতি।[৩] মহাকবি মধুসূদন দত্তকে সংবর্ধনা দান এই সভার একটি গৌরবময় ঘটনা। বাঙালি কবিদের মধ্যে ও বাংলা সাহিত্যে সেটাই প্রথম দৃষ্টান্ত।[৪]

এই সভার আরও কয়েকটি অঙ্গ ছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' ও 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ।' পত্রিকাটিতে কালীপ্রসন্নের বাল্যরচনার নিদর্শন আছে। বাংলা নাটক ও অভিনয়ের প্রাথমিক পর্বে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের অবদান অনেকখানি। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ দিয়ে এর জয়যাত্রা শুরু। এখানে কালীপ্রসন্ন অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। আর সেই অভিনয়ে প্রশংসা কুড়িয়ে কালীপ্রসন্নর মনে নাটক রচনার প্রেরণা জাগে।[৫] বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য আঙ্গিকে নাটক রচনা ও অভিনয় হোক ১৮৫৭ খৃঃ প্রকাশিত 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের' বিজ্ঞাপনে কালীপ্রসন্ন সেই আশা ব্যক্ত করেন।[৬]

দ্বিতীয়ত, তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন রসিক সমালোচক। তাঁর সময়ে রচিত দুটি কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টির যথোপযুক্ত সম্মাননায় তিনিই এগিয়ে আসেন সবচেয়ে আগে। এর একটি 'অমিত্রাক্ষর ছন্দে' রচিত 'মেঘনাদবধকাব্য', অন্যটি 'নীলদর্পণ নাটক।'

আগেই বলা হয়েছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনা ও ঐ নতুন ছন্দে 'মেঘনাদবধকাব্য' রচনা করার জন্যে কালীপ্রসন্ন কবি মধুসূদনকে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভার' পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক সংবর্ধনা দিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটা নজির সৃষ্টি করলেন। সভায় অভিভূত কবিকে একটি রূপার পানপাত্র ও একটি মানপত্র উপহার দান করা হয়।

অথচ সেকালে মধুকবির নতুন ছন্দ ও 'মেঘনাদবধকাব্যকে' সাধারণ পাঠক নিতে পারেনি। এমন কি অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যাপারটাও সেকালের প্রতিষ্ঠিত কবিদের মাথায় ঢোকেনি। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মত কবিদের ব্যর্থ অমিত্রাক্ষর-অনুসরণেই তার প্রমাণ পাই।

দূরদর্শী কালীপ্রসন্ন সেদিন কতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে মানপত্রে লিখেছেন, 'বঙ্গবাসিগণ

---

১. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৭৬—৭৮ বর্ষ, যুগ্ম সংখ্যা।
২. ঐ
৩. সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১ম) ৯—১৩ পৃঃ দ্রঃ।
৪. ঐ (১ম), ১৩—১৪ পৃঃ দ্রঃ।
৫. ঐ (১ম), ২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
৬. ঐ

অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিত রূপে আপনার অলৌকিক কার্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না।'

মানপত্রের এই বক্তব্যই 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'[১] উদ্ধৃত করে কালীপ্রসন্ন লেখেন ঃ 'বাঙ্গালী সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয় সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।

"—শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবর রব নব পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে, কিন্তু নাহি শুনি,
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!"

হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই প্রিয়বস্তুর নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাঁহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদগুণরাজির পরিচয় প্রদান করে, তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি।'

আরও জানা যায়, কালীপ্রসন্ন মধুকবিকে সংবর্ধনা জানিয়েই তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি। 'মেঘনাদবধকাব্য' বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দেশবাসীর কাছে মধুসূদনের অসাধারণ কবি-প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরেন।[২]

আবার নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের অমর সৃষ্টি 'নীলদর্পণ' নাটকের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত দেখি। ঘটনাটি নাটকটির ইংরেজি অনুবাদকে কেন্দ্র করে। অনুবাদে নাট্যকার অথবা অনুবাদকের নাম ছিল না। রুষ্ট ইংরেজ সরকার প্রকাশক রেভারেণ্ড লঙকে মামলায় টেনে এনে একমাস জেল ও হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করেন। কালীপ্রসন্ন এগিয়ে এসে ঐ টাকা মিটিয়ে দেন। কয়েক মাস পর যখন রেভারেণ্ড লঙ ভারত ত্যাগের আয়োজন করছেন, কালীপ্রসন্ন জানতে পেরে 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভার পক্ষ থেকে ভারতবন্ধু লঙকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্মানিত করেন।[৩]

এর কিছু পরে 'নীলদর্পণের' একটা সমালোচনাও 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' ছেপে দেন। ফলে সরকারি অর্থপুষ্ট পত্রিকাটি সরকারি রোষে বন্ধ হয়ে যায়।[৪]

এই দুই ঘটনা থেকে কালীপ্রসন্নর শৈল্পিক-মানসকে অনায়াসে খুঁজে নেওয়া যায়। 'নীলদর্পণের' ব্যাপারে টাকা দিয়ে লঙকে বাঁচানোর ঘটনায় কেউ একে ধনী ব্যক্তির নামকেনার কথা তুলতে পারেন। কিন্তু যুগোপযোগী রসিক-মানস অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও 'মেঘনাদবধকাব্যকে' যেভাবে বরণ করে, সেখানে কালীপ্রসন্নকে প্রশংসাই করতে হয়।

তৃতীয়ত, কালীপ্রসন্ন একাধিক পত্রপত্রিকা সম্পাদনা করেন। নানা ব্যাপারে জড়িয়ে থাকার জন্যে অনেক ক্ষেত্রে সহকারীর দ্বারা পত্রিকা চালাতেন বলে অনেকে তাঁর কৃতিত্বটাকে লঘু করে দেখেন। কিন্তু অন্যের সম্পাদিত পত্র কালীপ্রসন্নের দায়িত্বে আসার পর দেখা গেছে—সেই পত্রিকার আকার-প্রকারে অনেক উন্নতি চোখে পড়েছে। উদাহরণ

১. বিবিধার্থ সংগ্রহ, আষাঢ় ১৭৮৩ শক, ৫৫—৫৬ পৃঃ।
২. সোমপ্রকাশ, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ পৃঃ।
৩. হিন্দু পেটরিয়ট ৩ মার্চ, ১৮৬২ খৃঃ।
৪. সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ খৃঃ।

স্বরূপ 'পরিদর্শক'-পত্রের নাম করা যায়। প্রথমে জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনগোপাল গোস্বামীর সম্পাদনায় ১৮৬১ খৃঃ জুলাই মাসে ছাপা শুরু হয়। পরের বছর ১৪ নভেম্বর কালীপ্রসন্ন সম্পাদক হয়ে এটি একেবারে বিলিতি কায়দায় প্রকাশ করতে থাকেন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব এবং এর মাধ্যমেই তাঁর সাংবাদিক ক্ষমতার পরিচয় মেলে। তাঁর মৃত্যুর পর 'ইণ্ডিয়ান মিররে'[১] তাই বলা হয় :

'He started a daily vernacular newspaper under the model of English Journalism called the Paridarshaka.'

তবু 'পরিদর্শক' চললো না। বন্ধ হবার পর 'সোমপ্রকাশে' বলা হয়েছিল, 'আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, "পরিদর্শক" অকালে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও উৎকৃষ্ট দৈনিক সম্বাদপত্র নাই। পরিদর্শককে দেখিয়া আমাদিগের কথঞ্চিৎ এই আশা জন্মিয়াছিল যে ইহা ক্রমে সেই ক্ষোভ দূর করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তাহাও উন্মূলিত হইল।'[২]

চতুর্থত, কালীপ্রসন্ন যে কোন বিষয়কে নিয়ে জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে পারতেন। আগেই বলা হয়েছে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভার' বিভিন্ন অধিবেশনে তিনি জ্ঞানগর্ভ বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দিতেন। মধুকবির সংবর্ধনার কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

আরও জানা যায় যে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার মর্ডাস্ট ওয়েল্‌সের বিরুদ্ধে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে একবার এক সভার আয়োজন করা হয়। ওয়েল্‌স বিচারের আসন থেকে মাঝে মাঝে বাঙালিদের মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বলতেন। 'নীলদর্পণ' মামলাতেও একই ব্যাপার ঘটে। ১৮৬১ খৃস্টাব্দের ২৬ আগস্টের ঐ সভায় রাজা রাধাকান্ত দেব ছাড়াও ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি। কালীপ্রসন্ন ওয়েল্‌সের বিরুদ্ধে এক 'জ্বালাময়ী' ভাষণ দেন।[৩] সভায় স্থির হয় ওয়েল্‌সের বিরুদ্ধে বিলাতে হাজার হাজার লোকের সাক্ষর যুক্ত দরখাস্ত পাঠানো হবে। প্রায় একমাস পর সেই মত কাজ হয়। ওয়েল্‌সের বিদায় ঘনিয়ে আসে। হুতোম তাই নক্‌শায় লেখেন, 'সেই অবধি ওয়েলস্‌ও ব্রেক হলেন।'

অতএব আমরা দেখতে পেলাম, কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী সভা, যথার্থই বহু উদ্দেশ্য-সাধক একটা সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্র। এটি ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ'র নববাবুর মোসাহেব মণ্ডিত আড্ডাখানা নয়, নয়—'আলালের ঘরের দুলালের' অন্যায় শিরোমণি মতিলালের ইয়ার বন্ধুদের মন্ত্রণাসভাও।

বলা বাহুল্য, মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতায়' উল্লিখিত 'জ্ঞানতরঙ্গিনী' সভাও[৪] একে দেখে অঙ্কিত নয়। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সভা। আর এ সভার প্রাণপুরুষ কালীপ্রসন্ন স্বয়ং। এহেন কালীপ্রসন্নর সাহিত্যিক-মানসকে অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য নয়। যিনি সাহিত্যসভা করতেন, প্রবন্ধ পাঠ ও ভাষণ দিতে পারতেন, নতুন ছন্দে নতুন কাব্যকে সেকালের পাঠককে চিনিয়ে দিতে পেরেছেন, পত্রিকা সম্পাদনা ও গ্রন্থ সমালোচনা

১. The Indian Mirror, 29 July 1870.
২. ১৬ ফ্রেব্রুয়ারি ১৮৬০ খৃঃ।
৩. সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১ম), ৬৫—৬৬ পৃঃ দ্রঃ।
৪. জীবানন্দবাবু কোন সূত্র থেকে পেয়েছেন জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা বিদ্যোৎসাহিনী সভাকে অনুসরণ করে চিত্রিত, সাঃ পঃ পঃ

করতে পারতেন,[১] পাশ্চাত্য আঙ্গিকে নাটক অভিনয় করতে পারতেন, সাংবাদিকতা ও বিচারকাজে যাঁর নজিরবিহীন দক্ষতা সেকালের মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে, তাঁর মধ্যে কেবল সাহিত্যগত যোগ্যতার অভাব--জীবানন্দবাবুর এই ধারণা সঠিক নয়।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রকাশের পর কালীপ্রসন্নর অতি বড় শত্রু তাঁর সাহিত্যিক যোগ্যতাকে উড়িয়ে দিতে পারেননি।[২] আবার তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ভুবনচন্দ্রও অকপটে স্বীকার করেছেন, হুতোমের কলমের প্রশংসা করেছেন নক্সার বহু ব্যাপারের। আর 'সমাজ কুচিত্র' নক্‌শাটিকে হুতোমকেই উপহার দেন, ঋণ স্বীকার করেন উল্টে হুতোমের কাছে।

তাছাড়া কালীপ্রসন্নর পক্ষে সব চেয়ে বড় প্রমাণ দিয়ে গেছেন, ভুবনচন্দ্রের জীবনীকার যতীন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ভুবনচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্তে পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, 'গুপ্তকথা লিখিবার অগ্রে 'সমাজ কুচিত্র' নামে তিনি একখানি সামাজিক নকসা প্রণয়ন করেন, সেখানি হুতোমের ভাষার অনুকরণ, বিজ্ঞ লোকে তাহা পাঠ করিয়া প্রকৃত চিত্র বলেন, হুতোম নিজেও প্রশংসা করিয়াছিলেন।'[৩]

তাছাড়া সমসাময়িক কালে বা কালীপ্রসন্নর মৃত্যুর পর অসংখ্য গ্রন্থে পত্রপত্রিকায় প্রশংসা করে হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার লেখক হিসেবে কালীপ্রসন্নকে চিহ্নিত করা হয়।[৪]

আমরা এখন সমসাময়িক কালের বিভিন্ন রচনা ও দৃষ্টিকোণ থেকে কালীপ্রসন্নর পক্ষে আমাদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিয়ে নিতে চাই।

প্রথমত, সেকালে সাহিত্য ও সমাজের দুপ্রান্তে দুটো স্তম্ভ ছিল, ঐ লৌহ-কঠিন স্তম্ভ দুটির একজন বিদ্যাসাগর ও অন্যজন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁদের সময়ে তাঁদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে অন্যের রচনা নিজের নামে ছাপিয়ে সস্তায় বাজিমাৎ করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

বিদ্যাসাগর ও কালীপ্রসন্নর সম্পর্কটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন অটল চরিত্রের অধিকারী বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তথাকথিত 'আলালের ঘরের দুলালদের' হৃদ্যতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। অথচ সেই পুণ্যশ্লোক মহৎ প্রাণটি বহু ব্যাপারে কালীপ্রসন্নর কাছ থেকে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য নিয়েছেন বলে জানা যায়। একদা বিদ্যাসাগর নিজেই মহাভারতের অনুবাদ করে কিস্তিতে কিস্তিতে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু যেই মাত্র জানতে পারলেন স্নেহধন্য কালীপ্রসন্ন সেকাজ শুরু করতে চলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা বন্ধ করে দিয়ে কালীপ্রসন্নর পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন। কেবল সরে দাঁড়িয়েই বিদ্যাসাগর নিশ্চিন্ত হলেন না, কালীপ্রসন্নর অনুবাদকর্ম মধ্যে মধ্যে কালীপ্রসন্নর বাড়ি গিয়ে তদারক করে আসতেন। তাই বিদ্যাসাগরের কথা বলতে গিয়ে কালীপ্রসন্ন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে বলেছেন : 'বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদে

---

১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, কাঃ প্রঃ সিঃ নামে কালীপ্রসন্ন কিছু কিছু গ্রন্থ সমালোচনা করতেন। দ্রঃ সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১ম), ৪৬৩ পৃঃ।

২. আপনার মুখ আপনি দেখ, ১১ পৃঃ প্রজ্ঞাভারতী (সংস্করণ)।

৩. জন্মভূমি, ভাদ্র ১৩১০।

৪. সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১ খণ্ড) দ্রঃ।

তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন। ফলত বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠ্যাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না।'[১]

কালীপ্রসন্নর প্রতি বিদ্যাসাগরের এমন স্নেহ ও ভালবাসার আর কোন দৃষ্টান্ত নেই। ঐ অনুবাদের কাজ শুরু হয় ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে।[২] তার দুবছর আগে কালীপ্রসন্নও বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ ব্যাপার সমর্থন করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিধবা বিবাহ আইন জারির ঠিক আগে যখন চারিদিক থেকে এর বিরুদ্ধে আবেদন-নিবেদন শুরু হয়, তখন কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কয়েক হাজার লোকের স্বাক্ষরযুক্ত একটা দরখাস্ত লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পাঠান।[৩] শুধু তাই নয়, ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে যখন এই আইন বিধিবদ্ধ হয়, তখনও কালীপ্রসন্ন সংবাদপত্রে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান যে, যারা বিধবা বিবাহ করতে ইচ্ছুক, বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।[৪]

বলা বাহুল্য বিদ্যাসাগরের স্নেহ ও সাহচর্য সেকালে আলালের ঘরের দুলালদের থেকে মানুষ ও শিল্পী কালীপ্রসন্নকে আলাদা করে ফেলেছিল। সমালোচক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় বলতে পারি, 'কালীপ্রসন্ন যে আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবনে চলিতে চাহিয়াছিলেন তদানীন্তন সুখবিলাসলালিত ধনীসন্তানদের তাহা কল্পনার অতীত ছিল, তাঁহার জীবনে এই আদর্শ পরিপূর্ণতা লাভ করিলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর ইতিহাস আরও কিছু পরিমাণ গৌরবময় হইত। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু দেশের পক্ষে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা।'[৫]

আবার বাংলা সাহিত্যের 'সব্যসাচী' বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষুরধার কলমের ঘায়ে সেকালে বহু মেকি বা হঠকারি সাহিত্যিকের নাম কুড়োবার সাধ মিটে যায়। তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগর পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যে প্রতিনিধি স্থানীয় সাহিত্যিক। তখন তাঁর চোখকে ফাঁকি দিয়ে কালীপ্রসন্ন অন্যের রচনা পয়সা দিয়ে কিনে বা কলম ভাড়া নিয়ে নিজের নামে চালিয়ে খ্যাত হয়েছেন, ভাবা শক্ত। সেই বঙ্কিমচন্দ্রও হুতোমপ্যাঁচার নক্শায় সঠিক কথ্যরূপের প্রমাণ পেয়েও, আলালের ঘরের দুলালের গদ্যকে প্রশংসা করেছেন, কিন্তু কোথাও তিনি কালীপ্রসন্নর সাহিত্যিক যোগ্যতা নিয়ে এতটুকু সন্দেহ পোষণ করেননি।[৬]

দ্বিতীয়ত, হুতোম প্যাঁচার নক্শার উত্তর হিসেবে 'আপনার মুখ আপনি দেখ' লিখলেন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। ১৮৬৩ খৃঃ এই গ্রন্থে লেখক কালীপ্রসন্নর চরিত্রকে কল্পনা করে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে ভাষাদান করেন। কিন্তু সেখানেও নক্শার লেখকত্ব নিয়ে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় কালীপ্রসন্নর পক্ষেই স্বীকৃতি জানিয়ে বলেছেন, 'তাতে সংস্কার বড় মন্দ হয়নি, সেইগুলিই বাবুর দর্শনশাস্ত্র হয়েছে এবং তাহাই নিয়ে নিজে নাড়াচাড়া করচেন, ভাগ্যে সেইগুলি শুনে ছিলেন, তাই তো আজ কলম ধোরে বোসলেন।'[৭]

আর এক জায়গায় আরও খোলাখুলি ব্যক্ত করেছেন, 'আপনারা কি দেখেছেন? কোটর

---

১. মহাভারত, ১৮শ খণ্ডের উপসংহার দ্রঃ।
২. সংবাদ প্রভাকর, ১৩ জুলাই ১৮৫৮ খৃঃ।
৩. সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১), ১৯ পৃঃ দ্রঃ।
৪. সংবাদ প্রভাকর, ২২ নভেম্বর ১৮৫৬ খৃঃ।
৫. সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১ম), কালীপ্রসন্ন সিংহ দ্রঃ।
৬. The Calcutta Review, 1871.
৭. আপনার মুখ আপনি দেখ।

থেকে একজন লেখক বেরিয়েছে? তিনি স্নানযাত্রার দিনে সকালে জোয়ার এলো লিখেচেন এবং কত লোককে কত কথাই বোলেচেন, যাহা হউক তবু ভাল, কানে শুনেও আমরা সন্তুষ্ট হোলেম, একাজ এখনও পর্যন্ত ওকাজ ত হয়নি?'[১]

অর্থাৎ এতকাল লেখক নিজে লেখেননি, নক্‌শায় কলম ধরেছেন বলে মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু নক্‌শাটাও অন্যের সেকথা একবারও বলা হয়নি।

তৃতীয়ত, 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার' প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ অনেকের চোখ এড়িয়ে যায়। তার ভূমিকায় হুতোমের পরিচিতি সহজ করে বলা আছে। হুতোম বলেন, 'জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নক্‌শা প্রসব করেছে, সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক মুমুক্ষু সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্য-অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক.'[২]........

যে কলম হুতোমের নক্‌শার সৃষ্টিকারী, মহাভারতের অনুবাদকের মূলেও তাই। এতে সেকথা পরিষ্কার করে উল্লেখ করায় কালীপ্রসন্নের হুতোম হতে বা নক্‌শার লেখক হতে বাধা কোথায়?

চতুর্থত, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার লেখক যদি ভুবনচন্দ্রই হবেন, তবে তিনি তা দাবি করেননি কেন? 'হরিদাসের গুপ্তকথা' প্রকাশের দ্বাদশ সংস্করণে তিনি নিজের দাবি আলাদা সংস্করণে নিজের নাম প্রকাশ করে প্রমাণ করে দিয়েছেন। মূল প্রকাশকের সংস্করণে তাঁর নাম না থেকেও তাঁর লেখকস্বত্ব সবাই স্বীকার করে নেন।

কালীপ্রসন্নের জীবিতকালে না হোক মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ কাল বেঁচে থেকে ভুবনচন্দ্র সে দাবি জানালেন না কেন? কারণ নক্‌শার লেখক তিনি নন বলেই করেননি। তাছাড়া 'নক্‌শা লিখলে, 'সমাজ কুচিত্র' লেখার দরকার থাকত না।

শেষত, 'নক্‌শাই' কালীপ্রসন্নর শ্রেষ্ঠ রচনা। 'গুপ্তকথা' তেমনি ভুবনচন্দ্রের। দুয়ের মাঝখানে ভুবনচন্দ্র লেখেন 'সমাজ কুচিত্র' হুতোমের ভাব ও ভাষার অনুকরণে।[৩] কিন্তু হুতোমের নক্‌শায় যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার অ্যালবাম দেখি, 'সমাজ কুচিত্রে' তা বিরল। আবার নক্‌শা সেকালের বাবু-কলকাতার একটি আশ্চর্য দলিল। ভুবনচন্দ্রের হাত দিয়ে এই রচনা বেরোলে, তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'হরিদাসের গুপ্তকথার' অন্য চেহারা দেখতাম। কেননা, উপন্যাস হিসেবে এটি একেবারেই কাঁচা। এর কাহিনী জোর করে টেনে এনে বসানো, তেমনি এর পাত্রপাত্রীদের ছেঁড়া-খোঁড়া ছবি কার্যকারণ সম্পর্কহীন একটা ব্যর্থ রহস্য-আখ্যান মাত্র।

বস্তুত অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও কলকাতার 'জাস্টিস্ অব্ পীস,' বাংলা সাহিত্যের পেট্রন, কালীপ্রসন্নর পক্ষেই সম্ভব—বিশিষ্ট কলকাতার বিচিত্র অভিজ্ঞতার বাণীবিন্যাস করা। যিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও 'মেঘনাদবধকাব্য'কে নতুন সৃষ্টি বলে চিনতে ভুল করেন নি.— 'নীলদর্পণের' হাঙ্গাম দেখে যিনি লুকিয়ে না থেকে প্রকাশ্য সভায় ও কলমের খোঁচায় অত্যাচারী ইংরেজদের স্বরূপটা তাঁদের মুখের উপরে তুলে ধরতে এগিয়ে যেতে পারেন,— তাঁর পক্ষেই সম্ভব ভাবীকালের সাহিত্যের ভাষায় পুরোনো কলকাতার একটা সামাজিক ইতিহাস রচনা করা।

১. আপনার মুখ আপনি দেখ।
২. দ্বিতীয়বারের গৌরচন্দ্রিকা দ্রষ্টব্য।
৩. জন্মভূমি, ১৩১০ ভাদ্র সংখ্যা দ্র:।

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, 'আলালের ঘরের দুলালের' মাধ্যমেই বাংলা ভাষা প্রথম সংস্কৃতের কঠিন নিগড় থেকে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু সেখানে আলালের লেখক প্রকৃতপক্ষে লেখ্যরীতিরই অনুসরণ করেছিলেন, কথ্যভাষার দিকে তাঁর একটা ঝোঁক ছিল এই মাত্র। আমরা এই ভাষার প্রথম সার্থক প্রয়োগ দেখতে পাই হুতোমের নক্‌শায়। এই প্রয়োগ এমনই যথাযথ যে, 'আজও পর্য্যন্ত কোথায়ও ইহার পরিবর্তন সম্ভব না।'[১]

'নক্‌শায়' কথ্যগদ্যের 'সার্থক' ও 'যথাযথ' প্রয়োগের পরিচয় নিতে কয়েকটি দৃষ্টান্তের আশ্রয় নেওয়া যাক। যথা :

'এদিকে দুইয়ের নম্বরের বাড়ীতে অনেকে এসে জমতে লাগলেন। অনেকে সখের অনুরোধে ভিজে ঢ্যাপঢ্যাপে হয়ে এলেন। চারডেলে দিয়ালগিরিতে বাতি জ্বলছে। মজ্‌লিস্ জক্ জক্ কচ্ছে--পান, কলাপাতের এঁটো নল ও থোলো হুঁকোর কুরুক্ষেত্তর। মুখুয্যেদের ছোট বাবু লোকের খাতির কচ্চেন—"ওরে" "ওরে" করে তাঁর গলা চিরে গ্যাছে। তেলি, ঢাকাই কামার ও চাষাধোপা দোয়ারেরা এক পেট ফির্নি, মেটো ঘণ্টো ও আটা নেব্‌ড়ানো লুসে ফর্‌সা ধুতি চাদরে ফিট হয়ে বসে আচেন--অনেকের চক্ষু বুজে আসছে—বাতির আলো জোনাকি পোকার মত দেখছেন ও এক একবার ঝিমকিনি ভাংলে মনে কচ্চেন যেন উড়চি।'[২]

এই হচ্ছে আদি কলকাতার কথ্যভাষার নিদর্শন। প্যারীচাঁদের মত মেশামেশি নেই সাধুভাষার। বরং কথ্য ব্যবহারের দিক থেকে এই প্রথম সঠিক কথ্যরীতির প্রয়োগ দেখতে পাই। তবে বনেদী কলকাতার উপভাষার ছাপ বেশি। বিশেষ করে ক্রিয়ার ব্যবহারে। যেমন, কচ্চে, কচ্চেন, করিচি, গ্যাচে, এসেচে, উড়চি, বেরুচ্চে, চাচ্চেন, বলিচি, দৌড়ুলো, ফুরুলো, জুড়ুলো, ধল্লেন, বিলুচ্চেন প্রভৃতি 'চ' এর তুলনায় 'ছ' বা 'চ্ছ' এর ব্যবহার কম।

আবার 'লেম'-প্রত্যয়ন্ত কিছু ক্রিয়ার চলন দেখি। যথা, তাতেই শুনলেম, তত্ত্ব কল্লেম, ধল্লেম ইত্যাদি।

অন্যান্য শব্দ ও বাক্‌রীতিতেও আটপৌরে কথ্যর রূপ বর্তমান। যথা, 'বড় বড় রিভিউয়ের তোপেও তত ধো, জন্মে না।' 'মুড়ো খেংরার দিনে দুবার নিকেশ নেওয়া হয়,' 'মূল গায়েনকে মজলিসে রেখে চাচা আপনা বাঁচা,' কথাটি স্মরণ করে মের্দ্দোম ও মন্দিরে ফেলে চম্পট দিলে।' 'এই রকম, ফাঁকি দে,' 'ঠেল মেরেচে, বওয়াটে,' পিদ্দিম, 'বড় মান্‌ষীর', 'ভদ্দর', 'দেচেন ঢ্যামন', 'সোদরবন,' 'তপিস্যে' ইত্যাদি।

মধ্যে মধ্যে প্রবাদ-প্রবচন ও গ্রাম্য ইডিয়াম কথ্যরূপের শক্তি বৃদ্ধি করে ভাষাকে সতেজ করে তুলেছে। যেমন, 'দালালি কাজটা ভাল, "নেপো মারে দইয়ের মতন" এতে বিলক্ষণ গুড় আছে।' 'অনেক পদ্মলোচন দালালির দৌলতে "কলাগেছে থাম" ফেঁদে ফেল্লেন—এরা বর্ণচোরা আঁব,' 'সাত পুরুষের ক্রিয়াকাণ্ড বলেই চড়কে আমোদ করেন,' 'ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেও ছোঁ মারে, মানুষ তো কোন ছার,' 'স্বর্গীয় কর্তার মেজো পিসের মামার খুড়োর পিসতুতো ভেয়ের মামাতো ভাই পরিচয় দিয়ে পেশ হচ্চেন,' 'ভাল কত্তে পারব না মন্দ করব, কি দিবি তা দে'। 'বাবুরা পরের ঝক্‌ড়া টাকা দিয়ে কিনে গায়ে মানে না আপনি

১. হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, সমাজ কুচিত্র, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২. ঐ, ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মোড়ল হতে চান,' 'দশ দিন চোরের একদিন সেধের' ইত্যাদি।

কখনো বা রঙ্গরসিকতার মধ্যে দিয়ে হুতোম সেকালের সমাজের অনেক কথা বলতে চেয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে সে সব বিরক্তিকর ঠেকে। যেমন, "টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন। রামা মুদ্দফরাস্, কেষ্টা বাগদী, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কলকেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠলো।'

(কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা)

আবার কখনো গ্রাম্যশব্দ ব্যবহার করে লেখক শালীনতার সীমা অতিক্রম করে ফেলেন। তাতে ভাষায় শক্তির চেয়ে পীড়নের পরিচয় ফুটে উঠেছে। যথা : 'কোন কাজকর্ম না থাকলে "জ্যাঠাকে গঙ্গাযাত্রা" দিতে হয়, সুতরাং দিবারাত্র হুঁকো হাতে করে থেকে গল্প করে তাস ও বড়ে টিপে বাতকর্ম কত্তে কত্তে নিষ্কর্ম্মা লোকেরা যে আজগুব হুজুক তুলবে, তার বড় বিচিত্র নয়।' (হুজুক)

'হুতোম' ইচ্ছে করলে নক্সার ভাষা থেকে ঐ সব গ্রাম্য বা অশ্লীল শব্দ পরিহার করে ভাষাকে পীড়নের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারতেন। যথা : 'পুরুষ মানুষের' বদলে 'বেটাছেলে' অথবা 'মদ্দ' শব্দ চলতে পারত. কিন্তু হুতোম 'মিনসে' শব্দ প্রয়োগ করেন। এটা কানে বাজে। আবার 'মলত্যাগের' কথ্যরূপ 'পায়খানা' বা 'বাহ্যে' লেখা যেতো। কিন্তু হুতোমের 'হাগা' শব্দ কোন মতেই বরদাস্ত করা যায় না। এমনি 'রাঁড়' বা 'মাগী' শব্দ। আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় তাই যথার্থ মন্তব্য করেন : 'একেবারে উপভাষা ঘেঁষা কথ্যভাষায় লেখা বলিয়া রচনা নেহাৎ খেলো হইয়া গিয়াছে। এ ভাষায় হাসিঠাট্টা ছাড়া কিছু জমে না।'[১] প্যারীচাঁদ সেটা বুঝতে পেরেছিলেন বলে প্রয়োজন মত সাধু ও চলিত ভাষা মিশিয়ে প্রয়োগ করেন।

আসলে লেখক কথ্যভাষাকে আশ্রয় করে একটা কিছু নতুনত্ব আনতে চেয়েছেন ঠিকই, তবু তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভাষার চেয়ে বিষয়কে তুলে ধরা। সেকালের বাবু-কলকাতার কিছু বড় মানুষের হুজুক ও খেয়ালের স্রোতে বাঙালি সমাজ কিভাবে রসাতলে যাচ্ছিল, তাকেই সকলের কাছে তুলে ধরতে চান। তাই ভূমিকায় বলেছেন, 'এই নক্শায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই—সত্য বটে অনেকে নক্শাখানিতে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য। তবে এই মাত্র বলতে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরই লক্ষ্য করিচি, এমনকি স্বয়ংও নক্শার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।'

লেখকের উদ্দেশ্যকে ফুটিয়ে তুলতে ভাষাকে তাই চাঁচা-ছোলা, ব্যঙ্গ-কটাক্ষের আশ্রয় নিতে হয়। হুতোমের রচনা তাই ফটোগ্রাফধর্মী হয়ে উঠেছে। সমালোচক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয় মন্তব্য করেছেন : 'তাঁহার রচনাকৌশল এমনই অপূর্ব যে, পড়িতে পড়িতে সেই কলিকাতাকে আমরা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পারি।' আর এই পুরোনো কলকাতা দেখার সুবাদে ফাউ হিসেবে পাচ্ছি পুরোনো কলকাতার কথ্যভাষা। গদ্য-সাহিত্যে কথ্য ব্যবহারের দিক থেকে এইখানেই হুতোমের নক্শার গুরুত্ব। বলা বাহুল্য, আজকের সর্বজনীন কথ্যরূপের অনেকটা মালমশলা এতেও স্বচ্ছন্দে খুঁজে পেতে পারি।

১. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সমালোচক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের ভাষায় বলতে পারি, 'আলালের ঘরের দুলাল বিস্মৃত হইলে টেকচাঁদও বিস্মৃত হইবেন, কিন্তু চলতিভাষা ও সামাজিক নক্‌শা যতদিন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন হুতোমের মৃত্যু নাই।'[১]

৩.

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' ১৮৬২ খৃঃ প্রকাশের পর বাংলায় এই ধরনের অজস্র বই বটতলা থেকে ছাপা হতে থাকে। এগুলো থেকেই তখন অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত পাঠকেরা সাহিত্যরস পান করতো। এই বইগুলোর মধ্যে থেকে কেবল দু-তিনটিই টিকে আছে। তার মধ্যে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ' (১৮৬৩) উল্লেখ যোগ্য। হুতোমের নক্‌শায় যাঁদের প্রতি নিন্দা ও কটাক্ষ করা হয়েছে—তাঁদেরই পক্ষে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় কালীপ্রসন্নকে আক্রমণ করে 'আপনার মুখ আপনি দেখ' রচনা করেন। তারপর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করবার ব্যয় বহনের সাহায্য চেয়ে কালীপ্রসন্নকে পত্র দিলে, কালীপ্রসন্ন নক্‌শার দ্বিতীয় খণ্ডে পত্রটি তুলে দিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেন, 'হুতোমের নক্‌শার অনুকরণ করে বটতলার ছাপাখানাওয়ালারা প্রায় দুইশত রকমারি চটী বই ছাপান, ও অনেকে হুতোমের উতোর বলে আপনার মুখ আপনি দেখেন ও দ্যাখান। হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করে সাগরবারিতে আপনার মুখ আপনি দেখে জাতিমাত্রেরই যাতে এরূপ হয়, তার বর প্রার্থনা করেছিলেন, উল্লিখিত গ্রন্থকারেরও সেই দশা ও তিনি সেই দরের লোক। কিন্তু কতদূর সফল হলেন, তার ভার পাঠক! তোমার বিবেচনার ওপর নির্ভর করে। তবে এটা বলা উচিত যে, পত্রদ্বারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে পরে পরিবাদ ও পরনিন্দা প্রকাশ করা ভদ্রলোকের কর্তব্য নয়।

ফলে, আপনার মুখ আপনি দেখার গ্রন্থকার হুতোমের বমন অপহরণ করে বামনের চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় হুতোমের নক্‌শার উত্তর দিতে উদ্যত হন ও বই ছাপিয়ে ঐ বই হুতোমের উত্তর বলে কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে ব্যাচেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু দিন ঐ ব্যবসা চল্লো না।'[২]

গ্রন্থটি কেবল কালীপ্রসন্নকেই নয়, মধুসূদন দত্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়[৩] প্রভৃতির মত কবি সাহিত্যিকরাও গ্রন্থকারের বিরূপ সমালোচনায় মেতে ওঠেন। ফলে, 'আপনার মুখ আপনি দেখ' একদিন লোকচক্ষের আড়ালে চলে যায়।

কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে গ্রন্থটি 'সর্বাংশে নিন্দনীয় হইতে পারে না। গ্রন্থের বহু স্থানে উল্লিখিত বাঙ্গালী সমাজের অনেক অনাচার আজও লক্ষিত হইবে।'[৪]

সম্ভবত, সেই কারণের জন্য ১৩১৪ সালে বসুমতী সাহিত্য মন্দির বটতলা থেকে উদ্ধার করে এর একটি সংস্করণ বের করে। পরে শ্রী সনৎকুমার গুপ্ত ১৩৬৮র ফাগুনে বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী থেকে আর একটি সংস্করণ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। বর্তমানে দুটো

১. হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজ চিত্র, ভূমিকা দ্রঃ।
২. ঐ।
৩. সমাজ কুচিত্র, আমাদের গৌরচন্দ্রিমা দ্রঃ।
৪. আপনার মুখ আপনি দেখ, বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

সংস্করণই লুপ্ত প্রায়। কিন্তু নতুন একটি সংস্করণ চোখে পড়েছে।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তবে তাঁর নাট্য-প্রতিভা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে পারা গেছে। তিনি প্রায় কুড়িটির মত নাটক লেখেন।[১] তাছাড়া যাত্রা পাঁচালি, তরজার ছড়া, পালা বাঁধতেন।[২]

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় হুতোমের নক্শার জবাব হিসেবে হুতোমকে কটাক্ষ করে 'আপনার মুখ আপনি দেখ' লিখেছেন। কিন্তু হুতোমের গ্রন্থাদি প্রসঙ্গে লেখক স্ববিরোধী উক্তি করেন। যেমন, 'হুতোমের প্রণীত পুস্তকখানি যিনি একবার পাঠ করেছেন, তাঁকে মুক্তকণ্ঠে তাহার যশ বর্ণন করিতে হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে হুতোমের প্রণীত অনুযায়ী কয়েকখানা পুস্তক প্রকাশিত হইলে আমরা যে কি পর্যন্ত আনন্দিত হই, তা আর বোলে জানাতে পারি নে।'[৩]

আবার গ্রন্থের এক জায়গায় লেখক ঠিক এর উল্টো কথা শুনিয়ে বলেছেন : 'আপনারা কি দেখেছেন, কোটর থেকে একজন লেখক বেরিয়েছেন? তিনি স্নানযাত্রার দিন সকালে জোয়ার এলো লিখেছেন এবং কত লোককে কত কথাই বোলেছেন। যাহা হউক, তবু ভাল, শোনা যাচ্ছে যে, তিনি যে কয়েকটি প্রস্তাব লিখেছেন, তাহা তাঁহার নিজের বটে, কানে শুনেও আমরা সন্তুষ্ট হোলেম, একাল পর্যন্ত ও কাজ ত হয়নি। অন্যের রচনা আপনার বোলে এতদিন লোকালয়ে মানী হোতেছিলেন। কেহ কেহ এমনি লেখক হয়েছেন যে, কলম ধোরে চোখে দেখতে ও কানে শুনতে পান না, দেশাচার সংশোধন কোত্তে গিয়ে যা মনে আসে, তাই লিখে যান, হোলো তো কোন জায়গাটা রেগে গরম হয়েই লিখে চোলেছেন।'[৪]

অতএব এ গ্রন্থের মধ্যে লেখক কিছু কিছু তথ্যের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে উল্টোপাল্টা করে ফেলেছেন। চলিত গদ্য সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য স্পষ্ট নয়। সেখানে তিনি একটা মনগড়া ধারণা তুলে ধরেছেন মাত্র।[৫]

তবু লেখক মুক্তকণ্ঠে ঋণ স্বীকার করেছেন, 'দেশাচার সংশোধন পক্ষে হস্তার্পণ করা খুব কর্তব্য বিবেচনা কোরো আমিও বুড়ো বয়েসে এক মুঠো উৎসাহের মাটী যত্নরূপ জলে গুলে খানিকটে কাদা তইরি কোরে হাতে নিয়েছিলাম, প্রথমত কি যে কর্বো তা আর ভেবে পাইনে, শেষে হুতোম প্যাঁচা মহাশয়ের অনুগামী হইয়া লেখনী ধোরে এই 'আপনার মুখ আপনি দেখ' পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম। ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে আমি লক্ষ্য করি নাই।'[৬]

হুতোমের প্রতি এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে গিয়ে ভূমিকার পাদটীকায় আরও পরিষ্কার করে মন্তব্য করেছেন, 'হুতোমের লিখিত মধুর মধুর শব্দ সকল এবং কোন কোন স্থলটাও এই পুস্তকখানির মধুরতার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে, ইহা স্বীকার করিলাম।'

কিন্তু গ্রন্থের ভাষারীতি বিষয়ে হুতোমের প্রদর্শিত পথে না গিয়ে লেখক প্যারীচাঁদের

১. আপনার মুখ আপনি দেখ, বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
২. সমাজ কুচিত্র, আমাদের গৌরচন্দ্রিমা দ্রষ্টব্য।
৩. আপনার মুখ আপনি দেখ, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৪. ঐ
৫. বিশ্বকোষ, ১ম সং, রঙ্গালয় (বঙ্গীয়) অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৬. আপনার মুখ আপনি দেখ।

সাধুচলিত মিশ্রিত 'আলালী' রীতিকেই বেশি পছন্দ করেছেন। তাই দেখতে পাই 'আপনার মুখ আপনি দেখ'র গদ্যভাষা কোথাও কথ্য-প্রধান সাধু, কোথায়ও সাধু-প্রধান কথ্য। তারই ফাঁকে-ফোঁকরে বিশুদ্ধ চলিতরূপটা বেরিয়ে পড়েছে। গদ্যভাষা কিরূপ হওয়া উচিত এ সম্পর্কে লেখক গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন, 'এক্ষণে আমাদিগের মাতৃমুখী চলিত ভাষা স্বাধীনা হয়ে উঠে নি। ইংরাজি পারস্য আরবি প্রভৃতি অনেক অনেক ভাষার সহিত মিশ্রিতা আছে। নাটকাদি চলিত ভাষায় না লিখিলে রসযুক্ত হয় না। এক্ষণে চলিত ভাষায় নাটকাদি লিখিলে কোন ক্রমে স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিবে না।'[১]

এখানে লেখক বলতে চান, বিদেশি ভাষার উপাদান থাকায় চলিত ভাষা স্বাধীন হয়ে ওঠেনি। নাটকাদি চলিত ভাষায় না লিখলে 'রসযুক্ত' হয় না। কিন্তু বিদেশি ভাষার উপাদানযুক্ত চলিতে লিখলে স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি হবে না। অবশ্য এখানে "স্বদেশীয় ভাষা" বলতে লেখক কি বলতে চান, বোঝা গেল না।

লেখক আরও বলেন : 'যে সকল মহাশয়েরা চলিত ভাষায় নাটক এবং পুস্তকাদি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের রচনা কর্ণপ্রিয় এবং মধুর বলিতে হইবে, তাহা সন্দেহ নাই, কিন্তু উত্তম উত্তম যে সকল শব্দ অপ্রচলিত থাকায় যেন পতিত হইয়া রহিয়াছে, সেই সকল শব্দের আর উদ্ধার হইবার ভরসা থাকে না। বিবেচনা করিলে যাহাতে ঐ সকল শব্দ সরল হইয়া পড়ে, এক্ষণে সাধারণের সেই বিষয়ে যত্ন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।...তাহা হইলেই সেই সকল শব্দ ক্রমে ক্রমে সরল হইয়া আসিবে এবং ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও লেখকের যশোলাভ হইবে।'[২]

লেখকের ধারণা চলিত ভাষায় নাটকাদি লিখলে অপ্রচলিত উত্তম উত্তম শব্দের চলনের সম্ভাবনা আর থাকবে না। তিনি চান, আগে অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার হোক এবং পরে সেগুলো সরল হয়ে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে। লেখকেরও 'যশোলাভ' হবে। অর্থাৎ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহ যতটা না ভাষার দিকে, তার চেয়ে বেশি শব্দের প্রতি, আর সে সব শব্দ অপ্রচলিত ও পতিত শব্দ। ব্যাপারটা লেখকের মাথায় ঢুকেছে—বলিষ্ঠ সাধুগদ্যে লেখা বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' বই দুটো পড়ে।[৩]

তাই চলিত ভাষার কথা বলতে গিয়ে লেখক বিদেশি শব্দ, নাটক, অপ্রচলিত শব্দ এবং বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার দত্তের বই দুটোর কথা পেড়েছেন। ফলে মূল প্রসঙ্গ থেকে কখন সরে এসেছেন জানেন না। এই জন্যেই তিনি গ্রন্থের এক জায়গায় নিজেকে চিনে মন্তব্য করেন, 'যেমত কোন মানুষ এক পথে যেতে যেতে পথভুলে অপর পথে গিয়ে পড়ে, আমারও রচনা সেই রকম। কি কথা বোলতে বোলতে কি কথা এনে ফেলি।'[৪]

সেইজন্যে দেখতে পাই চলিত ভাষার সঠিক প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর না ছিল অভিজ্ঞতা, না ছিল হুতোমের কাছ থেকে আত্মস্মাৎ করার ক্ষমতা। যেমন ভেবেছেন, তেমন তেমন কলম চালিয়েছেন, তা সে সাধু কি চলিত অত তলিয়ে দেখার গরজ বোধ করেন নি। কয়েকটা

১. আপনার মুখ আপনি দেখ, ১৭—১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. ঐ, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৩. ঐ, ১৭—১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
৪. ঐ

দৃষ্টান্ত দিলে লেখকের গদ্য ব্যবহারের পরিচয় পেতে পারি। যথা : 'সন্ধ্যাপূজার সংকল্পে পূজকেরা যেমত তৎপর হয়, রাবণের মৃত্যুবাণ আনিবার কারণ মারুতি যেমন তৎপর হইয়াছিলেন, দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া শোণিত পানার্থে ভীম যেমন তৎপর হইয়াছিল, বাটীতে অকস্মাৎ কোন পরিবারের সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইলে পুরবাসিগণ চিকিৎসক আনিবার কারণ যেমত তৎপর হয়, সভ্যদিগের মধ্যে কয়েকজন পুরুষ তদপেক্ষা তৎপর হইয়া টাকা লইয়া গমন করিলেন, এবং অবিলম্বে সেই রাত্রি একটার সময়ে কয়েক বোতল দেশিরস, ফুলুরি ও বেগুনিভাজী প্রভৃতি ও কয়েক দোলা গোলাপী পানের খিলী লইয়া সমাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।'[১]

এখানে দেখতে-পাচ্ছি লেখক গতানুগতিক সাধুগদ্যেরই পরিচয় দিয়েছেন। এতে উপাদানের দিক থেকে কোথাও কোন ত্রুটি নেই। এমনকি যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যেও চলিত রূপের ছিটে-ফোঁটার পাওনা নেই। তার উপর সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের ভারে একটা গভীর ভাবও বর্তমান।

আবার এ বইতেই দেখি বিশুদ্ধ কথ্যরূপ ও পুরোনো কলকাতার মুখের ভাষার সুন্দর নিদর্শন। যেমন : 'আজকাল অনেক নব্যবাবুরা তামসিক পূজা কোরে থাকেন, এবং দুএকখানা বারোয়ারি পূজাও সেইরূপ হোচ্ছে, এদিকে ধূমধামের সীমা থাকে না, ওদিকে দশপনেরোখানা পাতা পোড়লো তো ঢের। তাও পচা ঘি, তেতো ময়দা ও দুর্গন্ধ মণ্ডাতেই সারেন।

বাগানের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার তো সে রকম কোত্তে পারা যাবে না। কেউ হোটেলের খানা চাবে, কেউ মাছের ঝোলভাত চেয়ে বোসবে, কেউ তেঁতুলদে নোনা ইলিস, কেউ কাসন্দী দিয়ে কাঁকড়া দাও বোলবে, কেবল পোলাও খিচুড়ী লুচীচুচী কোল্লে তো চলবে না। অধিক কি বোলবো, পান্তাভাত পর্য্যন্ত কোরে রাখতে হবে।'[২]

এসব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কথ্যরূপের আটপৌরে চেহারা হুতোমের নক্‌শার কথা মনে করিয়ে দেবে। বলা বাহুল্য এতে সাধুগদ্যের চেয়ে কথ্যগদ্যে লেখায় কারিকুরি বেশি প্রকাশ পেয়েছে। উদ্ধৃতিটির মধ্যে কি ক্রিয়ার ব্যবহারে কি শব্দের প্রয়োগে লেখকের আনাড়ি হাতের বাঁকাচোরা চিহ্ন কোথাও নেই।

কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, এ গ্রন্থে লেখক আগাগোড়া সাধু-চলিতের কোন একটিকে প্রয়োগ করেন নি। এলোমেলো মিশ্র গদ্যরূপও গ্রন্থের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে। সেসব ক্ষেত্রে সর্বনামপদ ও ক্রিয়ার ব্যবহার দেখে ভাবাই যায় নামে এ গ্রন্থের লেখক সঠিক গদ্য ব্যবহারের পরিচয় দিয়েছেন।

তাই সাধুগদ্যের সর্বনাম 'তাহার' শব্দটি যদি চলিত রূপের মাঝখানে বসে, তাহলে কি ভাল শোনায়? সেই রকম ক্রিয়ার বেলাতেও দেখা যাবে যৌগিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাধু চলিতের ভাগাভাগি রূপটা বড় বেমানান ঠেকে। 'আপনার মুখ আপনি দেখ'তে তাও মিলবে অনেক। যেমন, 'বগলে নিয়ে চাদর ঢাকা দিয়ে বাহির হইয়া এসেন', 'সম্মুখে নেবে পোড়ে গাড়ী রাখিতে বোল্লেন', 'এইকথা বলিয়া সকলে গাড়ীতে এসে উঠলেন,' 'নিয়ে বাড়িতে

১. আপনার মুখ আপনি দেখ, ২১—২২ পৃঃ দ্রঃ।
২. ঐ

যাউন,' 'শুনিলে চমকে উঠতেন' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ভাষার এই মিশ্র স্বভাবটা প্যারীচাঁদই প্রথম 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে দেখিয়েছেন। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ও অনেক ক্ষেত্রে আলালীর পথেই পা বাড়িয়েছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করছি। যথা--'রাত্রি হইলে সহরটীতে যেন পাপের মহোৎসব লেগে যায়। এমতে কতকগুলি মনুষ্য আছেন, দিবসে যাহাদিগকে ধার্মিক এবং যথার্থ মনুষ্য নামের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা হয়, রাত্রে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই মুখে কাপোড় ঢাকা দিয়ে বেশ্যালয়ে গমন করেন এবং তথায় সুরার গেলাস ধোরে সুরাপান কোরে লোকালয়ে নিন্দনীয় কতরূপ আমোদ আহ্লাদ কোত্তে থাকেন।...কতকগুলি মনুষ্য এমনি হয়ে উঠেছে যে, তাহারা লোক-লজ্জা মান-সম্ভ্রম সকলই জলাঞ্জলি দিয়েছেন, রাত্রি হইলে সুরাপান করিয়া যে কি কোরে ঢলাঢলি কত্তে থাকে, বোধকরি, তাহা কাহারও অবিদিত নাই, কোথাও বা রাস্তা হইতে অবিদ্যাদের গালাগালি দিয়ে (সে সকল বক্তব্য নহে) এমত গালাগালি খাচ্ছেন, কোথাও বা হেঙ্গামা কোচ্চেন, কোথাও বা কাহার গায়ের চাদরখানি কিংবা হাতের লাঠিগাছটি কেড়ে নিচ্ছেন।'[১]

দেখতে পাচ্ছি দৃষ্টান্তটিতে ক্রিয়াপদের প্রয়োগে কোন রীতিনীতির বালাই নেই। সর্বনাম পদের বেলাতেও তাই। হুতোমের নক্‌শা প্রকাশের পর বাংলা গদ্যে 'আলালী' রূপটাকে আঁকড়ে ধরা দুর্ভাগ্যের বলতে হয়। বিশেষ করে যখন, 'আলালের ঘরের দুলাল' আর 'আপনার মুখ আপনি দেখ'র মাঝখানে খাঁটি চলিতে কিছু সামাজিক নক্‌শা ও নাটক প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া হুতোম, নিশাচর প্রভৃতির নক্‌শায় সেকালের সমাজের যে বিচিত্র চিত্রের পরিচয় মেলে, 'আপনার মুখ আপনি দেখ' সেদিক থেকে আমাদের হতাশ করেছে। মদে ও মেয়েমানুষে বয়ে যাওয়ার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নেই। গ্রন্থটিকে হুতোমের অক্ষম অনুসরণ বলাই ভাল।

৪.

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (জন্ম ২০ জুলাই ১৮৪২, মৃত্যু ১৮ জুলাই ১৯১৬)

১৮৬১ সালের জুলাই মাসে জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনগোপাল গোস্বামীর সম্পাদনায় দৈনিক 'পরিদর্শক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কবিতা লিখে তরুণ ভুবনচন্দ্রের আবির্ভাব এই পত্রের মাধ্যমে। পরের বছর ১৪ নভেম্বর থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ এর সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হলেন এবং ভুবনচন্দ্রকে সহকারী নিযুক্ত করলেন পুরোনো দুই সম্পাদকের সুপারিশে। তিনমাস পর 'পরিদর্শক' বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কালীপ্রসন্ন ভুবনচন্দ্রকে ছাড়েন নি।

এর পর ভুবনচন্দ্রের কর্মজীবনের ইতিহাস একটানা প্রবাহিত হয়নি। কখনো সহকারী, কখনো সম্পাদক, আবার কখনো বা কারো হয়ে গ্রন্থ রচনা, কিংবা কারো রচনা সংশোধন করা ইত্যাদি নানা ধরনের দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশে' দেড় বছর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন, এখান থেকে 'সংবাদ প্রভাকরে' বাইশ বছর ধরে সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন, তারপর 'সাপ্তাহিক বসুমতীর'

১. আপনার মুখ আপনি দেখ, ২১--২২ পৃঃ দ্রঃ।

সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। শেষের দিকে 'জন্মভূমি' পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত থাকেন। 'জন্মভূমির' দত্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁর আমৃত্যু সৌহার্দ্য বজায় ছিল।[১]

ভুবনচন্দ্র নামের কাঙাল ছিলেন না। অনেক গ্রন্থে লেখক হিসেবে তাঁর নামই ছাপা হয়নি। উদীয়মান লেখকদের উৎসাহ দিতে তিনি অনেকের রচনা সংশোধন করে দিতেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৈয়দ মীর মশারফ হোসেনের লেখা 'বসন্তকুমারী' ও 'বিষাদ সিন্ধুর' পাণ্ডুলিপি তিনি 'উত্তমরূপে শোধন' করে দেন।[২] তাছাড়া শ্যামবাজারের ফকিরচাঁদ বসুর 'উজীরপুত্র' (১৮৭২—৭৬), টাকীর জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'অমরনাথ নাটক' (১৮৭৩) এবং চন্দ্রকালী ঘোষের 'কুসুমকুমারী' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৭২) কথাও এখানে উল্লেখ করতে হয়।[৩] অন্যের হয়ে গ্রন্থ রচনা করে দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'হরিদাসের গুপ্তকথা'। আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় কালীপ্রসন্নর 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ও রাজা উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের 'রত্নগিরির' (চার পর্ব) রচনায় ভুবনচন্দ্রের হাত ছিল বলে অনুমান করেছেন।[৪]

ভুবনচন্দ্রের গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়। কাব্য, উপন্যাস, সামাজিক নক্‌শা, প্রহসন, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের সব বিভাগেই তিনি কমবেশি কলম ধরেন। সমালোচক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস তাই তাঁকে 'দ্বিতীয় রাজকৃষ্ণ রায়' বলে অভিহিত করেন।[৫] এই সব গ্রন্থের মধ্যে 'সমাজ কুচিত্র' (১৮৬৫), 'হরিদাসের গুপ্তকথা' (১৮৭৩), 'আশা লহরী', 'আশা চপলা,' 'তুমি কি আমার?' 'বঙ্কিমবাবুর গুপ্তকথা,' 'বিলাতী গুপ্তকথা,' 'যাত্রা বিলাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অনুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'গালিভর', 'সন্তপ্ত সয়তান' ইত্যাদি আমাদের অতি পরিচিত। তবে 'হরিদাসের গুপ্তকথার' লেখক হিসেবেই তাঁর যা কিছু খ্যাতি-অখ্যাতি।

চলিত-গদ্যের ইতিহাসে ভুবনচন্দ্রের গুরুত্বও কিছু কম নয়। সেদিক থেকে তাঁর 'সমাজ কুচিত্রে'র কথা আগেই মনে আসে।

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬২) প্রকাশের তিন বছর পর ১৮৬৫ সালের জানুয়ারিতে 'সমাজ কুচিত্র' নামে ভুবনচন্দ্রও হুতোমের নক্‌শার অনুকরণে আর একটি সামাজিক নক্‌শা প্রকাশ করেন। এর আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে : The Evils of our society. In Bengal. For drawing attention of the young Bengals over their mother Country. By A Midnight-traveller. Published by B. Mook, Pen and Co.

'সমাজ কুচিত্র'। 'মাতৃভূমির প্রতি বঙ্গীয় যুবকগণের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত নিশাচর প্রণীত অমরাবতী সঞ্জীবনী মন্ত্র। ১৮৬৫ সাল। মূল্য ।।০ আট আনা।'

গ্রন্থটির তিনটি উল্লেখযোগ্য সংস্করণ ছাপা হয়। মূল সংস্করণ লেখক নিজেই বের করেন ১৮৬৫ সালে। ২৩ বছর পর ১৮৮৯ সালের জানুয়ারিতে লেখকের অনুমতি নিয়ে লেখকের একমাত্র জামাতা শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছু গ্রহণ-বর্জন করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ

১. ভূমিকা, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, সমাজ কুচিত্র, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব।
২. জন্মভূমি, ভাদ্র ১৩১০ খ্রী, পৃঃ ৬২ দ্রষ্টব্য।
৩. ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য়), পৃঃ ২৫০ দ্রষ্টব্য।
৪. ঐ।
৫. হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, সমাজ কুচিত্র, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব, ভূমিকা।

করেন। মূল সংস্করণকে অনুসরণ করে শেষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে ১৩৫৫ সালে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্সার' সাথে একত্রে ছাপা হয়। এভাবে একত্রে ছাপানোর কৈফিয়ৎ দিয়েছেন সম্পাদকদ্বয়। বলেছেন ভূমিকায় : 'সামাজিক নক্সার দিক হইতে গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণতা দিবার জন্য হুতোমের রচনার সঙ্গে "সমাজ কুচিত্র" ও "পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব" সন্নিবিষ্ট হইল ; এগুলি হুতোমের রচনা না হইলেও হুতোমানুকারী দুই জন শক্তিশালী লেখকের রচনা।'[১]

'সমাজ কুচিত্র'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটা যে কেবল ভাব-ভাষায় হুতোমের অনুকরণ তাই নয়, উপহারপত্রটিও হুতোমের অনুসরণে রচিত এবং স্বয়ং হুতোমকেই উপহার দিয়েছেন লেখক।

'সমাজ কুচিত্র' সাতচল্লিশ পৃষ্ঠার বই।[২] 'অনুষ্ঠান' শীর্ষক অংশ ও কিছু কিছু পাদটীকা ছাড়া সমুদয় কলিকাতার কথ্যভাষায় লেখা। উপহারপত্রে 'চিড়িয়াখানার নিশাচর' ছদ্মনামে লেখক—'শ্রীযুক্ত হুতোমচাঁদ দাসকে' এই নক্শাখানি উপহার দেন। গ্রন্থটি হুতোমের ভাব ও ভাষাকে অনুসরণ করে রচিত। এতে আলিপুরের কৃষিপ্রদর্শন, সরস্বতী পূজা ও পল্লীগ্রাম তীর্থ—নামে তিনটি পরিচ্ছেদ আছে। লেখক 'অনুষ্ঠান' অংশে আবেদন করেছেন, 'পাঠকগণ পাঠ করিয়া সৎকর্ম্ম হইতে দুর্গন্ধগুলি দূর করিতে চেষ্টা করুন।'

হুতোমের কথ্যগদ্য অনুসরণে 'সমাজ কুচিত্র' লেখা হয়েছে। কিন্তু তবু ভাষায় নিশাচরের স্বকীয়তা ফুটে উঠেছে। যেমন, ক্রিয়াপদের ব্যবহারে আদি কলকাতার রূপটা বেশি করে ধরা পড়েছে। তাছাড়া তৎসম, সংস্কৃত ও যুক্তব্যঞ্জন শব্দের ব্যবহার হুতোমের নক্শার তুলনায় অনেক বেশি প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তার উপর সর্বনামপদেও কিছু সাধুরূপ বর্তমান। অন্যান্য শব্দের মধ্যে ইংরাজি শব্দের সুপ্রয়োগ চোখে পড়ে। ফলে এখানে হুতোমের চেয়ে সাধু গদ্যের উপাদান বেশি। সেই কারণে এখানে কলকাতার শিষ্টসমাজের ব্যবহৃত কথ্যগদ্যের সন্ধান পেয়ে যাই। আর সেদিক থেকে হুতোমের চেয়ে নিশাচরের কৃতিত্ব অনেকখানি। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা এর প্রমাণ পেতে পারি :

'আজ একাদশী। গগনমণ্ডলের সনক্ষত্র একাদশকলা কুমুদবান্ধব উদয় হলেন। রাস্তার লণ্ঠনের আলোকমালা চন্দ্রমাকে দেখে অভিমানে মিড়্‌মিড়্ কত্তে লাগলো। যুবকগণ গোছসই বারাণ্ডার নীচে গিয়ে উৰ্দ্ধমুখ হলেন। বারাণ্ডাস্থ বধূরা গর্ভবতী রমণীর স্তনযুগের ন্যায় নম্রমুখী হতে লাগলেন। রাজপথ চন্দ্র ও কুমুদিনীর সন্দর্শনের ন্যায় অপূৰ্ব্ব শোভা ধারণ কল্লে। এইখানে—ফিলজফারদের আবিষ্কৃত লৌহ ও চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি সার্থক হলো।'

(আলীপুরের কৃষি প্রদর্শন)

দেখতে পাচ্ছি এখানে 'উৰ্দ্ধমুখ, গগনমণ্ডলে, সনক্ষত্র, একাদশকলা, কুমুদবান্ধব' ইত্যাদি সমাসবদ্ধ ও যুক্তব্যঞ্জন শব্দের ব্যবহার রয়েছে। তাছাড়া 'চন্দ্রমা, বধূ, রমণী, কুমুদিনী' প্রভৃতি তৎসম ও সংস্কৃত শব্দও যথেষ্ট আছে। এতে ভাষায় এক ধরনের গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে।

তবে এই গাম্ভীর্যের মধ্যেই রসনা-নিপুণ নিশাচরের সরসতা লক্‌লকিয়ে উঠেছে। সেসব ক্ষেত্রে আমরা কমলাকান্তকে যেন দেখতে পাই। যেমন : 'কিন্তু কল্‌কে একটি। সে নূতন

১. ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

বিয়ে করা কনের বৌভাতের মত একে একে সতের জনের মানরক্ষা কচ্চে। বাবু আদুড়গায়ে আড়াই হাত উঁচু গদির মাঝখানে নীলগিরির ন্যায় পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন। পেটটি পাটনাই ময়ককেও লজ্জা দিচ্চে। কিন্তু তিনি সুশ্রী। গজস্কন্দ, গৃধিনীকর্ণ, আভ্রুচক্ষু এবং নাতিদীর্ঘ। বর্ণ পাটকিলে। চুল ছোট। পরা সরু ফিনফিনে শাদা লালপেড়ে ধুতি।...বিদ্যাব মধ্যে বর্ণপরিচয় বাকি। ইহারা পল্লীগ্রামের বড়লোক। ১০ গণ্ডা মোসাহেব।'

(পল্লীগ্রামতীর্থ)

ছোট ছোট বাক্য এবং ভঙ্গিটিও নিজস্ব ও লেখকের করায়ত্ত। তৎসম ও সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে আটপৌরে কথ্যের মিশ্রণে এ গদ্যকে অনন্যতা দিয়েছে।

'হরিদাসের গুপ্তকথা'[১] উপন্যাসটি ভুবনচন্দ্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থ থেকেই লেখক হিসেবে ভুবনচন্দ্রের খ্যাতি-অখ্যাতি। কালীপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যুর পর ভুবনচন্দ্র শোভাবাজারের রাজা উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের বেতনভোগী লেখক নিযুক্ত হন। এই সময় ভুবনচন্দ্র উপেন্দ্রকৃষ্ণের হয়ে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' উপন্যাসটি লিখে দেন। উপন্যাসটি, ইংরাজি লেখক রেনল্ড্সের (G. M. Reynolds) বিলিতি রাজরাজড়া ও আমলাদের পারিবারিক কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি নিয়ে রচিত এবং বিলেতে নিষিদ্ধ উপন্যাসের মাদ্রাজি সংস্করণের ভাবানুবাদ। উপন্যাসের কথাবস্তু এখানে লেখক পুরোপুরি দেশি ছাঁচে ঢেলে রচনা করেন। মূল প্রকাশকের সংস্করণে তিন লাইনের বড় নামকরণ বজায় রাখা হয়েছে। প্রথম লাইন, 'এই এক নূতন'। দ্বিতীয় লাইন, 'আমার গুপ্তকথা।।' তৃতীয় লাইন, 'অতি আশ্চর্য।।।'

বর্তমান আলোচনা মূল প্রকাশকের দ্বাদশ সংস্করণ অনুসরণে করা হয়েছে। এতে মোট ১০৯টি কাণ্ড, চারটে পর্ব ও আরও দুটো অতিরিক্ত স্তবক বা প্রস্তাব—'অন্ত্যস্তবক' আর 'ষড়চক্রভেদ'। 'অন্ত্যস্তবক' লেখকের ভূমিকা, আর 'ষড়চক্রভেদ' প্রকাশকের প্রতিবেদন। প্রকাশ কাল সম্বৎ ১৮৬৩, স্থান কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৯০। গ্রন্থ শেষে লেখক একে 'রহোন্যাস'—(রহস্য + উপন্যাস = গুপ্তকথা) বলেছেন। প্রথমপর্ব ১২৭৭ বঙ্গাব্দের পৌষে, ১৮৭০ খৃঃ বড়দিনের সপ্তায় প্রকাশিত হয়। শেষপর্ব ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বসন্তকালে, ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

প্রত্যেক পর্বের গোড়ায় একটু করে স্তবক বা ভূমিকা দেওয়া। লেখকের নাম ছিল সবশেষে--'কৌতূহল-পরিতৃপ্তি' ও 'বিদায়' শীর্ষকে। সাতটি সংস্করণের পর বইটি দুই লেখকের নামে আলাদা আলাদা ছাপা হতে থাকে। বহু প্রচারিত বটতলা সংস্করণের নাম 'হরিদাসের গুপ্তকথা'। মূল প্রকাশকের সংস্করণে লেখক হিসেবে ইংরাজিতে 'কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ' নাম ছাপানো হোত।

'গুপ্তকথার' লেখক হিসেবে উপেন্দ্রকৃষ্ণের পক্ষ সমর্থন করে প্রকাশক শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দেব গ্রন্থের অষ্টম সংস্করণ থেকে সংযোজিত 'ষড়চক্রভেদে' বিস্তারিত আলোচনা করে[২] জানিয়েছেন যে, শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'গুপ্তকথার' আংশিক লেখক মাত্র। সেখানে তাঁর ভূমিকা একজন বেতনভোগী লিপিকর মাত্র।

---

১. বটতলা সংস্করণে গ্রন্থটি 'হরিদাসের গুপ্তকথা' নামেই খ্যাত। বটতলা প্রকাশনা থেকে 'হরিদাসীর গুপ্তকথা' নামে আর একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির লেখক শ্রীপঞ্চানন রায়চৌধুরী।

২. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

কিন্তু ভুবনচন্দ্রের জীবনকথা[১] ও সমকালীন প্রকাশিত গ্রন্থে 'গুপ্তকথার' লেখক হিসাবে ভুবনচন্দ্রের প্রসঙ্গ দেখে আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় ভুবনচন্দ্রকেই 'গুপ্তকথার' প্রকৃত লেখক হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন।[২]

'আমার গুপ্তকথা' বা 'হরিদাসের গুপ্তকথা' আসলে একটি 'রহস্য উপন্যাস'। হরিদাস নামে একটি বালকের জীবন নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে শেষে মানকরের রাজা হবার কাহিনীই এতে উপস্থাপিত হয়। এর মধ্যে নানা পারিবারিক কেচ্ছা আছে, প্রতারণা দলিল জাল সম্পত্তি আত্মসাৎ আছে, আছে নারীহরণ, একাধিক 'গুপ্তহত্যা' ইত্যাদি বহু লোমহর্ষক ঘটনা। সমস্ত কাহিনী একাধিক নাম দিয়ে একসূত্রে গেঁথে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কিন্তু কাহিনীর বিন্যাসে গুপ্তকথার রহস্যের পর্দা অনেক জায়গায় খসে গেছে। যেমন, গুজরাটে মল্লদাস নামে এক ভয়ঙ্কর ডাকাতদলের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে হরিদাস একা অনেকক্ষণ যুঝেও অক্ষত থাকে। এমন কি পরে পেছন থেকে আঘাত করে তাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে হাতে পায়ে লোহার বেড়ী পরিয়ে বদ্ধ ঘরে রেখে দেয়। অন্য ঘরে প্রভুর শ্যালক কন্যা মতিয়া। হরিদাস প্রায় অক্ষতভাবে যাদুকরের মতন সেখান থেকে মতিয়াকে উদ্ধার করে পালিয়ে আসে। এমনি বহু গালগল্প ফাঁদার শেষে হরিদাস তার জন্মবৃত্তান্ত-রহস্য জানতে পারে এবং মানকরের রাজা হয়ে বসবাস করে।

কাহিনীর বাঁধন অনেক জায়গায় আল্‌গা। কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি গুপ্তহত্যা অনেক জায়গায় পুলিশ যেন দেখেও দেখে না গোছের। তাছাড়া অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও চরিত্রের ছড়াছড়ি।

উপন্যাসটির আকর্ষণ এর ভাষারীতি। লেখক সহজ ভাবে স্বাভাবিক চলিত গদ্য ব্যবহার করে দেখিয়েছেন, যা ইতিপূর্বে এই ধরনের আখ্যানমূলক গদ্যগ্রন্থে আগাগোড়া দেখা যায়নি। ভাষায় পুরোপুরি কলকাতা অঞ্চলের মুখের ভাষার ছাপ। ছোট ছোট বাক্য, বাক্যগুলিও সুবিন্যস্ত। যেমন :

"একদিন সন্ধ্যার পর আমি একা বাইরের দরজার ঘরে বোসে আছি, সম্মুখে মাটির দের্‌কোয় একটী দুর্গপ্রদীপ জ্বলচে, কোলে তালপাতে লেখা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা। দরজাখানি ছিটোনো বাঁশের, সামনের ভিতটি মাটির, আর তিন দিকে দরমার বেড়া ; একদিকে গণিক্লথের পর্দ্দা, চাল গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া। তারি পাশে বাড়ীর ভিতরের দিকে রান্নাঘর, সেই ঘরে ব্রাহ্মণী আর তার বড়মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলাবলি কচ্চেন, 'কেমন কোরে সংসার চোলবে?'"[৩]

দেখতে পাচ্ছি 'সমাজ কুচিত্রে'র (১৮৬৫) সমাসবদ্ধ ভারি শব্দ এখানে প্রায়ই অনুপস্থিত। তার জায়গায় আটপৌরে ও পুরোনো কলকাতার কথ্যভাষার উপাদান স্থান পেয়েছে। দের্‌কো, দরমা, দুর্গপ্রদীপ, তালপাতে লেখা প্রভৃতি বস্তুগুলো আজকের কলকাতায় দেখা না মিললেও, আজকের কথ্যগদ্যে এই শব্দগুলো গল্পে উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায়।

এই উপন্যাসে কথ্যরূপের সহজভঙ্গির আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি যেখানে দু-একটি

১. জন্মভূমি, ভাদ্র ১৩১০ বঙ্গাব্দ ও প্রবর্ত্তক, ভাদ্র ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।
২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)।
৩. দ্বাদশ সংস্করণ, প্রথম কাণ্ড।

গ্রাম্য ইডিয়ামের সন্ধানও পাওয়া যায়। যথা :

"যে তিনজন গাড়ীর ভিতর ছিল, তাদের মধ্যে একজন একটা পিস্তল বার কোরে, আমার কপালের উপর ধোরে বাংলা ভাষায় কর্কশস্বরে বোল্লে, 'কেমন! এখন ত পেয়েছি! আর কোথা যাবি? বড় দম্‌বাজী কোরে কৃষ্ণকিশোরকে বাঁচিয়েছিস। এইবার তোর নিজের কি দশা হয় দ্যাখ। চেঁচাস যদি, এ এই পিস্তল দিয়ে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দিব!"

এখানে 'দম্‌বাজী কোরে' ও 'মাথার খুলি উড়িয়ে দিব' এই মৌখিক ইডিয়াম গুলো ভাষার শক্তি বাড়িয়েছে।

ভাষার অনেক জায়গায় লেখকের গদ্য ব্যবহারের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। উপস্থাপ্য বিষয়কে নিখুঁত করে তুলতে ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করেছেন। বাক্যগুলিও আবার আটপৌরে শব্দে সহজ-সরল। সমকালীন উপন্যাসের ভাষায় তখনও লেখকের এই বিশিষ্ট রীতিটির পুরোপুরি দেখা মেলেনি। আর একটি দৃষ্টান্ত :

'বাবুর ছোট খুড়ী গৌরবর্ণ, যেমন হলুদ ফেটে পোড়্‌চে। গড়ন মাফিক-সই, দোহারা ; চোক দুটী ছোট, চোকের পাতাগুলি বেশ লম্বা লম্বা, চাউনি ঈষৎ বাঁকা, ভুরুর মাঝখানে ফাঁক আছে, চুলগুলি বেশ কালো, কপাল পাড়া, হাত পার গড়ন বেশ ডোল-সই, আঙুলগুলি ক্ষুদে ক্ষুদে, চাপার কলির মতন মোলাম। কাঁধ তোলা, কোমর খুব সরু নয়। ঠোঁট দুখানি টুকটুকে, উপরের ঠোঁট কিছু উঁচু। গাল পুরন্ত, কিন্তু চোখের কোল বসা। কান দুটী বড়, দাঁতগুলি বেশ সাজানো, তাতে মিসির রেখা। বোলতে গেলে চেহারাখানি প্রায়ই নিখুঁত ; কেবল দুঃখের মধ্যে নাকটি কিছু মোটা, আর চুলগুলি কিছু খাটো। বিধবা বটেন, কিন্তু হাতে দুগাছি বালা, গলায় একছড়া সোনার হার দুহালি কোরে দেওয়া, আর পাড়ওয়ালা ফরসা ফরসা কাপড় পরা আছে! সুর মধ্যম, স্বাভাবিক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা কওয়া অভ্যাস। চলন চঞ্চল, বয়স অনুমান ২৫/২৬ বৎসর।'[১]

বর্ণনার বিষয়কে আটপৌরে কথ্যভাষায় এত বাস্তব করে প্রকাশ করতে সমকালীন গদ্যে এমন ভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। আটপৌরে শব্দ, গ্রাম্য ইডিয়াম প্রভৃতি এই কথ্যগদ্যের রূপ ও শক্তিকে বাড়িয়ে তুলেতে সাহায্য করেছে। ভুবনচন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কথাশিল্পে এই ভঙ্গিটি গৃহীত হতে দেখা যায়। সাধুগদ্যের কালে ভুবনচন্দ্রের এই কৃতিত্ব নিতান্ত কম নয়।

তবে সাধুগদ্যের কালে ভুবনচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ভাষায় সাধুভাষার উপাদান ভাষার প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। কথ্যরূপ সেই সব ক্ষেত্রে কিছু উৎকট বা কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। যুক্তব্যঞ্জন ও সমাসবদ্ধ শব্দের প্রয়োগ করে মনে হয় পটভূমিকে কিছু গম্ভীর করাই এসব ক্ষেত্রে লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যেমন :

'কিন্তু দৈবের ঘটনা, বিধাতার সংযোগ, যখন সন্ন্যাসী হোয়ে, সন্ন্যাসব্রতের আশ্রয় অবলম্বন কোরে তীর্থে তীর্থে পরিব্রাজকরূপে পর্যটন করি, সেই সময় দৈবাৎ এক আশ্রম থেকে দর্শন করি, নিরলঙ্কারা, মুক্তকেশী, ছিন্নবসনা একটি স্ত্রীলোক, আত্মজীবনে নিরাশ্বাসিনী হোয়ে স্রোতস্বতী ভাগীরথীজীবনে জীবন বিসর্জ্জন কোচ্চেন। দ্রুতবেগে তীরস্থ হোয়ে আমি তাঁরে উদ্ধার করি। দেখি, সেই আত্মবিনাশাভিলাষিণী রমণী অপর কেউ নন, আমার চিরভক্তিপাত্রী পতিবিয়োগিনী, শোকসন্তপ্তা, আমার মাতৃসমা জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপত্নী,—এই

১. পরিবারের পরিচয়, ৬৫—৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

আপাতপ্রাপ্ত নিরুদ্দিষ্ট প্রবোধচন্দ্রের গর্ভধারিণী জননী'।[১]

দেখতে পাচ্ছি, এখানে ক্রিয়াপদই কেবল কথ্যরূপের, বাকি সাধুগদ্যের উপাদানে ভরা। লেখকের স্বাভাবিক গদ্য ব্যবহারের ঢঙটা এসব ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। ভাষা এখানে বেশ কৃত্রিম, অবশ্য গুপ্তকথায় এমন নজির কম।

আলোচনার সুবিধার জন্যে এখানে গুপ্তকথার গদ্যের বিশেষত্বগুলো তালিকা বদ্ধ করা হচ্ছে। যথা :

এক।। ক্রিয়াপদ ঃ ক্রিয়াপদে বহুক্ষেত্রে 'ছ' এর ব্যবহার কম, 'চ' বা 'চ্চ'-এর প্রয়োগ বেশি। কোচ্চে, বোলচি, খাচ্চে, জ্বলচে, কোচ্চেন ইত্যাদি। আবার 'লেম'--প্রত্যয়ন্ত খাস 'কলকেতে' ক্রিয়ার ব্যবহার রয়েছে। যেমন, বোল্লেম, চেয়ে থাক্‌লেম, বেরুলেম, গেলেম, দৌড়ুলেম ইত্যাদি।

দুই।। সর্বনামপদ ঃ অনেক জায়গায় সর্বনামপদের ব্যবহারে কাব্যিক রূপ পাই। যেমন : তোরে, আমারে, তারে, তাঁরে প্রভৃতি।

তিন।। স্ত্রী-লিঙ্গের আকারে বিশেষণ পদের প্রয়োগ। যেমন : নিরলঙ্কারা, ছিন্নবসনা, নিরাশ্বাসিনী, শোকসন্তপ্তা, মাতৃসমা প্রভৃতি।

চার।। শব্দ-দ্বিত্ব ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখি। যেমন ঃ ডাকবুকো, খুসখুস, ধন্নিসান্দি, নুড়ি-নুড়ি, চিক্‌মিক্ দাড়ী মাজীরা, এবড়ো খেব্‌ড়ো প্রভৃতি।

পাঁচ।। মাঝে মাঝে বড় বড় সমাসবদ্ধ শব্দের দর্শন মেলে। যথা ঃ বায়ু-সঞ্চালন-বিরহিত আকাশ, জাগ্রতাবস্থাতেই, বিনম্রস্বরে, রাজকুলোদ্ভব, আবাল-বৃদ্ধবনিতারা, ভাগীরথীজীবনে, আত্মবিনাশাভিলাষিণী পতি-বিয়োগিনী, জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপত্নী-সহোদর-তাড়িত প্রভৃতি।

৫.

চুনিলাল মিত্র : জুনিয়ার টেকচাঁদ ঠাকুর : (১৮৪২–১৯১৪)

টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলালের' প্রকাশের এগারো বছর বাদে ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে 'কলিকাতার নুকোচুরি' (১ম) গ্রন্থের আত্মপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যে টেকচাঁদ ঠাকুর 'জুনিয়ারের' আবির্ভাব। এই 'জুনিয়ার' আর কেউ নন—প্যারীচাঁদ মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র, চুনিলাল।

১৮৪২ খৃস্টাব্দে খড়দহে মামার বাড়িতে তাঁর জন্ম। পিতার সাত পুত্রের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। মায়ের নাম বামাতোষিণী বা বামাকালী দেবী। কোলুটোলা ব্রাহ্ম স্কুল ও হিন্দু কলেজে তিনি পড়াশোনা করেন। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে মাত্র ষোল বছর বয়সে কোন্নগরের ব্রাহ্মনেতা শিবচন্দ্র দেবের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

প্রথমে কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে বছর খানেক অন্যতম পরিচালক রূপে কর্মজীবন শুরু, পরে জ্যাঠামশাই নবীনচাঁদ মিত্রের নির্দেশে জ্যাঠতুতোভাই রাধারমণের সঙ্গে জমিদারির কাজে বর্ধমান মেদিনীপুর অঞ্চলের জঙ্গল মহলে অবস্থান। সেই সময়েই 'কলিকাতার নুকোচুরির' রচনা। সম্ভবত এই বই প্যারীচাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেন, রামতনু

১. দ্বাদশ সং, ৪৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

লাহিড়ী মহাশয়। বই পড়ে রুষ্ট হয়ে প্যারীচাঁদ পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।[১]

চুনিলালের সাহিত্যকর্মের আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। এমন কি 'কলিকাতার নুকোচুরির' দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশনার প্রতিশ্রুতি তিনি রাখতে পারেননি।[২]

'আলালের ঘরের দুলালের' কথা উঠলে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার' (১৮৬২ খৃঃ) কথাও আসে অনিবার্যভাবে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সেকালের বাবু-কলকাতার সমাজজীবনের এক অনবদ্য দলিল হিসেবে বই দুটোর মূল্য অনেক। জুনিয়ার টেকচাঁদের 'কলিকাতার নুকোচুরি' সেই ধারায় আর একটি সংযোজন।

'নুকোচুরি' শব্দটির মধ্যে বটতলার গন্ধ বর্তমান। এক সময় 'হুতোম'-এর নক্‌শার জনপ্রিয়তায় বটতলার আসর জাঁকিয়ে ওঠে। তাতে বেশ কয়েকশো বাংলা নক্‌শা ধরনের বই ছাপাও হয়। বাংলা নাটক প্রহসন থেকে কবির লড়াই-এর আসরেও তার ঢেউ গিয়ে লাগে।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার' জবাবে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় লেখেন 'আপনার মুখ আপনি দেখ' (১৮৬৩)। কিন্তু সেকালের সুধীসমাজে সে বই নিন্দিত হয়। তবু তখন অসংখ্য নক্‌শার মধ্যে 'আপনার মুখ আপনি দেখ' ও 'কলিকাতার নুকোচুরি' সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্থান পাবে।

'নুকোচুরি'তে সেকালের বাঙালি সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর ব্যঙ্গচিত্র ফুটে উঠেছে। এতে 'আলালের' প্রভাব বেশি, তবে হুতোম ও 'আপনার মুখ আপনি দেখ'-এর কিছু ছাপ আছে। দু-একটি ক্ষেত্রে লেখক প্রায় কার্বন-কপিও করে ফেলেছেন। এতে অনেক পিতৃবন্ধু ও সমকালীন বহু পরিচিত ব্যক্তির অবিকল ক্যারিকেচার আছে—সেকালে এগুলি ধরে ফেলা কষ্টকর ছিল না। গ্রন্থ প্রকাশের পরে অনেকেই তাই বিচলিত বোধ করেছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও ছিলেন সেদলে। আর পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদের কারণও এই।[৩]

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে চুনিলাল স্বাভাবিক হিউমার-বোধের সঙ্গে অনেকখানি সামাজিক ন্যায়বোধের দ্বারা চালিত হয়েছেন। বারটি অধ্যায়ে লেখক রসিক ভঙ্গিমায় মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ-সহ সেকালের বাবু-কলকাতার ক্ষয়িষ্ণু জীবনের বিরুদ্ধে নৈতিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছেন।

বাংলা কথ্যগদ্যের ক্রমব্যবহারের ধারায় 'আলাল', 'হুতোম'-এর নক্‌শার মতই 'নুকোচুরির' গুরুত্বও কম নয়। বলা বাহুল্য 'আলালের' ভাষার প্রভাবই এখানে বেশি। সাধুরূপের মোড়কে 'নুকোচুরি' রচিত। তবু কথ্য ব্যবহারের দিক থেকে টেকচাঁদের সঙ্গে জুনিয়ার টেকচাঁদের পার্থক্যও অনেক।

প্রথমত, টেকচাঁদে পাই নানা অঞ্চলের কথ্যভাষা এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা ইতস্তত ছড়ানো। জুনিয়ার টেকচাঁদের নুকোচুরিতে একমাত্র কলকাতা অঞ্চলের ভদ্রসমাজের মুখের ভাষাকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকতে দেখি।

দ্বিতীয়ত, টেকচাঁদের গদ্যে কথ্যরূপ সাধুরূপের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় আগাগোড়া লক্ষ্য করা যায়। জুনিয়ার টেকচাঁদে কথ্যভাষা অনেক বেশি মার্জিত।

তৃতীয়ত, টেকচাঁদের আলালে একাধিক কথ্যভাষার সংগ্রহ আছে। এদের কোন একটিকে আদর্শ বলে গ্রহণ করা অসম্ভব। জুনিয়ার টেকচাঁদের নুকোচুরি থেকে আদর্শ কথ্যগদ্যের

১. এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।
২. ঐ।
৩. ঐ, শারদীয় ১৩৮৭ সংখ্যা, ৫৪—৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

রূপটাকে চিনে নিতে কোন কষ্ট হয় না।[১] যেমন :

'আবদারে বাবু চরসের নাম রাবণ আর গাঁজার নাম রাম রাখলেন। যখন যে বিষয়ের ইচ্ছে হোতো, রামকে কি রাবণকে ডেকে বোল্লে অমনি এডিক্যাম্প বাবুরা চরস কি গাঁজা সেজে তয়েরি কোত্তো। শেষে রঙ্গভূমিতে সুরা রূপা নটী দেখা দিলেন, তাঁর ভাবভঙ্গিতে আবদারে বাবু মোহিত হয়ে গেলেন। সুরার অভিনয়ে কত আমির ওমরা, রাজা রাজড়ার দফা নিকেশ হয়েছে! আবদারে বাবুর তখন রিক্ত হস্ত, মার কাছ হতে আবদার কোরে যা নিতেন, তাতে আর আমোদের চূড়ান্ত হোতো না। প্রথমতঃ আমাদের ইহুদি আতরওয়ালাকে ফোরটি এইট পারশেন্টে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে টাকা ধার কোরে রকমারি নিয়ে আমোদ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। সেই সময়ে আবদারে বাবুর দলটা খুব বেড়ে উঠ্‌লো। যেখানে বিয়ারিং পোষ্টে মদ চলে, অনেকেই পায়ের ধুলো দিয়ে বাবুর অনুগত হয়ে থাকে'।

এই হচ্ছে সেকালের কলকাতার ভদ্র-সমাজের কথ্যভাষা। ছোট ছোট বাক্য। যুক্তব্যঞ্জন নেই বল্লেই চলে। কেবল ক্রিয়ার রূপেই নয়, প্রচুর তদ্ভব শব্দের সঙ্গে দেশি ও বিদেশি শব্দের এমন প্রয়োগনৈপুণ্য—একে আদর্শ চলিতগদ্য বলতে অসুবিধে নেই।

আবার পাত্রপাত্রীদের সংলাপের ভাষাতেও সেই মেজাজকেই দেখতে পাই।[২] যেমন :

'পামর। নুকোচুরি তো একটু চাই হে, নুকোচুরি ছাড়া কি কাজ আছে?

ক্ষেত্র। চূড়ামণি মহাশয়! তোমার মুখে ফুল চন্নন পড়ুক। "শুভস্য শীঘ্রং" আমার আজ যদি হাতে সুতোবাঁধা হয়, সেই বাঁধাতে আমি আপনাদের কাছে, চিরকাল বাঁধা থাকবো। ব্রজ! তুমি ভাই একটু মনোযোগী হয়ে কন্যা স্থির কোরে এস, আজই যেন শুভকর্ম শেষ হয়, এর পর বাবুর এমন না থাক্‌লে সব ফোষকে যাবে।

ব্রজ। বাবা! আমাকে কিছু বোল্‌তে হবে না, আজ তোমার বিয়ে দিয়ে তবে অন্য কাজ। আমি এই চল্লেম।'

দেখা যাচ্ছে দুটো দৃষ্টান্তের ভাষায় সাধুক্রিয়ার একটিও শব্দ নেই। এমন নিটোল কথ্যগদ্যের চেহারা টেকচাঁদের আলালেও নেই। একালের কলকাতায় এখনো এই কথ্যরূপের অস্তিত্ব বর্তমান।

শুধু তাই নয়, ভাষাকে চুনিলালের মত রসনা-নিপুণ স্বাচ্ছন্দ্যচারী করতেও আমরা টেকচাঁদ কি হুতোমেও দেখতে পাই না। যথা :

'ক্ষেত্র। সেগুড়ে বালি! বাবু তো পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছেন। টোপ ফেল্‌লে আর কি হবে বল? এক আদটা পুঁটিও পড়বে না!

চূড়ামণি। তবে চল বেড়িয়ে পড়ি। কোথাকার জল কোথায় পড়ে দেখা যাক্। আমাদের কপাল কি এগ্নি ভেঙ্গে গেছে হে, যা যোড়াগাঁতা দিলেও চলবে না। ভাল, একবার পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে দেখা যাক না, কি হতে কি হয়, সেখানে তোমার নুকোচুরি নাই?

ক্ষেত্র। যাবে ত চল, আমার তো এগুলেই হলো, কথায় বলে "ভাত খাবি না হাত ধোব কোথায়"। আমি যেমন করে আছি তা শত্রু যেন না থাকে। "না মরি না বাঁচি আড়া আগুলে পড়ে আছি" এখানেই হোক বা পশ্চিমেই হোক এক রকম করে কেটে গেলেই হোলো, আমার এখন দিনগত পাপক্ষয়।' (এক্ষণ, শারদীয়া

১. এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা, ৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য
২. ঐ, ৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বলা বাহুল্য, আগাগোড়া নুকোচুরিতে কথ্যরূপ এক ভাবে নেই। এতে একই সঙ্গে সাধুগদ্যও আছে, আবার সাধু-চলিত-মিশ্রিত গদ্যও চোখে পড়ে। তবে মিশ্রণ ব্যাপারটা আলালের চেয়ে অনেক কম। যথা :

'বণিতার বিষয় পাবার কথা শুনিয়া মনে করিল, এ সময়ে তথায় গিয়ে থাকিলে আর আমাকে কষ্ট ভোগ করিতে হবে না, আর তাহাকে বিবাহ করিয়াছি, জাত যেতে আর বাকি কি আছে? জাত গেল পেট না ভরাই কেন? তবে একাল পর্য্যন্ত তাহার সহিত যে ব্যবহার কোরে এসেচি, তাহাতে যেতেও শঙ্কা হোচ্চে, মুখ দেখাবার তো পথ রাখিনে? তবে সে একটু লেখাপড়া জানে, আর শুনচি সচ্চরিত্রে আছে ; পতিকে কোন মতেই পরিত্যাগ কোত্তে পারবে না। ক্ষেত্রনাথ এইরূপ বিস্তর চিন্তা করিয়া একবার এগিয়ে একবার পেচিয়ে, শেষে রাখালির বাটীতে গিয়ে উপস্থিত হইলেন'।[১]

এর মধ্যে 'শুনিয়া', 'থাকিলে', 'করিল', 'করিতে', 'করিয়াছি', 'হইলেন' প্রভৃতি সাধুরূপের ক্রিয়া এবং বনিতার, তথায়, তাহাকে, তাহাতে, বাটীতে প্রভৃতি সাধুশব্দের ব্যবহার রয়েছে। তুলনামূলকভাবে কথ্যরূপই প্রধান। একে তাই সাধুমিশ্রিত কথ্যগদ্য বলা যেতে পারে।

আবার পাত্রপাত্রীর মুখে সংলাপের ভাষাতেও এই ধরনের মিশ্রণ দেখি। যথা :

'পামর। ইদানীং কি প্রথা হইয়াছে তাহা কিছুই বল্‌তে পারি না, ভদ্রলোকের কাছে গেলেই আগেকার মতন পান তামাক দেয় না। এখন কেবল ব্রাণ্ডি, স্থান বিশেষে কাচের গ্লাস না চল্লে, রূপার গ্লাস বেরোয়, একি সামান্য দুঃখের বিষয়। মদেই আমাদের দেশ ছারখার কল্লে, তা আমি বলেই বা কি করবো? রাজা মনে না কল্লে আর অন্য উপায় নাই। কালেক্‌কে যে কতই হবে তা বলতে পারিনে। নুকোচুরি করেই আমাদের দেশটা হয়রান পেরেসান হয়ে গেল।'[২]

এখানে দে..তে পেলাম, গোটা সংলাপটির ভাষা কথ্য। কেবল গোড়াতে 'ইদানীং কি প্রথা হইয়াছে চাহা কিছুই বলতে পারি না' এই বাক্যাংশটিই সাধু। তাও শেষ ক্রিয়ার প্রয়োগও চলিতে। বাকি সংলাপটির ভাষা কথ্যই।

এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, জুনিয়ার টেকচাঁদ বা চুনিলাল তৎকালীন ভদ্রসমাজে প্রচলিত আদর্শ কথ্যভাষা অনেকটাই ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি যদি বাবু-কলকাতার উন্নতির দিক থেকে তাঁর দৃষ্টিটা সাহিত্যের উন্নতির দিকে ফিরাতে পারতেন, তাহলে বাংলা গদ্যভাষার অনেকখানি উপকার হোত।

১. এক্ষণ, শারদীয় , ৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. ঐ

পঞ্চম অধ্যায়

কথ্য গদ্যের সাহিত্যিক স্বীকৃতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬ জুন, ১৮৩৮–৮ এপ্রিল, ১৮৯৪)

বাংলা সাধুগদ্য দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় দত্তের হাত ঘুরে টেকচাঁদ ঠাকুরে এসে একটা বাঁক নেয়। কথ্য-মিশ্রিত এক অনাড়ম্বর সাধুগদ্য আখ্যান রচনার উপযোগী হতে পারে, সেকথা আগে কারও কল্পনাতেই ছিল না। টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' দেখিয়ে দিল, সাহিত্য সৃষ্টিতে কেবল সাধুরূপই শেষ কথা নয়--কথ্যরূপও আছে তার পরে। 'আলালী' প্রভাব হুতোমপ্যাঁচার মধ্যে দিয়ে মধুসূদন-দীনবন্ধুর গদ্যনাটকে আদর্শ কথ্যের রূপে দেখতে পাই। দেখতে পাই আখ্যান রচনায় বাংলা গদ্য আর পেছনের সারিতে পড়ে রইল না। কিন্তু তাকে স্বাগত জানাতে সঙ্গে সঙ্গে কোন গদ্যশিল্পী এগিয়ে এলেন না। তার উপর 'সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পাঠকেরা বর্বর জ্ঞান করিতেছে।'[১] সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচিয়ে তাকে এমন গৌরবশালিনী করে তুলে বাংলা জাতির কী মহৎ চিরস্থায়ী উপকার করলেন, সে কথা যদি কাউকে বোঝাতে হয়, তবে তার থেকে দুর্ভাগ্য আর কিছুই নেই।[২]

১৮৬৫ সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস লিখেই বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব। কিন্তু সেই প্রথম থেকে বঙ্কিমের উপন্যাস বাঙালি গল্প-পিপাসু পাঠকের মন কেড়ে নিলেন। খুলে গেল বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমের বাতায়ন। উপন্যাস, প্রবন্ধ, রচনা সাহিত্য, সমালোচনা, ধর্মতত্ত্ব, জীবনী প্রভৃতি নানা সৃষ্টিধর্মী রচনা লিখে তিনি সাধুগদ্যের ইতিহাসে নিজের আসন পাকা করে নিলেন।

সেই কালের শ্রেষ্ঠ গদ্য-লেখক হিসেবে তাঁর আরও দুই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ভাবীকালের সাহিত্য ভাবনাকে সঠিক পথে চালনা করতে সক্ষম হয়। তার একটি সমালোচনা, অন্যটি কথ্যভাষার স্বীকৃতি।

হঠাৎ লিখে নাম করার মোহে একশ্রেণীর সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে তখন পাশ্চাত্য সাহিত্যের উচ্ছিষ্ট তথা অশ্লীল বস্তুর আমদানি করছিল। দূরদর্শী বঙ্কিমের কলম তীক্ষ্ণ-ব্যঙ্গ কটাক্ষে তাদের সেই বাসনাকে নিবৃত্ত করে বাংলা সাহিত্যকে আবর্জনামুক্ত করে। সব্যসাচী আখ্যা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই মন্তব্য করেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখছিলেন, আর একদিকে 'ধূম এবং ভস্মরাশি' দূর করবার ভার নিজেই তুলে নেন। 'রচনা' ও 'সমালোচনা'য় আত্মনিয়োগ করেন বলে, বাংলা সাহিত্য এত তাড়াতাড়ি পরিণত হয়ে ওঠে।[৩]

দ্বিতীয়ত, ১৮৭৮ সালে 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে তিনিই প্রথম মার্জিত কথ্যভাষাকে সাহিত্যের বাহন রূপে মেনে নিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, 'সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী।[৪] যুক্তি হিসেবে তিনি টেকচাঁদের

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ দ্রঃ।
২. 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ দ্রঃ।
৩. ঐ।
৪. বিবিধ প্রবন্ধ, 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি।'[১] কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেও ভোলেন নি যে, 'গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে' টেকচাঁদ হুতোমী 'ভাষায় কুলোয় না'।[২] অর্থাৎ আলাল হুতোমী নিস্তেজ বাঁধনহীন দুর্বল অপরিমার্জিত গদ্যরূপকে সঠিক করতে প্রয়োজনে ইংরাজি, ফার্সি, আরবি, দেশি, বিদেশি এমনকি সংস্কৃতবহুল শব্দেরও আশ্রয় নিতে হবে এবং তা নিঃসঙ্কোচে।[৩] অথচ তিনি নিজে কিন্তু যাবতীয় রচনা সাধুগদ্যেই রচনা করেন। আর সাধুগদ্যের লেখকদের মধ্যে শীর্ষস্থান নিয়েই রইলেন।

১৮৭২ সাল থেকে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিম-কেন্দ্রিক এক সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর সূচনা হয়। সেই থেকে রবীন্দ্র-পূর্ব অবধি গদ্যের কাল 'বঙ্কিম-যুগ' বলেই চিহ্নিত। তারপর থেকে রচনারীতি বা স্টাইল-এ বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিকতা ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমের আগে প্রকাশিত আখ্যানমূলক রচনায় পাঠকের কাছে লেখকের ভূমিকা ছিল 'মধ্যস্থের' বা 'কথকের'। বঙ্কিমের উপন্যাসে লেখকের ভূমিকা হল অন্তরঙ্গ সুহৃদের। যেন তেন প্রকারে কাহিনীটা বলতে পারাই উদ্দেশ্য নয়, পাঠকের চিত্তজয় করাই ছিল আসল কথা।[৪] আচার্য সুকুমার সেন তাই বলেছেন, 'ইংরেজি অনুসারে বলিতে গেলে যাহা বিশুদ্ধরীতি বাঙ্গালা ভাষায় তাহাই বঙ্কিম প্রবর্তন করিয়াছেন। বঙ্কিমের ভাষা ভাবের উপযোগী ও অনুগত, ভাষা সাধারণতঃ ভাবকে ছাপাইয়া বিষয়কে ছায়াচ্ছন্ন করে নাই। বিদ্যাসাগরের সুললিত গদ্যভঙ্গিতে নমনীয়তা সরসতা সঞ্চার করিয়া বঙ্কিম সাধু ভাষার গদ্যকে সকল বিষয় ভাব এবং রসের বাহন করিয়া তুলিলেন। লেখার ভাষা এবং মনের কথার মধ্যে ব্যবধান কমিয়া আসিল।'[৫]

কিন্তু বঙ্কিমের সমস্ত কৃতিত্ব সাধুগদ্যকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। তবু আখ্যানমূলক রচনায় তাঁর গ্রন্থে চলিত ব্যবহারে প্যারীচাঁদের 'আলালী' রীতির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। আর সেদিক থেকে তিনি প্যারীচাঁদকে খুব বেশি পেছনে ফেলে দিয়ে এসেছেন, তা ভাবার কোন কারণ নেই।

উপন্যাসের মধ্যেই সংলাপের ব্যবহার বেশি এবং কথ্যরূপও বেশি। চৌদ্দটি উপন্যাসের সবকটিতে কমবেশি চলিত গদ্যের আশ্রয় নেওয়া হয়। তবে আগাগোড়া একভাবে কথ্যরূপ কোন উপন্যাসেই মেলে না। আবার কোন কোন চলিত ক্রিয়ার ব্যবহার বেশি নেই, কিন্তু কথ্য বাক্‌রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটকে ও প্রহসনগুলিতে যে আদর্শ কথ্য রূপের পরিচয় মেলে, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের মধ্যে সে জায়গায় আলালী রূপকেই বেশি পছন্দ করেছেন দেখতে পাই।

কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে উপন্যাসে বঙ্কিমের কথ্য ব্যবহারের স্বরূপটা আলোচনা করা যেতে পারে। যথা :

১. বিবিধ প্রবন্ধ, 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
২. ঐ
৩. ঐ।
৪. ঐ।
৫. ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৮৮ পৃঃ।

আ। সাধ করিয়া কি তোমায় রসিকরাজ বলেছি?

দি। সুন্দরি! তুমি বইস, আমি হস্ত প্রক্ষালন করি।

আশমানি মনে মনে কহিল, "আলপ্পেয়ে! তুমি হাত ধোবে? আমি তোমাকে ওই এঁটো আবার খাওয়াবো।" প্রকাশ্যে কহিল, "সে কি, হাত ধোও যে, ভাত খাবে না?" গজপতি কহিলেন, "সে কি কথা, ভোজন করিয়া উঠিয়াছি, আবার ভাত খাব কিরূপে?"

(দুর্গেশনন্দিনী)

প্র। ওলো, তুই বসিয়া কেলো?

উ। গিরিজায়া লো।

প্র। এখানে কেন লো?

উ। মৃণালিনীর জন্য লো।

প্র। মৃণালিনী তোর কে?

উ। কেউ না।

প্র। তবে তার জন্যে তোর এত মাথা ব্যথা কেন?

উ। আমার আর কাজ কি? বেড়াইয়া বেড়াইয়া কি করিব।

প্র। মৃণালিনীর জন্যে এখানে কেন?

উ। এখানে তার একটি শিকলীকাটা পাখী আছে।

প্র। পাখী ধরিয়া নিয়ে যাবি নাকি?

(মৃণালিনী)

গৃহিণী। কোথায় পেলে?

বধূ। মাসীমা দিয়েছেন।

গৃ। বামন না কায়েৎ?

ব। কায়েৎ।

গৃ। আঃ, তোমার মাসীমার পোড়াকপাল। কায়েতের মেয়ে নিয়ে কি হবে? একদিন বামনকে ভাত দিতে হলে কি দিব?

ব। রোজ ত আর বামনকে ভাত দিতে হবে না—যে কয় দিন চলে চলুক—তার পর বামনী পেলে রাখা যাবে—তা বামনের মেয়ের ঠ্যাকার বড়—আমরা তাঁদের রান্নাঘরে গেলে হাঁড়িকুড়ি ফেলিয়া দেন—আবার পাতের প্রসাদ দিতে আসেন! কেন, আমরা কি মুচি?

(ইন্দিরা)

শান্তি মনে মনে ভাবিতেছিল যে, "তোমার বাপের শ্রাদ্ধের চাল যদি আমি না চড়াই, তবে আমার রসকলি কাটাই বৃথা। কতক্ষণে শেয়ালে তোমার মুণ্ড খাবে আমি দেখবো।" প্রকাশ্যে বলিল, "তা সাহেব, হতে পারে, আজ বেরিয়ে গেলে যেতে পারে। অত খবর আমি জানি না, বৈষ্ণবী মানুষ, গান গেয়ে ভিক্ষা-শিক্ষা করে খাই, অত খবর রাখিনে। বকে বকে গলা শুকিয়ে উঠ্‌লো, পয়সাটা সিকিটে দাও—উঠে চলে যাই। আর ভাল করে বখ্‌শিস দাও তো না হয় পরশু এসে বলে যাব।"

(আনন্দমঠ)

এইসব দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যে একেবারে শুরু থেকে শেষপর্ব পর্যন্ত চারটে উপন্যাসের চারটে কথ্যগদ্যের উদ্ধৃতি আছে। চলিতরূপ মোটামুটি স্বাভাবিক রূপে ব্যবহৃত হতে দেখা

যাচ্ছে। কোন কোন উদ্ধৃতির মধ্যে এক-আধটা সাধু ক্রিয়ার প্রয়োগ রয়েছে সত্যি, তবু তার মধ্যে দিয়ে কথ্যরূপটি চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

অথচ আশ্চর্য হই এই ভেবে যে, এত সুন্দর কথ্যগদ্যের প্রয়োগ দেখিয়েছেন যিনি, তিনি কি করে [illegible] কথ্য ব্যবহারে সংযম রক্ষা করে চলতে পারেন নি। এইসব উদ্ধৃতিগুলির খাঁটি চলিতের [illegible] সাধুক্রিয়ার সাহায্য নিয়েছেন। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে [illegible] সাধু ও চলিতক্রিয়ার [illegible] মত [illegible] প্রয়োগ না করে পারে না। যথা :

হীরের আয়ি [illegible] হয়েছে, তাই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, সে একটু কেষ্টরস দিয়েছে [illegible] কি ইষ্টিরস ভাল হয়।"

প্রতিবাসিনী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "তা হলেও বা। কেষ্টই ত সকলের ইষ্টি। তা তাঁর অনুগ্রহে ইষ্টিরস ভাল হইতে পারে। আচ্ছা, হীরার আয়ি, তোর নাতিনীর এত রস হয়েছে কোথা থেকে?" হীরার আয়ি অনেক ভাবিয়া বলিল, "বয়সদোষে অমন হয়।"

(বিষবৃক্ষ)

এই ধরনের সাধুমিশ্রিত চলিতরীতি 'আলালের ঘরের দুলালে' প্রথম টেকচাঁদ ব্যবহার করেন। বঙ্কিমচন্দ্র সবকটি উপন্যাসে এই রূপটিকে বেশি পছন্দ করেছেন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের দৃষ্টান্তের মধ্যে আমরা তার প্রমাণ পাই।

তাঁর শেষ দিককার উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী' থেকে পাশাপাশি দুটো উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা কথ্য-ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্রের অমনোযোগী মানসিকতার পরিচয় নিতে পারি। যেমন :

"ব্রহ্ম। আর তোর বড়াইয়ে কাজ নাই। মুখে অমন অনেকে বলে! শেষে এই নিমগাছের তলায় আমায় গঙ্গায় দিবি—তুলসী গাছটাও দেখতে পাব না। তা তুই ভাব না যা হয়—কিন্তু তুই আমার গঙ্গা ভেবে ভেবে এত রোগা হয়ে গেলি কেন?

ব্রজ। ওটা কি কম ভাবনা?

ব্রহ্ম। কাল নাইতে গিয়ে রানায় বসে কি, ভাই, ভাব্‌ছিলি? চো'খ দিয়ে জল পড়ছিল কেন?

ব্রজ। ভাব্‌ছিলাম যে, স্নান করেই তোমার রান্না খেতে হবে। সেই দুঃখে চোখে জল এসেছিল।

ব্রহ্ম। সাগর এসে রেঁধে দিবে? তা হলে খেতে পারবি ত?

ব্রজ। কেন, সাগর ত রোজ রাঁধিত, খেলা-ঘরে যাও নি কোনও দিন? ধূলো-চড়চড়ি, কাদার সুক্তো, ইটের ঘণ্ট—একদিন আপনি খেয়ে দেখ না? তার পরে আমায় খেতে ব'লো?"

এখানে 'দেবে' না লিখে 'দিবে' ও 'রাঁধত' জায়গায় 'রাধিত' করা হয়—বাকি ক্রিয়ার ব্যবহারে সঠিক কথ্যই দেখি। ভাষার রূপেও মার্জিত কথ্যের এত সুন্দর প্রয়োগ মধুসূদন-দীনবন্ধুর নাটকীয় গদ্যসংলাপের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সেই 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের মধ্যেই আবার দেখি, সাধু-চলিতের এলোমেলো মিশ্রিত রূপ [illegible]

ব্রজেশ্বরকে হরবল্লভ বলিলেন, "বাপু হে, তুমি যে এখানে কি প্রকারে আসিলে, আমি ত তা এখনও কিছু বুঝিতে পারি নাই। তা যাক্—সে এখনকার কথা নয়, সে কথা পরে

হবে। এক্ষণে আমি একটু অনুরোধে পড়েছি--তা অনুরোধটা রাখিতে হইবে। এই ঠাকুরাণীটি সৎ কুলীনের মেয়ে--ওঁর বাপ আমাদেরই পালটি--তা ওঁর একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে--পাত্র পাওয়া যায় না--কুল যায়। তা কুলীনের কুলরক্ষা কুলীনেরই কাজ--মুটে মজুরের ত কাজ নয়। আর তুমিও পুনর্বার সংসার কর, সেটাও আমার ইচ্ছা বটে, তোমার গর্ভধারিণীরও ইচ্ছা বটে। বিশেষ বড়বৌমাটির পরলোকের পর থেকে আমরা কিছু এ বিষয়ে কাতর আছি। তাই বলছিলাম, যখন অনুরোধে পড়া গেছে, তখন এ কর্তব্যই হয়েছে। আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এঁর ভগিনীকে বিবাহ কর।'

(দেবী চৌধুরাণী)

দেখতে পাচ্ছি 'আসিলে', 'বুঝিতে' 'রাখিতে হইবে', 'করিতেছি' সাধুক্রিয়ার সঙ্গে 'পড়েছি', 'বলছিলাম', 'হয়েছে' ইত্যাদি চলিত ক্রিয়ারও প্রয়োগ করা হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে সাধুগদ্যের ব্যবহারে যিনি যথার্থ সার্থক গদ্যশিল্পী, সাধুগদ্যে যাঁর কলম দিয়েই প্রথম রীতি বা স্টাইলের সূচনা হয়েছে[১]--সেই কলম দিয়ে কি করে সাধু চলিতে মাখামাখি এই রকম এলোমেলো গদ্যরূপ বেরোয়, ভেবে পাই না! 'দেবী চৌধুরাণীর' এই দৃষ্টান্তটির মধ্যে 'ওঁর বাপ আমাদের পালটি', 'পাত্র পাওয়া যায় না--কুল যায়', 'কুলীনের কুলরক্ষা, কুলীনেরই কাজ মুটে মজুরের ত কাজ নয়'' ইত্যাদি কথ্য বাক্‌রীতির সুপ্রয়োগে আমরা মুগ্ধ হই। আবার 'আমি ত তা এখনও কিছু বুঝিতে পারি নাই', 'বিশেষ বড় বৌমাটির পরলোকের পর থেকে আমরা কিছু এ বিষয়ে কাতর আছি,' 'যখন অনুরোধে পড়া গেছে, তখন এ কর্তব্যই হয়েছে', তখন সাধুচলিতে মেশানো এই ধরনের উক্তি শুনতে আমরা অভ্যস্ত নই। বরং পুরোপুরি সাধুতে লিখলে ভাল লাগত। এই রকম, লেখকের গোড়ার দিককার উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'য় দেখি।

'ক। দিনে তুলিলে কেন হয় না?

শ্যা। দিনে তুলিলে ফল্‌বে কেন? ঠিক দুই প্রহর রাত্রে এলোচুলে তুলিতে হয়। তা ভাই মনের সাধ মনেই রহিল।'

কপালকুণ্ডলার উক্তি সাধুতে ঠিকই আছে, কিন্তু শ্যামার উক্তির মধ্যে দিয়ে সাধু-চলিতে মেশানো কৃত্রিম সংলাপ পাই। আমরা সে ভাষায় কথাবার্তা বলি না। মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধুর নাটকীয় মার্জিত কথ্যের পরে বঙ্কিমের মিশ্রিত-কথ্য আমাদের হতাশ করে।

অনেক জায়গায় আবার শব্দের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে--যাকে সাধু বা চলিত কোন বিভাগেই ফেলা যাবে না। যথা :

' "গায়িতেছি" বলিয়া বিমলা পুনর্বার সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।' (দুর্গেশনন্দিনী), 'নগেন্দ্র হুকুম দিলেন, "সব হাঁকায় দাও।" ' (বিষবৃক্ষ), সান্ত্রী বলিল, 'হুকুম দেওয়াও।' (চন্দ্রশেখর)।

এই যে 'গায়িতেছি' (= গাইছি, গাহিতেছি), হাঁকায় (= হাঁকিয়ে, হাঁকাইয়া), দেওয়াও (= দিয়ে আন, দেওয়া করাও) [বীরভুম] শব্দগুলি কানে বাজে।

'রজনী' উপন্যাসে যখন দেখি--

"রাজচন্দ্র বলিল, 'একটু গা ঢাকা হইয়াছিলাম।'' তখন তো 'দিয়াছিলাম' ক্রিয়ার পরিবর্তে 'হইয়াছিলাম' লেখার কোন যুক্তি খুঁজে পাই না।

১. আচার্য সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাই লৈখিক ও মৌখিক ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ লক্ষ্য করেছেন।[১] যেমন : সম্ভবে, উছলিতেছে, ভ্রমিতেছিলেন, শোভিতেছিল ইত্যাদি। তাছাড়া, খেতেছে, করতেছে, হলেম ইত্যাদি আঞ্চলিক ভাষার ক্রিয়া ও মোহিয়াছে, শোভিতে লাগিল প্রভৃতি কাব্যসুলভ নামধাতুর অল্পস্বল্প প্রয়োগের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ছাড়া প্রবন্ধের মধ্যে চলিত ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই, কেন না সাধুগদ্যেই তিনি তাঁর সমস্ত প্রবন্ধ ও আলোচনা রচনা করেন। তবে তার মধ্যে 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' গ্রন্থের কোন কোন স্থানে সংলাপের ব্যবহার পাই। সেসব জায়গায় কোন কোন সংলাপের ভাষায় উপন্যাসের মতন কথ্য বা মিশ্রিত গদ্যের প্রয়োগ আছে। এর মধ্যে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর মধ্যেই চলিত ব্যবহার বেশি। বলা বাহুল্য, সে কথ্যরূপও কতক মার্জিত কতক বা সাধু-ঘেঁষা বা মিশ্রিত। একটা দৃষ্টান্ত দিলে তার প্রমাণ পেতে পারি। যথা :

'কুসুম বলিল, "ওঠ না—কি কচ্চো?"

আমি বলিলাম, "দূর পাগলি, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম।"

কুসুম ঘেঁষে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার বিয়ে কাকা?"

আমি বলিলাম, "ফুলের বিয়ে।"

"ওঃ পোড়া কপাল, ফুলের? আমি বলি কি! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়েছি।"

"কই?"

"এই যে মালা গাঁথিয়াছি।" দেখিলাম, সেই মালায় আমার বর-কন্যা রহিয়াছে।'

(নবম সংখ্যা, ফুলের বিবাহ)

২.

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)

বঙ্কিম-যুগের অন্যতম গদ্যলেখক রমেশচন্দ্রের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। মধুসূদন দত্তের মত তিনিও প্রথমে ইংরিজি ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা শুরু করেন, পরে 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রকাশকালে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে বাংলা গদ্য রচনায় হাত দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধ ও ধারণা পরবর্তীকালে সফল হয়।[৩] বাংলা গদ্য সাহিত্যে রমেশচন্দ্রের কৃতকার্যতা লাভ ঘটেছিল যথেষ্ট।[৪]

বাংলা সাহিত্যে তাঁর কৃতিত্ব উপন্যাস রচনায়, আলোচনায়, হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ এবং ধর্মীয় আলোচনায়। উপন্যাসের সংখ্যা ছয়, এর মধ্যে চারটি ঐতিহাসিক ও ইতিহাস আশ্রিত রোমাণ্টিক—'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবীকঙ্কণ" (১৮৭৭), 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৮), 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' (১৮৭৯); আর দুটি সামাজিক উপন্যাস—'সংসার'

১. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা, দ্রষ্টব্য।
২. ঐ, ২০৪-২০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
৩. নব্যভারত, বৈশাখ, ১৩০০ সন দ্রঃ।
৪. ড. মনোমোহন ঘোষ, বাংলা গদ্যের চারযুগ, ২০৪ পৃঃ দ্রঃ।

(১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪)। এর মধ্যে প্রথম চারটির ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র মোটামুটি বঙ্কিমচন্দ্রকেই অনুসরণ করেন। এগুলোর রচনারীতিও বঙ্কিমী। যুক্তব্যঞ্জন ও তৎসমশব্দবহুল সাধুগদ্যই এই চারটি উপন্যাসের ভাষারীতি। পাত্র পাত্রীদের নামগুলোও বঙ্কিমের উপন্যাস থেকে ধার করা (নবকুমার, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী, প্রতাপ ইত্যাদি)। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের 'স্টাইলে' রমেশচন্দ্র উপন্যাসের মাঝে 'পাঠককে' উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখেন।

সামাজিক উপন্যাসের বেলায় রমেশচন্দ্র স্বকীয়তার পরিচয় দেন। সেখানে বঙ্কিমের পথ থেকে সরে আসতেই সচেষ্ট ছিলেন। প্রথমত, সামাজিক উপন্যাসে বিধবা বিবাহের সমর্থন আছে।[১] সেদিক থেকে বঙ্কিমের চেয়ে বিদ্যাসাগরকেই লেখক সঠিক বলে মনে করেন।

দ্বিতীয়ত, উপন্যাসে পল্লীবাসীর দুঃখকষ্ট তথা জীবন সংগ্রামের দিক দিয়ে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতার' পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয়ত, সামাজিক উপন্যাসে কথ্যরূপ ব্যবহারের দিক থেকে প্যারীচাঁদ ও দীনবন্ধুকেই রমেশচন্দ্র অনুসরণ করেন।

কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা তাঁর গদ্যভাষা ব্যবহারের পরিচয় নিতে পারি। যেমন, 'তারিণী। প্রত্যাশা আবার কি বল--আমরা বুড়ো সুড়ো লোক, তোমরা কলেজের ছেলে, তোমাদের সব কথা একটু ভেঙ্গে না বললে কি বুঝে উঠতে পারি? বিন্দু আমার ঘরের ছেলে, আমার উমা যে, বিন্দুও সে, যতদিন আমার ঘরে এক কুনকে চাল আছে, ততদিন বিন্দু ও উমা তা সমান ভাগ করে খাবে। তাতে আবার জমির অংশই কি, প্রত্যাশাই কি?'

(সংসার)

তদ্ভব শব্দ প্রধান কথ্যভাষা। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই ভাষাতেই কথাবার্তা চলে। সর্বজনীন চলিত রূপে এটা গৃহীত হয়েছে।

আবার এর পাশে পাশে নিম্নশ্রেণীর মানুষের মুখের ভাষারূপও এতে পাচ্ছি। যথা, 'সনাতনের পত্নী। না কিছু নয় দিদি, মনে করনু আজ সকালে তোমাদের দেখে যাই, আর সুধাদিদি চিনিপাতা দৈ বড় ভালবাসে। তাই কাল রেতে দৈ পেতে রেখেছিনু, সুধাদিদির জন্যে এনেছি। সুধাদিদি উঠেছে?'

(সংসার)

এখানে 'করনু', 'রেতে', 'রেখেছিনু' এবং এই রকম--'জেতে', 'নোকটা', 'খেংরা' প্রভৃতি শব্দগুলো আঞ্চলিক বা গ্রাম্য উপভাষা থেকে এসেছে। দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকে নিম্নশ্রেণীর পাত্রপাত্রীদের মুখে এই ধরনের শব্দযুক্ত সংলাপ দিয়ে চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তোলেন। রমেশচন্দ্র সরকারি উচ্চপদে এই শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। অন্যদিকে দীনবন্ধুর সাড়া জাগানো নাটকের পরোক্ষ প্রেরণা থাকা অসম্ভব নয়।

আবার এই উপন্যাসে লেখক শিক্ষিতদের মুখে সাধুগদ্য দিয়েছেন। তাতেও 'নীলদর্পণের' প্রেরণার কথা আসে। যথা, 'নবীন। আমারও বিশ্বাস আমরা ক্রমে উন্নতিলাভ করিতেছি, কিন্তু সে উন্নতি কত আস্তে আস্তে হইতেছে। রাজনীতির কথা ছাড়িয়া দিন, সমাজের কথা ধরুন। আমরা মুখে বা পুস্তকে কত বাদানুবাদ করি, কার্য্যে একটী সামাজিক উন্নতি লাভ করিতে কত বিলম্ব হয়, পঞ্চাশ বৎসর আলোচনা ও বাগাড়ম্বরের পর একটী কুরীতি উঠে

১. এদিক থেকে 'সংসার' বঙ্কিমের বিষবৃক্ষের প্রতিবাদ। দ্রঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়, ২৪৭ পৃঃ।

না, একটী সামাজিক সুরীতি স্থাপন হয় না।'

তৎসম শব্দপ্রধান সাধুগদ্য। সচরাচর কথাবার্তার সময় এই ভাষা আমরা ব্যবহার করি না। 'কিন্তু কথাসাহিত্যে এগুলো চলে এসেছে। নাটকের ক্ষেত্রেও এই রীতি অচল। 'নীলদর্পণের' সজীব সংলাপের পাশে উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলোর মুখে সাধুরূপের সংলাপ বড় বেখাপ্পা ঠেকে। রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস দুটি সেই দোষে দুষ্ট।

আবার, আরও কানে বাজে, একই চরিত্রের মুখ দিয়ে কোন এক বক্তব্যের শুরুটা কথ্য বা চলিতে, শেষটা সাধুরূপে দেখে। রমেশচন্দ্রের 'সমাজ' উপন্যাস থেকে এমন একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা তার প্রমাণ নিতে পারি। যথা :

'ফুলকুমারী। সত্য নয় ত কি? আর যোগমায়াদিদি, সন্ন্যাসী ঠাকুরের জন্য বাতাসা ভিজিয়ে রাখেন, পানফল ছাড়িয়ে রাখেন—তুই দেখছিস কি? সন্ন্যাসীর ঘরের লক্ষ্মী হয়েছেন, কবে মালা বদল করিয়া গেরুয়া বসন পরিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়া বাহির হয় দেখ।'

এই অংশের মধ্যে 'করিয়া', 'পরিয়া', 'হইয়া', 'বাহির' শব্দগুলি সাধুগদ্যের। আসলে, পদ্যের মত গদ্যেও এইকালে সাধু-চলিত রূপ ব্যবহারে কোন বিধি নিষেধ ছিল না। তাই ওই দুই ভাষারীতির আনাগোনা অনেকের রচনাতেই চোখে পড়ে। রমেশচন্দ্র বা তারকনাথ তাঁদের ব্যতিক্রম নন।

৩.

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)

বঙ্কিম-সমকালীন বাংলা সাহিত্যে তথা সামাজিক উপন্যাস সৃষ্টিতে স্বকীয়তায় নিজেকে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। উপন্যাস রচনার দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি সোনার প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তারকনাথ তবে মাটির প্রদীপের সঙ্গেই তুলনীয়। উঠোনের মাঝখানে তুলসীতলায় রেড়ির তেলের ক্ষীণ আলোয় মাটির প্রদীপ আমাদের মন ভরায়। আর রাজ-রাজড়ার সভাগৃহে অথবা দেবদেউলের পাষাণ প্রতিমার সামনে সোনার প্রদীপ সবার চোখ ঝলসিয়ে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস উচ্চকোটির মানুষের বর্ণাঢ্য অতীত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত। সেখানে সমাজের নীচুতলার অতি সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের পদার্পণ প্রায় অসম্ভব ছিল।

তারকনাথের উপন্যাসে আমরা সাধারণ বাঙালির প্রতিদিনের তিক্তকর জীবনের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই। তাঁর উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের সংখ্যা চার। এর মধ্যে তিনটি উপনাস। গল্পগ্রন্থের মধ্যেকার গল্প সংখ্যাও তিন। তবে রচনাগুলোর মধ্যে 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) উপন্যাসের লেখকরূপেই তাঁর পরিচিতি।

'স্বর্ণলতা'র ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজন-বৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড কর্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙ্গালীর কাহিনী' কেউ লেখেনি। 'ছোট বড় সুখ দুঃখের জালবোনা দিনরজনীর পরিচিত সংসারে অতি সাধারণ নরনারীকে অহরহ যে কঠিন নিষ্ঠুরতার ও রূঢ়তার সম্মুখীন হইতে হয় তাহারই একটি নগণ্য কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়।' 'পুরোপুরি বাস্তব-দৃষ্টি নিয়ে উপন্যাস রচনা বাংলায় এই প্রথম।'[১]

---

১. ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (২য়) ৪১৭পৃঃ।

দুই ভাইয়ের যৌথ-পরিবার। তাদের দু-বউ আপন ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখেই ছিল। বড় ভায়ের আয়ে সংসার চলে। ছোট ভাই কোন কাজ করে না। নানা অকাজেই দিন কাটায়। বড় বউয়ের পছন্দ নয় তার স্বামীর আয়ে আর কেউ ভাগ বসায়। তারই হিংসার আগুন যৌথ সংসারটিকে দু-টুকরো করে দিলে। তারপর ছোট ভাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হল। অভাব অনটনে সাত-ঘাটের জল খেয়ে শেষে দুটো পয়সার মুখ দেখে। তারপর অনেক মূল্য দিয়ে আবার দুভায়ের মিলন হয়।

এই সহজ অনাড়ম্বর জীবনচিত্রকে লেখক অত্যন্ত সরল-আটপৌরে গদ্যে পরিবেশন করেন। বঙ্কিমী-গদ্যের কারিকুরি এখানে নেই। কিন্তু সামাজিক উপন্যাসের উপযুক্ত সাধারণ ভাষারূপ 'স্বর্ণলতার' অন্যতম আকর্ষণ। বর্ণনীয় বিষয় সাধুগদ্যের, কিন্তু সংলাপের ভাষা ঝর ঝরে কথ্যরূপের। পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাসে কথ্যব্যবহারের এই আদর্শ অনেকেই গ্রহণ করেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা লেখকের গদ্যভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হতে পারি। যথা :

'নীলকমল অবিলম্বে বেহালাটি খুলিয়া দুই চারিবার তার কাণ মোড়া দিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। মাথা এমনি দুলিতে লাগিল যে, বিধুর বোধ হইতে লাগিল নীলকমলের মৃগী রোগ উপস্থিত হইল, চক্ষু ঘুরিতে লাগিল, এবং সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।'

(স্বর্ণলতা)

অনাড়ম্বর সাধুগদ্য। বড় বড় শব্দের বদলে তদ্ভব শব্দ দিয়ে সাজানো এই গদ্য, যা নাকি সেইকালে বঙ্কিমের উপন্যাসে পাই না। আবার সংলাপের ভাষারূপের পরিচয় করি এখন ঃ

'নীলকমল তদবধি লেখাপড়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিল। "লেখা কি?" নীলকমল কহিত, "কলম দিয়া আকার (অক্ষর) বের করা, আর বাজনা—কাঠের ভেতর থেকে কথা বের করা। লেখা ইচ্ছে কল্লে সকলেই শিখতে পারে, কিন্তু বাজনা শিখতে মা সরস্বতীর বিশেষ করুণা চাই।"'

খাঁটি মুখের ভাষার নিদর্শন। এই ভাষারূপ বঙ্কিমেও মেলে না। এই রূপটাই সর্বজনীন চলিত ভাষায় গৃহীত হয়েছে। আর একটি দৃষ্টান্তে দেখি মুখের ভাষার অবিকৃত আদর্শ। যথা :

'পরে পাণ্ডার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "বন্দোবস্তের কথা বলেছো?"

পাণ্ডা কহিল, "হ্যাঁ।"

অধিকারী। তাতেই স্বীকার?

পাণ্ডা। তাতেই।

অধিকারী। তবে কবে থেকে মিশবেন?

বিধু। যবে থেকে বলেন।

অধিকারী। তবে আজ।

বিধু। আচ্ছা তাই।' (স্বর্ণলতা)

উপরোক্ত অংশের কথ্যরূপের মধ্যে মধুসূদন-দীনবন্ধুর নাটকীয় কথ্যগদ্যের সংলাপ প্রয়োগের কথা মনে করায়। সরল আটপৌরে কথ্যরূপ উপন্যাসের আদর্শ হয়েছে। তবে তারকনাথ উপন্যাসে আগাগোড়া একই রূপ বজায় রাখতে পারেন নি। অনেক ক্ষেত্রে সাধুরূপের সঙ্গে কথ্যরূপ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সেটুকু বাদ দিয়ে বলা যায়, বিষয়ের উপযোগী সরল প্রাঞ্জল গদ্য[১] উপন্যাসে 'স্বর্ণলতার' আগে আর কেউ লেখেন নি।

১. ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়, ২৪২ পৃঃ দ্রঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নাটকীয় গদ্য

মধুসূদন দত্ত (২৫ জানুয়ারি, ১৮২৪–২৯ জুন, ১৮৭৩)

বাংলা গদ্যের কয়েকজন খ্যাতনামা লেখক প্রত্যক্ষভাবে প্যারীচাঁদের গদ্যরীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে দুজন হলেন নাট্যকার মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র। ১৮৫৯ সালে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে মধুসূদন আদর্শ কথ্য গদ্যরূপ প্রথম প্রয়োগ করলেন, তখনও 'হুতোমের' আবির্ভাব ঘটেনি।

• প্যারীচাঁদ সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য নষ্ট করে বাংলা ভাষাকে স্বকীয়তা বিকাশে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, সেকালে সেটা কম কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। বিদ্যালঙ্কার থেকে একেবারে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত সংস্কৃত-ঘেঁষা সাধুগদ্যের প্রবাহ প্যারীচাঁদের চেষ্টায় ধীর ভাবে নিজের স্বাভাবিক গতিপথ থেকে অবাঞ্ছনীয় রীতির শৈবালদাম অপসারিত হতে দেখা গেল। বলা বাহুল্য, তিনি যে সেই প্রথমেই আদর্শ কথ্যভাষার সন্ধান দিয়েছেন, তা নয়। তবু তাঁর প্রবর্তিত গদ্যে উপভাষার প্রয়োগের দ্বারা বাংলা গদ্য তিনশ বছরের অর্থাৎ ১৫৫৫ সালের রাজকীয় পত্র-ভাষার স্বচ্ছন্দতা ফিরে পেল।[১] আর প্যারীচাঁদের বন্ধু মধুসূদন দূরদর্শী ক্ষমতার জোরে অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষিত সমাজের মুখের ভাষায় ভাবীকালের বাংলা সাহিত্য রচিত হবে। আর সেই কথ্যগদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ তৎসম শব্দ স্থান পাবে। শিক্ষিত মনোভাব প্রকাশের জন্যে গালভরা শব্দ ব্যবহার করে কথ্যরূপকে কিছু কৃত্রিম করে তুলবে। আজ মধুসূদনের ধারণা সত্যে পরিণত হয়েছে। সাধুগদ্যের কালে তিনি তাঁর সবকটা নাটকে তৎসম শব্দবহুল একরকম গম্ভীর কথ্যরূপের প্রয়োগ দেখিয়ে ভাবীকালের কথ্যগদ্যের একটা কাঠামো রচনা করে দিলেন।

প্রথমত, নাট্যকার মধুসূদন যখন বাংলা নাটকে আসেন, তখন বাংলা নাটকের হাঁটি-হাঁটি পা-পার যুগ। সে সময়ে নাট্যকারদের সামনে হয় শেক্সপীয়রের নাটকের আদর্শ, না হয় সংস্কৃত নাটকের আদর্শই ছিল। তাই তাঁদের কাছে মঞ্চের চাহিদা মেটাতে তাড়াতাড়ি অনুবাদের, না হয় অন্ধ অনুসরণের পথ নিতে হয়। ১৮৫২ সাল থেকে ১৮৫৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত নাটুকে রামনারায়ণ অবধি বাংলা নাটকের এই ইতিহাস আমাদের জানা। এই পটভূমিকায় বিদেশি আঙ্গিক অনুসরণ করে প্রথম মৌলিক নাটক লিখে এগিয়ে এলেন মধুসূদন দত্ত।

কিন্তু ভাবগত দিক থেকে পাশ্চাত্য আঙ্গিকে মধুসূদনের নাটক উতরিয়ে গেলেও সংলাপ রচনায় তিনি কথ্য গদ্য ব্যবহারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েও পুরোপুরি কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন এমন দাবি করা যায় না। তার কারণ, তাঁর প্রদর্শিত কথ্যগদ্য আর যেখানেই ব্যবহৃত হোক, নাটকীয় সংলাপের পক্ষে উপযুক্ত নয়। ১৮৫৯ খৃঃ রচিত 'শর্মিষ্ঠা নাটক' থেকে শুরু করে ১৮৭৪ খৃঃ রচিত 'হেক্টর বধ' ও 'মায়াকানন' নাটক পর্যন্ত সবকটা নাটক ও প্রহসনে সংস্কৃত আদর্শের অনুসরণে সাধু-ঘেঁষা চলিত গদ্য ব্যবহার করেছেন। বড় বড় সমাসবদ্ধ শব্দ, সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের প্রয়োগে সে চলিত বেশ গম্ভীর ও কৃত্রিম। পববর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক ছাড়া আর কোন নাটকে সে কথ্যগদ্য গৃহীত হয়নি। মধুসূদনের নাটক

---

১. অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, ১৩৮-১৩৯ পৃঃ দ্রঃ।

থেকে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা তাঁর চলিত রীতির পরিচয় নিতে পারি। যথা :

'রাজা। আর ভাই বলবো কি? যেমন কোন পোতবণিক ঘোরতর অন্ধকারময় বিভাবরীতে ভয়ানক সমুদ্র মধ্যে পথ হারালে, ব্যাকুলচিত্তে কোন দিগুনির্ণায়ক সহায় বিবেচনায় মুহুর্মুহুঃ দৃষ্টিপাত করে, আমি সেইরূপ এই অপার বিপদ-সাগরে পতিত হয়ে পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে একমাত্র ভরসাজ্ঞানে সর্বদা মানসে ধ্যান কর্চি! হে জগৎপিতঃ, এ বিপদে আমাকে রক্ষা করুন।'

(শর্মিষ্ঠা নাটক)

দেখতে পাচ্ছি, উপরোক্ত দৃষ্টান্তের ভাষায় চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু শব্দ প্রয়োগে তদ্ভব শব্দ প্রায় নেই বল্লেই চলে। তার উপর পোতবণিক, বিভাবরী, ব্যাকুলচিত্ত, দিগুনির্ণায়ক, মুহুর্মুহু, দৃষ্টিপাত, বিপদ-সাগর, পরম কারুণিক, পরমেশ্বর, জগৎপিতঃ প্রভৃতি সমাসবদ্ধ বড় বড় শব্দের গুরুভারে এই জাতীয় কথ্য গদ্য-সংলাপ নাটকের পক্ষে ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। ক্রিয়াপদগুলো ছাড়া সবই সাধুগদ্যের গতানুগতিক রীতির অনুসারী।

কিন্তু নাটকীয় সংলাপ রচনায় এই জাতীয় কৃত্রিম চলিত গদ্য যে চলতে পারে না, মধুসূদনের নাট্যকার-মানসিকতায় তা ধরা পড়েনি। আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় তাই মন্তব্য করেছেন, 'ক্রিয়াপদগুলিতে কথ্যরূপ থাকিলেও তৎসম শব্দের বাহুল্য এবং সংস্কৃতরীতির বাক্‌ভঙ্গি নাটকের ভাষাকে শ্লথ ও বন্ধুর করিয়াছে।'[১]

আচার্য সেনের এই মন্তব্যের পক্ষে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক থেকে আরও দেখানো যায় কূজনধ্বনি, চক্রবাকবধু, বৎসাবলোকনে, কুসুমসুকুমারি, মলয়মারুত, বিজনক্রিয়ায়, চিত্তবিকার -শূন্য, অমৃতবর্ষিণী, ক্ষত্রকুলজাত, বেদবিদ্যাবলে আদেশানুসারে অট্টালিকাসন্দর্শনে, কুলালচক্র, প্রতিষ্ঠানগরীতে ইত্যাদি শব্দের যত্রতত্র ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

অথচ নাটক হচ্ছে দৃশ্যকাব্য। তাই তার সংলাপ হবে যথাযথ ও স্বাভাবিক।[২] মধুসূদন প্রাথমিক পর্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হয়েও, সংলাপ রচনায় তিনি প্রাচীনপন্থী থেকে গেছেন। এমন কি বাংলা নাটকের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকেও (১৮৬১) সেই দোষ দেখতে পাই। তবে অনেক কম ও তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ আগের চেয়ে বেশি। যথা :

'অহ। (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) বাছা, তুমি কি এত দিনের পর তোমার এ দুঃখিনী মাকে ছেড়ে চললে? আমার আর কে আছে, মা, যে আমাকে এমন করে মা বলে ডাকবে? (রোদন)

কৃষ্ণা। সে কি মা? তোমাকে ছেড়ে আমি কার কাছে যাব মা? (রোদন)।

রাজা। ভগবতি, মোহস্বরূপ কুসুমের কণ্টক কি সামান্য তীক্ষ্ণ!'

(কৃষ্ণকুমারী নাটক)

দেখা যাচ্ছে, এখানে অহল্যাদেবী ও কৃষ্ণার মুখে কথ্যসংলাপ বেশ সহজ-সরল। কিন্তু রাজার মুখে সাধুঘেঁষা কৃত্রিম চলিতের প্রয়োগ করা হয়। তবে ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসের রসসঞ্চারের জন্য এই ধরনের সংলাপকে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু যখন দেখি :

'ভৃত্য। ধর্মাবতার, মরুদেশের ঈশ্বর রাজা মানসিংহ রায় রাজসম্মুখে দূত প্রেরণ

---

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়, ৭০ পৃষ্ঠা দ্রঃ।

২. ড. অজিতকুমার ঘোষ, নাটকের কথা দ্রঃ।

করেছেন।' তখন, সেই কথ্যগদ্যকে কোন মতেই ভৃত্যের উপযুক্ত বলে মনে হয় না। অথচ সেই নাটকেই কোন কোন পাত্রপাত্রীর মুখে এমন সহজ অনাড়ম্বর চলিত গদ্য-সংলাপ বসিয়েছেন, দেখে বিস্মিত হতে হয়। ধনদাস, বিলাসবতী, মদনিকা প্রভৃতি পাত্র পাত্রীর মুখে নাট্যকার মধুসূদন দত্ত খাঁটি কথ্যভাষার প্রয়োগ দেখিয়েছেন যা শতাব্দীর গণ্ডী পার হয়ে আজও কলকাতার বুকে বর্তমান।

মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—এই দুই প্রহসন কথ্যপ্রয়োগের দিক থেকে একেবারে ভিন্ন স্বাদের। আঞ্চলিক উপভাষা, কথ্য ইডিয়াম এবং প্রয়োজন মত দেশি-বিদেশি ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহারে এ ভাষার মেজাজই আলাদা। যথা :

'কালী। কি উৎপাত। তোমার কথা শুনে, ভাই, গলাটা একেবারে যেন শুকিয়ে উঠ্লো। ওহে নব, বলি কিছু আছে?

নব। হুস্। অত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, বোধ করি একটা ব্র্যাণ্ডি আছে।

কালী। (সহর্ষে) জষ্ট দি থিং। তা আনো না দেখি।

নব। রসো দেখ্চি। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) কর্তা বোধ করি এখনো বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন নি। (উচ্চৈস্বরে) ওরে বোদে।'

(একেই কি বলে সভ্যতা)

এ একেবারে তরতাজা স্বাভাবিক কথ্যরূপ। কেবল সেকালের নয় একালের কলকাতারও ভদ্র সমাজের মুখের ভাষা। এতটুকু কানে বাজে না। বাংলা নাটকের উপযুক্ত ভাষা, যাকে আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন 'বিশুদ্ধ কথ্যভাষা।'[১] পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ গদ্য শিল্পীরা নাটকে ও গদ্যে এই রূপকেই বেশি পছন্দ করেন।

আবার দেশি-বিদেশি হিন্দী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে কথ্যগদ্যের শোষণশক্তির সঠিক ও সার্থক পরীক্ষা করে কথ্যরূপের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন :

'দৌবারিক। মহারাজ।

নব। ও লোক সব আয়া?

দৌবা। জী, মহারাজ।

নব। আচ্ছা, তোম্ যাও।

দৌবা। জো হুকুম মহারাজ।'

চাকরের হিন্দী ও বাবুর মুখে ভাঙা-হিন্দী নাটকীয়তাকে বাড়িয়ে তুলেছে। এমনি ভাবে ইংরেজি শব্দ আরবি-ফার্সি শব্দও মধুসূদন স্বচ্ছন্দে কথ্য-সংলাপে ব্যবহার করে দেখান।

আবার দেখি 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'তে হানিফ গাজীর মুখে যশোর জেলার নিম্নশ্রেণীর মানুষের মুখের ভাষা। এসব ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদের প্রভাব প্রত্যক্ষ করি। যথা :

'হানিফ গাজী। (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, আমি ঘরে আস্যে ফতিরি তল্লাস কল্লাম, তা সকলে কলে যে সে এই ভাঙ্গা মন্দিরির দিকে পুঁটির সাতে আয়েছে, তাই তারে টুঁড়তি টুঁড়তি আস্যে পড়িছি। আপনার যে মোছলমান হতি সাধ গেছে, তা জান্‌তি পাল্লি, ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোণার চাঁদ আপনারে আন্যে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্যি আপনি এত তজ্‌দি নেলেন কেন? তোবা! তোবা!'

(বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ)

---

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য়), ৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সুতরাং সাধু গদ্যের কালে বাংলা চলিত গদ্যের কৃত্রিম ও স্বাভাবিক--উভয় রূপই মধুসূদনের ক্ষমতা, প্রশংসার যোগ্য।

২.

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

প্রায় একই সময়ে আর একজন শক্তিমান নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র কথ্য গদ্যরূপ নিয়ে নাট্যসাহিত্যেব আসরে উপস্থিত হলেন। মধুসূদনের প্রহসন দুটির ও 'পদ্মাবতী নাটকের' প্রকাশের (১৮৬০) বছরেই দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ' নাটকের মত গ্রামবাংলার একটি ভয়াবহ অর্থনৈতিক বাস্তব সমস্যাকে নিয়ে রচিত শক্তিশালী নাটক লিখে নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে আর একটি নজির সৃষ্টি করলেন। পরে আরও কয়েকটি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন, কিন্তু 'নীলদর্পণে'র স্রষ্টা রূপেই তাঁর দেশজোড়া নাম।

মধুসূদনের মত দীনবন্ধুও আগাগোড়া চলিত গদ্যে নাটক ও প্রহসন রচনা করে আদর্শ কথ্যরূপের সন্ধান দিতে সক্ষম হন। কিন্তু দীনবন্ধুর প্রথম আবির্ভাবে সংলাপ রচনায় বড় রকমের ত্রুটি আমাদের চোখে পড়ে। তা হল 'নীলদর্পণ' নাটকের ভদ্রশ্রেণীর সংলাপের ভাষায় যেমন উৎকট ভাবে সংস্কৃত নাটকের আদর্শ তথা, সাধুভাষার প্রভাব তীব্র, নিম্ন শ্রেণীর বেলায় ঠিক ততখানিই নাটকীয় সংলাপের উপযোগী সহজ-স্বাভাবিক কথ্য-রূপের ব্যবহার আমাদের মুগ্ধ করে। 'নীলদর্পণ' নাটকের তোরাপ, রাইচরণ, আদুরী, ক্ষেত্রমণি, রেবতী প্রভৃতি চরিত্রগুলো নাট্যকারের ভাষাশৈলীর গুণেই অমর হয়ে থাকবে। বলা বাহুল্য নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলোর উপযোগী সংলাপ রচনায় দীনবন্ধুর কৃতিত্ব মধুসূদনকেও ছাড়িয়ে গেছে।

নীলদর্পণ নাটকের ভদ্রশ্রেণীর ও নিম্নশ্রেণীর দুটি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমরা দীনবন্ধুর কৃতিত্বকে অনায়াসে যাচাই করে নিতে পারি। যথা :

'বিন্দু। পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন--

পণ্ডিত। পাপাত্মা এমত অবিচার করেছে। তোমরা শুনিতে পাও না, বড়দিনের সময় ঐ কুটিতে একাদিক্রমে দশ দিবস যাপন করে আসিয়াছি। উহার কাছে প্রজার বিচার। কাজীর কাছে হিন্দুর পরোব।'

'নীলদর্পণের' এই সংলাপ দুটির ভাষা সাধুগদ্যের। তার মধ্যে তিনটি কথ্যক্রিয়ার ব্যবহারে ভাষাকে অযথা খোঁড়া করে তোলা হয়। অথচ এই নাটকের প্রকাশের আগের বছরেই মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা নাটক' লিখে মোটামুটি চলিত গদ্যের একটা কাঠামো গড়ে দেন।

ভদ্র সমাজের এই জাতীয় পুরাতন রীতির গদ্যের পাশেই 'নীলদর্পণের' নিম্নশ্রেণীর উপযুক্ত কথ্যরূপ অন্ধকারে ফুলঝুরির মতই জ্বলে উঠতে দেখা যায়। যথা :

'তোরাপ। সমিন্দি দেঁড়য়ে যেন কাটের পুতুল--গোডার বাক্যি হরে গিয়েছে--বড়বাবু সমিন্দির কি এমান আছে তা ধরম কথা শোনবে, ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেমনি মুগুর, সমিন্দির ঝ্যামন চাবালি, মোর তেমনি হাতের পোচা (গলদেশ ধরিয়া গালে চপেটাঘাত) ডাকবি তো জোরার বাড়ী যাবি। (গাল টিপে ধরো) পাঁচ দিন চোরের একদিন সেদের, পাঁচ দিন খাবালি একদিন খা (কান মলন)।'

নদীয়া-যশোর জেলার নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সমাজের মুখের ভাষা তোরাপের মুখে

দীনবন্ধু সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। 'আলালের' ঠকচাচার প্রত্যক্ষ প্রভাব এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর আদর্শ কথ্যগদ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর কারিকুরি প্যারীচাঁদকেও পেছনে ফেলে যায়।

এই যে 'নীলদর্পণে' একদিকে কৃতিত্ব, আর একদিকে ব্যর্থতা, কেউ কেউ তাই মন্তব্য করেছেন, 'গদ্যে লেখা নাটকে দীনবন্ধু তাই খুব ভালো কথ্যভাষার প্রয়োগ সর্বত্র করতে পারেন নি। তিনি সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদের সংলাপ তাদের উপযুক্ত ভাষায় লিখেছেন। কিন্তু ভদ্রশ্রেণীর ভাষায় তিনি সামঞ্জস্যের অভাবে গুরুচণ্ডালি দোষ এনে ফেলেছেন'।[১] সবিনয়ে তাঁদের 'নীলদর্পণের' পরবর্তী নাটকের ভাষা ভাল করে পড়ে দেখতে অনুরোধ জানাই। এখানে আলোচনার সুবিধার জন্যে 'নীলদর্পণ' নাটকের পরবর্তী নাটক থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

'ঘট। একথা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না, মেয়েটি তের উৎরে চোদ্দয় পড়েচে। ভদ্রলোকের ঘরে অভিভাবক না থাকা বড় ক্লেশ—তোমার শ্বশুর, টাকা গহনা সব রেখে গিয়েচেন, যোগাযোগ করে এমন লোক নাই বলে এতদিন অবিবাহিতা রয়েছে—বাপু, তুমি এখন আপনার জন, তোমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ কি, মেয়ের স্ত্রীসংস্কার হয়েচে।'

(বিয়ে পাগলা বুড়ো)

'নিম। তোমার হেড্‌টিতে আইরিশ স্টু হয়।
নকু। কেন?
নিম। অনেক পোট্যাটো আছে।
নকু। অটলকে একটু শ্যামপেন দাও।
অট। আমি তাও খেতে পারবো না।
নিম। তুমি কি প্রতিজ্ঞাপত্রে বাঁদরে আঁচড়েচ? থুড়ি, সই করেচ?
অট। সই করি আর না করি, আমি মদ খাব না।
নিম। তোর বাবা খাবে।'

(সধবার একাদশী)

'চোর। আমি বিশ বছর চুরি কচ্চি এমন বিপদে কখন পড়িনি ; বাপ্ যেন চরকি ঘুর্‌য়ে দিলে। জানতেম ভাল মান্‌ষের মেয়েদের হাত নাকি ফুলের মত নরম, ও মা কোথায় যাব, এনাদের হাত যেন ফালপেটা হাতুড়ি।'

(জামাই বারিক)

'রণ। মুণ্ডু ঘুরাবার পাত্র কই?
সুর। দেবীপুরের রাজপুত্র।
রণ। মদ্যপায়ী।
সুর। কগুলার যুবরাজ?
রণ। শেয়াল্ মার্‌তে হাতী চায়।
সুর। বীরনগরের বীরেশ্বর?
রণ। অশ্ববিদ্যায় অষ্টবক্র।

১. অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, ১৪২ পৃঃ দ্রঃ।

সুর। মৈনাক বাসের নবীন রাজা?
রণ। শাস্ত্র ধারণে সতীলক্ষ্মী।
সুর। বনপাশের বিজয়?
রণ। জয়দেবের আততায়ী।
সুর। ময়ূরেশ্বরের মুক্তারাম?
রণ। পেটের ভাঁজে ইঁদুর থাকে।
সুর। তোমার কপালে বর নাই।
রণ। এ বর মন্দ নয়।'

(কমলেকামিনী নাটক)

দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কলকাতা অঞ্চলের ভদ্র সমাজের ও নিম্নশ্রেণীর মানুষের মুখের ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা দীনবন্ধু দেখাতে সক্ষম হন। তাঁর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণের' উল্লেখযোগ্য সাফল্যের ফলে নাটকের বাস্তব কাহিনী যতটা দায়ী, ততটা তাঁর ভাষা নয়। ভাবীকালের আদর্শ চলিতরূপের সন্ধান ঐ নাটকে না দিতে পারলেও, পরবর্তীকালে একেবারে ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত 'কমলেকামিনী নাটক' পর্যন্ত সব নাটকে ও প্রহসনে তিনি যে গদ্য ব্যবহার করেছেন তা স্বাভাবিক কথ্যরূপ ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তাঁর উপর অর্পিত গুরুচণ্ডালি দোষের অভিযোগ টেঁকে না। উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যে সমাজের ভদ্রশ্রেণীও যেমন আছে, নিম্নশ্রেণীর কথ্যসংলাপও রয়েছে। 'জামাই বারিক' নাটকে চোরের সংলাপের ভাষায় নিম্নশ্রেণীর কথ্য-উচ্চারণে যে দ্বিমাত্রিকতার লক্ষণ দেখা যায় এখানে তার প্রমাণ মেলে। যেমন--ঘুর্‌য়ে (ঘুরিয়ে), মান্‌ষের (মানুষের) ইত্যাদি।

আবার 'সধবার একাদশী' নাটকে প্রয়োজন মত ইংরাজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের কথাবার্তার ভাষায় এই ধরনের শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক মন্দ নয়।

তাছাড়া ভদ্রশ্রেণীর কথ্যরূপে অনেক সময় যুক্তব্যঞ্জন বা তৎসম শব্দ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এবং অনেক সময় নাটকীয় সংলাপ কবিতার মত আস্বাদ্য মনে হয়, দীনবন্ধুর নানা নাটকের অনেক জায়গায় তেমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। 'কমলেকামিনী' নাটক থেকে এখানে সেই রকম একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাট্যে আমরা তাকেই বড় করে পেয়ে থাকি। শিষ্ট সমাজের ব্যবহার্য কথ্যরূপ সাহিত্যে কেমন হওয়া উচিত, তা দীনবন্ধু ধরতে পারেননি বলে যাঁরা[১] অভিযোগ করেন, 'নীলদর্পণ নাটক' ছাড়া অপরাপর নাটকের এই আলোচনার শেষে দেখতে পাই তাঁদের অভিযোগের অসারতা কতটা।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে আদর্শ চলিতরূপ মধুসূদন ও দীনবন্ধু নাটক ও প্রহসনের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন। মধুসূদনে তৎসম ও সংস্কৃত শব্দবহুল কৃত্রিম চলিত, এবং দীনবন্ধুর মধ্যে তদ্ভব দেশি-বিদেশি শব্দবহুল স্বাভাবিক চলিত গদ্যের পরিচয় মেলে। মধুসূদনের ভাষায় ধড় আর দীনবন্ধুতে হাত-পা। সাধুগদ্যের আধিপত্যের কালে এই দুই নাট্যকারের আদর্শ কথ্যগদ্যের এমন নজির সেকালে বিরল।

১. অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, ১৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়

ধর্মকথায় চলিত রূপ

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বাইরে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী এমন কিছু গদ্যশিল্পী ছিলেন, যাঁরা সাহিত্যকর্মে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, শিবনাথ শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য) তাঁদের অন্যতম।[১] তিনি ছিলেন কবি, গদ্য লেখক, সম্পাদক, সাংবাদিক, ধর্ম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক, স্বাধীনতার পূজারী ইত্যাদি। তবে এগুলোর অনেক কিছুই তাঁর গদ্য লেখাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাঁর সাহিত্যকর্ম বাংলা সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি তাঁর বিচিত্র কর্মতৎপরতা নানাদিক থেকে আমাদের জাতীয় জীবনকে পুষ্টিসাধন করে তুলেছে।[২] সেই বিশাল কর্মযজ্ঞে তাঁকে চিরকালই সংগ্রাম করে যেতে হয়। তিনি লেখেন, 'দারুণ সংগ্রামে জীবন গিয়াছে, মাতাপিতার সহিত সংগ্রাম, আত্মীয় সজনের সহিত সংগ্রাম, দুই স্ত্রী লইয়া গৃহ পরিবারে সংগ্রাম, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুগণের সহিত সংগ্রাম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুগণের সহিত সমাজের কাজ লইয়া সংগ্রাম, এইরূপ নানা সংগ্রামে আমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শৈশব হইতে শারীরিক ধাতু সকল দুর্ব্বল ছিল, তাহা সত্ত্বেও এত প্রকার সংগ্রামের মধ্যে যে বাঁচিয়া আছি এই ভগবানের কৃপা।'[৩] নিজের জীবনকে তিনি 'মানব হিত ব্রতে' নিঃশেষে উৎসর্গ করে দেন এবং সেকালের বাংলাদেশের ধর্ম ও সমাজ-জীবনে নতুন প্রাণসঞ্চার করতে এবং প্রগতিমূলক ভাবধারার প্রবর্তন করতে সমর্থ হন।[৪]

বাংলা গদ্য-সাহিত্যে শিবনাথের দান নেহাৎ কম নয়। মোটামুটি গ্রন্থ সংখ্যা বাইশের মত। পত্রপত্রিকায় কিছু কিছু রচনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাঁর গ্রন্থগুলির অধিকাংশই গদ্য। বাকি পদ্যে লেখা। গদ্য রচনা গুলো আবার বিভিন্ন জাতের লেখা। আলোচনার সুবিধার জন্যে গদ্য রচনাকে তিন ভাগে ভাগ করা হল। যথা : উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ছোটগল্প।

শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসের সংখ্যা চার। মেজবৌ (১৮৮০ খৃঃ), যুগান্তর (১৮৯৫ খৃঃ), নয়নতারা (১৮৯৯) ও বিধবার ছেলে (১৯১৬ খৃঃ) ; সবকটির ভাষা সাধুগদ্য। তবে সমাসবদ্ধ শব্দ ও যুক্তব্যঞ্জনের গুরুভারে জরজর নয়। অনেক ক্ষেত্রে মৌখিক ভাষার উপদানে সরল। আবার অনেক জায়গায় বিশেষ করে কথোপকথনের ভাষায় চলিতরীতির আশ্চর্য প্রয়োগ দেখতে পাই। 'নয়নতারা' থেকে আমরা তাঁর সাধুরূপের একটা দৃষ্টান্ত তুলে দিচ্ছি। যথা :

'এই বলিয়া টেঁপীকে কোলে লইতে গেলেন। টেঁপী কোলে আসে না। সেই দুই কি আড়াই বৎসরের মেয়ে। পেটটী এমনি উঁচু যে দাঁড়াইলে বোধহয় যে নিজের পায়ের নখ নিজে দেখিতে পায় না। তাহাতে আবার একটী গোঁড় আছে। সেটী বোধ হয় শৈশবকালে চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া প্রস্তুত করিয়াছে।'

---

১. ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ১০৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২. শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৭ম খণ্ড), ৫ পৃঃ দ্রঃ।

৩. ঐ, ২৭ পৃঃ দ্রঃ।

৪. ঐ, ৫ পৃঃ দ্রঃ।

এখানে এ গদ্য সাধুরূপ বটে, কিন্তু গুরুভার বর্জিত। তাই 'ক্রোড়ে', 'আইসে', 'উচ্চ' প্রভৃতির বদলে 'কোলে', 'আসে', 'উঁচু' শব্দ পাই। ভাষার এই চলটা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে প্রথম লক্ষ্য করি। সমাসবদ্ধ শব্দ ও যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহারে লেখকের সংযমের কথা উল্লেখ করতে হয়। সংলাপ বা কথোপকথনের ভাষাতে পাচ্ছি কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের মৌখিক ভাষার নিদর্শন। যথা :

'কর্তা। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, অনেক পুণ্য না হলে তোমার মত মেয়ে ঘরে আনা যায় না।

প্রমদা। আপনি কথা কবেন না ; বেদনা বাড়বে।

কর্তা। আর ত বেশীদিন কথা কইতে হবে না, যতক্ষণ দেখবার শক্তি আছে, তোমাদের মুখ দেখে নি।

প্রমদা। বাতাস করব?

কর্তা। না মা, অনেকক্ষণ বাতাস ক'রেছ, আর বাতাসে কাজ নাই। তুমি অমনি বসে থাক, আমি কথা কই। তুমি যেদিন হতে আমার বাড়ীতে পদার্পণ করেছ, সেইদিন হতে আমার প্রবোধের সপ্রতুল, আশীর্ব্বাদ করি। তোমরা সুখে থাক। পরেশ কোথায়?

পরেশ। বাবা, এই যে।'[১]

খাঁটি কথ্যগদ্য। শব্দপ্রয়োগে লেখক কোন কার্পণ্য করেন নি। তবে 'পদার্পণ', 'সপ্রতুল' জাতীয় তৎসম শব্দের মিশেল কিছু কানে বাজে। তবু সংলাপের সহজ রূপটা এই গদ্যে পাই।

পরবর্তী উপন্যাসেও গদ্যের এই সহজ রূপটা আরও বিকাশ লাভ করেছে। 'নয়নতারা' লেখকের তৃতীয় উপন্যাস। এতে কথ্যগদ্যের আরেক রূপ। কলকাতার শিষ্ট-সমাজের ব্যবহৃত কথাবার্তার ভাষাই যেন লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। যথা :

'হরেন্দ্র। জায়গাটী বেশ।

নয়নতারা। দেখছেন কেমন সুন্দর স্থান। এর কাছে একটা বড় বিলের মত আছে, সেখানে বোটানির অনেক স্পেসিমেন পাওয়া যায়। আমি একদিন গিয়ে কতগুলো এনে ছিলাম।

হরেন্দ্র। বটে, সেটা আমাকে দেখতে হবে। আপনি খুব বোটানি পড়ছেন, না?

নয়নতারা। হ্যাঁ এক আধটু পড়ছি বৈকি, অনেক দিনের পরে আপনাকে দেখলাম নূতন খবর কিছু আছে কিনা?

হরেন্দ্র। নূতন খবরের মধ্যে এম. এ. পাশ করে আমার প্রোমোশন হয়েছে ; ও মাহিনা বেড়েছে।'[২]

অংশটির ভাষা ও বাক্‌রীতির মধ্যে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের কথ্যভাষার রূপ বর্তমান। মাঝে মাঝে তাই দু-একটা ইংরিজি শব্দ চোখে পড়ছে। কোথাও কোথাও একেবারে ইংরিজি সংলাপও আছে। এইভাবেই সেকালের উপন্যাস বা গল্পে কথ্যভাষা সংলাপ তথা কথাবার্তার ভাষায় নিজের প্রতিষ্ঠা করে নেয়।

শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক। এখনো পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু ছড়িয়ে থাকতে

১. অষ্টাদশ সংস্করণ, ২৫-২৬ পৃঃ দ্রঃ।
২. The Carry Press মুদ্রিত, মোট পৃষ্ঠা ২৬২।

পারে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে বেশির ভাগ বক্তৃতা, বাকিগুলি জীবনী। সবগুলোই সাধুগদ্যে লেখা। তবে উপন্যাস বা গল্পে ব্যবহৃত সাধুরূপের চেয়ে, প্রবন্ধের ভাষা ভিন্নস্বাদের। ব্যতিক্রম 'আত্মচরিত' গ্রন্থটি। ইতিপূর্বে 'নয়নতারার' সাধুগদ্যের প্রয়োগ দেখতে পেয়েছি। এখন তাঁর দুটো বহু উচ্চারিত প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে সাধুগদ্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে লেখকের গদ্য রচনার পরিচয় নিতে পারি। যথা :

'অবশেষে সেই প্রধূমিত অসন্তোষ ১০ই মে দিবসে মীরাটনগরে বিদ্রোহাগ্নির আকারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেখানে ৬ই মে দিবসে ৮৫ জন দেশীয় সৈনিক কাওয়াজের সময় টোটা লইতে অস্বীকৃত হওয়াতে তাহাদিগকে কোর্ট মার্শ্যালের বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ইহাতে অপরাপর সিপাহীগণ তাহাদিগকে ধর্মের নিপীড়িত বলিয়া, সদলে বিদ্রোহী হইয়া, ১০ই মে দিবসে জেলের কয়েদিগণকে ছাড়িয়া দেয় ; রাজকোষ লুণ্ঠন করে ; অস্ত্রাগার হস্তগত করে, অনেক ইংরাজকে হত্যা করে এবং অবশেষে দিল্লীর নাম-মাত্র সম্রাট বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে পুনরায় রাজ সিংহাসনে বসাইয়া স্বাধীনতার পতাকা উড়াইবার মানসে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করে।'

(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নবম পরিচ্ছেদ, ২১৫ পৃঃ)

এতে অনেক সমাসবদ্ধ শব্দ তৎসম ও যুক্তব্যঞ্জনের অবাধ প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই গদ্য উপন্যাসের চেয়ে গম্ভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

আবার উপন্যাসের গদ্যের মত সরলরূপও মাঝে মাঝে এই গ্রন্থে মেলে। যথা : 'নীলদর্পণ' কে লিখিল, তাহা জানিতে পারা গেল না ; কিন্তু বাসাতে বাসাতে 'ময়রাণী লো সই নীল গেজেছ কই?' ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলিল। যতদূর স্মরণ হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। পাদরী জেম্‌স লং সাহেব তাহা নিজের নামে প্রকাশ করিলেন। ইংলণ্ডেও আন্দোলন উপস্থিত হইল। নীলকরগণ আসল গ্রন্থকারকে না পাইয়া ইংলিসম্যান পত্রিকা সম্পাদককে মুখপাত্র করিয়া ১৮৬১ সালে ১৯শে জুলাই লং-এর নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।" (২২৪ পৃঃ)

দেখা যাচ্ছে ভারি ভারি শব্দ নেই। গ্রন্থের স্মৃতিচারণমূলক অংশের ভাষা সরল এবং তথ্যমূলক বর্ণনার অংশ গম্ভীর ও ভারি।

এর পাশে আমরা লেখকের আর একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগ্রন্থ 'আত্মচরিত' থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে এই স্মৃতিচারণমূলক গদ্যের আশ্চর্য শক্তির পরিচয় গ্রহণ করতে পারি। যথা :

'তখনো দেখি যাত্রীদের মধ্যে এক ব্যক্তি তুড়ি দিয়া মন আনন্দে "বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের" ইত্যাদি কীর্তনটি গাইতেছিল। তাঁহাকে বলা গেল, "মশাই, গান রাখুন, কোমর বাঁধুন, এ ঘর যে পড়ে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "রেখে দেও ঘরপড়া, গাইতে বড় ভালো লাগছে; শোনো কীর্তনটা শোনো।" আর শোনো! চড়চড় করিয়া ঘর হেলিতে লাগিল, আমরা দৌড়িয়া বাহিরে গেলাম, সে ভদ্রলোকটি চাপা পড়িলেন।...অতিকষ্টে আমাদিগের নিকট আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, বড় পিতৃপুণ্যে বেঁচে গেছি। আপনারা বোধহয় ভাবছিলেন মারা পড়েছি। আরও কিছুদিন কর্মভোগ বাকি আছে কি না, এখন কেন যাব? বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। তাহার সেই হাসি আমার আজও মনে আছে।'

(৬০-৬১ পৃঃ)

সরসতা ও সরলতা এ গদ্যের বৈশিষ্ট্য। বিষয়কে সহজ করে বলা এবং সেজন্যে

যথাসম্ভব সাধারণ শব্দের প্রয়োগ লেখকের এই গ্রন্থের সাধুরূপের সবচেয়ে বড় গুণ। উপন্যাসের মধ্যেও এই ধরনের সরস-সাধুতার পরিচয় কম মেলে। এই কারণে উপন্যাসের চেয়ে লেখকের 'আত্মচরিত' পাঠককে বেশি টানে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর ছোটদের গল্পের মধ্যে তাঁর গদ্যধারার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। ছোটদের জন্য রচিত তাঁর অনেকগুলো গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। 'মুকুল' পত্রিকার গল্পগুলো সংগ্রহ করে, তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়—এমন একটি গ্রন্থের নাম 'ছোটদের গল্প'।[১]

অবন্তী ভট্টাচার্য ভূমিকায় বলেছেন, '৬০।৭০ বৎসর পূর্বে মুকুল পত্রিকার পাতায় যে গল্পগুলি সেদিনের বালক বালিকাদের অপরিসীম আনন্দ ও আগ্রহের উদ্রেক করেছিল, আজও তাঁদের নাতি-নাতনীরা তার মধ্যে তেমনি মধুর রসের সন্ধান পাবে এই আশায় সেগুলিকে পুস্তকাকারে গ্রন্থিত করা হল।'

নটি গল্প—লক্ষ্মীনারায়ণ, রাগের সাজা, আমেরিকার গল্প, পশুদের গল্প, জানোয়ারের গল্প, অদ্ভুত ঘটনা, ঈগলের সহিত যুদ্ধ, শাদা মন কালো মন ও হাসির কথা।

ছোটদের জন্য লেখা। ছোটদের 'আগ মার্কা' রচনা নয়। ছোটদের মনের মত করেই লেখা। যেমন ভাব তেমনি ভাষা। হাত ধরাধরি করে তাঁর ভাব-ভাষার ভালবাসা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে গদ্যকে বিষয়ীলোকের গদ্য বলেছেন—এতে তারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখি। যথা : 'লক্ষ্মীনারায়ণ' এক বামনের ছেলে। দেহটি কুস্তির পালোয়ানের মত, কিন্তু মাথাটি যেন একটি ছোট হুঁকার খোল। কাজেই লক্ষ্মীনারায়ণের বুদ্ধি-সুদ্ধি বড় কম। কিন্তু তার মা সে কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, 'আমার লক্ষ্মীর পেটে পেটে বুদ্ধি আছে, বয়স হলে ফুটবে।' কবে যে লক্ষ্মীর বয়স হবে তাহাতো বুঝিতে পারা যায় না ; দেখিতে দেখিতে বিশ-বাইশ বৎসর হইয়া গেল, তবুও লক্ষ্মীর বয়স হইল না, সে সংসারের কোন কাজেই আসিল না।...বাহির হইলেই যেমন কাকের পিছে ফিঙ্গে লাগে, তেমনি ছোঁড়ারা তার পিছে লাগে, এবং বিধিমতে তাহাকে জ্বালাতন করে। পিছন দিক দিয়া আসিয়া তাহার কাছা খুলিয়া দেয়, তার হুঁকার খোলের মাথাটিতে ঠোকর মারে, তার দুই কাঁধে হাত দিয়া লাফাইয়া ঘোড়া চড়ার মত তার পিঠে চড়িয়া বসে।'

(লক্ষ্মীনারায়ণ)

ছোট ছোট বাক্য। বিষয়কে গল্প বলার মত একটু একটু করে পাঠকের কাছে হাজির করা। সহজ আটপৌরে গদ্যে সরস করে বলার ঢঙটা তাঁর সব গদ্যরীতিকে পিছনে ফেলে দেয়। এ গদ্যে দুটি একটি সাধুক্রিয়ার প্রয়োগ দেখে, একে সাধুগদ্য বললে এর মহিমাকে লঘু করে দেখা হবে। অনায়াসে তাই চুপড়ি, ট্যাক, হুঁকার খোল, ঠোকর, মেছুনি, চাঁই মশাই ইত্যাদি অতিচল আটপৌরে শব্দগুলোর সন্ধান মেলে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই গদ্যকেই 'বিষয়ীলোকের' গদ্য বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

আর একটা গল্পে দেখি : 'তাঁতীদের একজন চাঁই মশাই আছেন, তাঁর বড় বুদ্ধি। তাঁর এত বুদ্ধি যে পাছে বুদ্ধি বাহির হইয়া যায় এজন্য নাকে কানে তুলা দিয়া দিনে দুপুরে তার

১. নিউজপ্রিন্ট সংস্করণ, প্রথম প্রকাশকাল ১৮৮২।
২. অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক।

ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার ভিতরে আবার মশারি খাটাইয়া তাহার মধ্যে বসিয়া থাকেন। লোকে যদি কোনো বিপদে পড়ে, বুদ্ধির প্রয়োজন হয় তবে ঐ দ্বারের নিকট হইতেই জিজ্ঞাসা করিতে হয়, ঘরের ভিতরে ঢুকিবার হুকুম কাহারও নাই।' (হাসির কথা)

সেই একই রূপ একই মেজাজ। 'হাসির কথা' হাসির ভাষা দিয়েই লেখা। বাংলাদেশের দাদু দিদিমাদের মুখে যে ভাষায় গল্পস্রোত চলে এসেছে, শিবনাথ শাস্ত্রীর ছোটদের গল্পের ভাষা তার সঙ্গেই যেন আপোষ করেছে। তাই দেখি সহজ-সরল গদ্য। ঐ একই কলম দিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর স্বাভাবিক কথ্যগদ্যের আশ্চর্য ক্ষমতা লক্ষ্য করি, যখন শুনি : 'কিন্তু শেষে উপায়ান্ত না দেখিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, "লকে লকে এদিকে আয় ; এই একটা টাকা নিয়ে বাজারে যা, আট আনার মাছ কিনে কারু হাতে পাঠিয়ে দিস, তারপর প্রথম হাটে ভাল তরি তরকারি যা পাবি কিনে আনিস।"'

(লক্ষ্মীনারায়ণ)

২.

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০)

কেশব সেনের অনুগামী ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ একাধিক বাংলা গদ্যগ্রন্থ লেখেন। নানা কারণে সেই গদ্যগ্রন্থগুলো উল্লেখযোগ্য। এই গদ্যলেখকদের মধ্যে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ও ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সর্ব ধর্মের মূল কথা এক, একই লক্ষ্যে মানুষকে নিয়ে যেতে চায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্ম সাধনার সারকথাও ছিল এই। পরোক্ষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের এই সার সত্যটির দ্বারা কেশব সেন আকৃষ্ট হন। ফলে তাঁর মধ্যে দেখা দেয় এক উদার মানবিকতা। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের মানুষ যেন প্রচলিত ধর্মের সার-সত্য ও তত্ত্ব উপলব্ধি করে। তাহলে ধর্মে ধর্মে বিরোধ দূর হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে পরস্পরের মধ্যে এক পবিত্র ভ্রাতৃত্বভাব। তাই বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য কেশব সেন তাঁর অনুগামীদের আহ্বান করেন।

এই সময় সেই কারণে কিছু চরিতবৃত্তান্ত প্রকাশ করা আবশ্যক হয়। ভারতবর্ষে যাঁরা মধ্যযুগে সাধক ছিলেন, যাঁরা প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-শাসিত ধর্ম অস্বীকার করেন, তাঁদের চরিতকথা এই সব গদ্যলেখকদের আকর্ষণ করে। মধ্যযুগের ঐ সব সন্তদের জীবনকথা আধুনিক যুগের দৃষ্টিতে দেখার পেছনে ছিল তাঁদের ধর্মমতের মানবিক দিকটি, উদার ভক্তির দৃষ্টিকে ফুটিয়ে তোলা, অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়।[১]

ভাই গিরিশ সেন ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের গদ্যগ্রন্থ সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। তাই গদ্যের আলোচনায় ঐ দুই লেখকের নাম উল্লেখ করতে হয়।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন আরবি ও ফার্সি ভাষায় বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। কেননা, তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলির প্রায় সবই ফার্সি বা আরবি ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদ করা।[২] তাঁর 'হিতোপাখ্যানমালা' গদ্যগ্রন্থটি সাদীর গুলিস্তাঁ কাব্যের উপাখ্যান-অংশের অনুবাদ। 'দেবর্ষিদিগের উক্তি' (১৮৭৭) বা 'তাপসমালা' ফরিদুদ্দিন আত্তার রচিত মূল ফার্সিগ্রন্থ 'তাজকেরাতুন আউলিয়া' থেকে বঙ্গানুবাদ। হাফিজ (প্রথম খণ্ড ১৮৭৭) ফার্সি দিওয়ান ই

১. দেবীপদ ভট্টাচার্য, ছোটগল্পের কথা।
২. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ড. সুকুমার সেন, ১২১ পৃঃ দ্রঃ

হাফিজ-এর অনুবাদ। কেশব সেনের নির্দেশে বাংলায় তিনিই প্রথম 'কোর-আন শরীফ' অনুবাদ করেন। এছাড়া কিছু স্বাধীন রচনাও তাঁর আছে। তার মধ্যে 'মোহম্মদের জীবনী' এবং 'শ্রীমৎ রামকৃষ্ণের উক্তি' এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখযোগ্য। ১৩১৩ সালে ১২ পৌষ একাত্তর অথবা বাহাত্তর বছর বয়সে তাঁর রচিত আত্মজীবনী[১] প্রকাশিত হয়।

এই সব রচনা গতানুগতিক সাধুগদ্যে রচিত। তবে কী অনুবাদে, কী আত্মজীবনীতে সহজ-সরল গদ্যই তিনি ব্যবহার করেন। যুক্তব্যঞ্জন ও বড় বড় সমাসবদ্ধ শব্দের প্রয়োগে লেখকের সংযম সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। 'তাপসমালা' থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা তার প্রমাণ নিতে পারি। যথা :

'কেহ সহস্র মুদ্রা আনিয়া এব্রাহিমকে বলিয়াছিল যে, গ্রহণ কর। তিনি বলিলেন, "আমি দরিদ্রের নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করি না।" দাতা বলিল, "আমি দরিদ্র নই; ধনী।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার যে সম্পত্তি আছে, তাহা অপেক্ষা কি অধিক চাই?" সে বলিল, "হাঁ।" এব্রাহিম বলিলেন, "মুদ্রা লইয়া যাও, তুমি একজন প্রধান দরিদ্র।" পরে বলিলেন, "হায়! আমি অন্বেষণ করি দরিদ্রতা, উপস্থিত হয় ঐশ্বর্য্য।"'[২]

দেখা যাচ্ছে, গদ্যে সাধুরূপ থাকলেও, তাতে প্রচুর তদ্ভব ও আরবি-ফার্সি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ফলে ভাষারূপ এখানে সহজ-সরল। ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের গদ্যের বিশেষত্ব এখানেই।

৩.

ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (১৮৪০-১৯১৬)

গিরিশচন্দ্র সেনের মতই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল কেশবচন্দ্রের আর একজন ব্রাহ্ম অনুগামী। তিনি 'চিরঞ্জীব শর্মা' ছদ্মনামে গদ্যে কয়েকটি বই রচনা করেন। ধর্মমূলক সঙ্গীত রচনাতেই তাঁর দক্ষতা বেশি প্রমাণিত। 'নববিধান' নামে একটা পত্রেরও সম্পাদক ছিলেন তিনি।[৩]

তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'বিংশ শতাব্দী' (১২৯৮) ও 'গরলে অমৃত' নামে দুটি উপন্যাস, জগতের বাল্য-ইতিহাস (১৮৭৫), ভক্তি চৈতন্যচন্দ্রিকা, চৈতন্যজীবনকথা, ঈশানচরিতামৃত (১৮৮২-৮৩) ও কেশবচরিত (১৮৮৪) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া তিনটি নাটকও রচনা করেন বলে জানা যায়।

৪.

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩—১০ আগস্ট, ১৮৮৬)

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব লেখক ছিলেন না, নিজে লেখেন নি কিছু, তবু উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের আলোচনায় তাঁকে বাদ দিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

তাঁর আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্য দুদিক থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে। একদিকে তাঁর ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করে, তাঁর মুখের কথা শুনে রামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক এক বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি

হয়েছে। আর একদিকে তাঁর শিষ্য-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে কোন জটিল তত্ত্বকে সহজ করতে ঠাকুরের মৌখিক রচনার ধারা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এই শেষোক্ত রচনাগুলো সংগ্রহ করে 'কথামৃতকার' কথাসাহিত্যের স্তরে এনে দেন। ঐ সব মৌখিক গল্পের মধ্যে নীতি ও ধর্মের কথা থাকত সত্য, কিন্তু উপস্থাপনা ও বর্ণনার গুণে তা রসসাহিত্যের মত আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। শ্রোতার মনের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। রসিক পাঠকদের পক্ষে নীতি ও ধর্ম থেকে সাহিত্যরস আহরণে কোন বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। এইখানেই এই রচনার বৈশিষ্ট্য।[১]

যে কাহিনীগুলো তিনি নীতি বা উপদেশের মাধ্যমে শিষ্যদের কাছে বলেছেন, তাঁর বলার ভঙ্গির মধ্যে যেমন একটা নাটকীয়তা ছিল, তেমনি আখ্যানের মধ্যে শিল্প-কুশলতাও ছিল। আখ্যানগুলো কিভাবে আরম্ভ হয়ে কিভাবে কোনখানে শেষ হবে, এ বিষয়ে তাঁর একটা পরিমিতিবোধ ছিল, তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। এই গুণ আমাদের দেশের পণ্ডিত সমাজের একটা বিশিষ্ট গুণ। সেই জোরেই তাঁরা কথকতা করে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একজন উচ্চস্তরের কথক ছিলেন। তাঁর কথার মধ্যে নিজস্ব একটা ঢঙ ছিল। তাতে নানা ভাব, নানা চরিত্র ভিড় করে আসত, কিন্তু এক-কেন্দ্রবিন্দুতে মিলে যেতো। তাঁর কথায় রসের উৎস ছিল। তাই সেদিন তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিকেও যেমন টেনে ধরে রাখত, সাহিত্যামোদীকেও তেমনি ধরে রাখত। সাধারণ কথকদের সঙ্গে তাঁর এখানেই বড় পার্থক্য।[২]

তাছাড়া কথকরা তাঁদের কথকতায় রামায়ণ মহাভারত ও নানা পুরাণ-কথাকেই পাণ্ডিত্য-পূর্ণ করে বিতরণ করেন। তার সঙ্গে চলতিকালের জীবনরসের কোন যোগই রাখা হোত না। অন্যদিকে ঠাকুরের কথায় যেসব কাহিনী, যেসব ঘটনা, এমনকি যেসব চরিত্র ভিড় করে এসেছে, তার মধ্যে বাঙালি সমাজের পরিচিত ঘরোয়া জীবনবোধের উপর কথাশিল্পের ভিত দাঁড়িয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পে সেই অভিজ্ঞতারই প্রমাণ মেলে।

গল্পগুলো একটা নীতি বা উপদেশের উপর দাঁড়িয়ে। এদিক থেকে প্রাচীন পঞ্চতন্ত্র, ঈশপ্ ফেবলস এবং যীশুখৃস্টের প্যারাবলের সঙ্গে এগুলি তুলনীয়। কিন্তু গল্পরসের দিক থেকে রামকৃষ্ণের গল্পের সঙ্গে যীশুর প্যারাবলের মিল বেশি। তবে প্যারাবলগুলোর মধ্যে একটু এলোমেলো ভাব লক্ষ্য করা যায়। তাতে একটা গল্পের কথা ও একাধিক ধর্ম-শিক্ষার প্রসঙ্গ রয়েছে।[৩] দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'প্যারাবল অব দি কিংডাম' বা 'প্যারাবল অব দি গুড সামারিটান' প্রভৃতি গল্পের কথা বলা যায়।

আবার আগেই বলা হয়েছে, কথামৃতের গল্পগুলির বড় বৈশিষ্ট্য এদের বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টি। এখানেই আধুনিক কথাসাহিত্যের সঙ্গে এর মিল।[৪] রামকৃষ্ণের ধর্মের কথা বা নীতির কথা গল্পে প্রচ্ছন্নভাবে থাকলেও Objective World বা বস্তুতান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করেননি। যেমন, 'বুড়ো সাপের ফোঁস করার গল্প', 'মাহুত নারায়ণ গল্প।'

রামকৃষ্ণদেব তাঁর ভক্তদের একদিকে শিক্ষা ও অন্যদিকে আনন্দ দিতে কত যে গল্প

শুনিয়েছেন তার শেষ নেই। সবাই সেসব ধরে রেখেছেন তা নয়, কেউ কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'শ্রীম' ছদ্মনামে পাঁচটি খণ্ডে ডাইরীর আকারে ১৯০২ খৃঃ থেকে ১৯৩২ খৃঃ পর্যন্ত কাল সময়ে ঠাকুরের কথা বা গল্পগুলি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এগুলিই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' নামে পরিচিত।

সংকলক নিজের বক্তব্যকে এখানে প্রচলিত সাধুগদ্যে বর্ণনা করেন, কিন্তু যখন ঠাকুরের মুখের কথা সংকলন করেন, তখন সাধুগদ্যের পরিবর্তে ঠাকুরের মুখের ভাষা তথা হুগলি জেলার চলিত ভাষাই ব্যবহার করেছেন। অবশ্য হুগলি জেলা ও কলকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষারূপের বেশি পার্থক্য ছিল না। ফলে, কথকথায় শ্রীরামকৃষ্ণ মুখ-নিঃসৃত গল্পে বা কথায় গত শতকের চলিত গদ্যের খাঁটিরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই গদ্যের আলোচনায় তথা চলিতরীতির আলোচনায় এগুলোর গুরুত্ব যে অনেক, সেকথা বুঝিয়ে বলার আবশ্যক নেই। এখন কথামৃত থেকে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমরা এগুলোর ভাষারূপ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গের প্রমাণ নিতে পারি। যথা :

'বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ? পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হল। কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল। তার আর সেতুর দরকার হয় নাই।'

(১ম খণ্ড, ২৯ পৃঃ)

'সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় ; ব্রহ্মদর্শন হয়—সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কী বস্তু মুখে বলবার শক্তি থাকে না।

লুণের ছবি (লবণ পুত্তলিকা) সমুদ্র মাপতে গিছলো (সকলের হাস্য)। কত গভীর জল তাই খপর দেবে। খপর দেওয়া আর হল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খপর দিবেক?' (৩য় ভাগ, ৮ পৃঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) :

'আর দেখ, বেশী আচার করো না। একজন সাধুর বড় জল তৃষ্ণা পেয়েছে ; ভিস্তি জল নিয়ে যাচ্ছিল সাধুকে জল দিতে চাইলে। সাধু বললে, তোমার ডোল (চামড়ার মোশক) কি পরিষ্কার? ভিস্তি বললে, মহারাজ, আমার ডোল খুব পরিষ্কার। কিন্তু তোমার ডোলের ভিতর মলমূত্র অনেক রকম ময়লা আছে। তাই বলছি, আমার ডোল থেকে জল খাও, এতে দোষ হবে না। তোমার ডোল অর্থাৎ তোমার দেহ, তোমার পেটে।'

(৫ম ভাগ, ৭০ পৃঃ)

দেখতে পাচ্ছি পাঁচটা খণ্ডেই ঠাকুর মোটামুটি কথ্যভাষাতেই গল্প ও উপদেশ দেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সংকলক ভাষার মৌখিক রূপটি সংযত করতে দুটি-একটি শব্দের পরিবর্তন করেছেন মনে হয়। যেমন, লুণ (নুন) বা খপর (খবর)-এর মত আঞ্চলিক শব্দকে অবিকৃতভাবে ঠাঁই করে দিয়েছেন। আবার 'মলমূত্র' বা 'ময়লার' মত কৃত্রিম সাধুশব্দকেও টেনে এনেছেন মূল মৌখিক শব্দের বদলে। তবে মৌখিক ভাষায় জলতেষ্টা শুনতেই আমরা অভ্যস্ত, এখানে জলতৃষ্ণা, কানে কাজে। তবু সাধুগদ্যের কালে এই চলিতরূপ আমাদের মুগ্ধ করে।

জটিল ধর্মীয় তত্ত্বকে সরল ভাষায় বসিয়ে পরিবেশন করতে রামকৃষ্ণদেবের আগে এমন

করে আর কখনও দেখা যায়নি। যেমনি এঁর ভাষা, তেমনি তার বিষয় ও বাচনভঙ্গি। এই বাচন পটুতার গুণে অনেক সময় তাঁর গল্পে নীতি বা উপদেশ চোখে পড়ে না। শুধু সাহিত্য-রস পান করেও তৃপ্তি পাওয়া যায়।

'বিশ্বাস' ভক্তমনকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে, সব কিছুর গোড়া বিশ্বাস, এটা বোঝাতে তিনি একটি গল্প বলেন :

'বিভীষণ একটি পাতায় রামনাম লিখে, ঐ পাতাটি একটি লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিছল। সে লোকটি সমুদ্রের পারে যাবে। বিভীষণ তাকে বললে, তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস করে জলের উপর দিয়ে চলে যাও, কিন্তু দেখো যাই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে যাবে। লোকটি বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল ; এমন সময়ে তার ভারী ইচ্ছা হল যে, কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার দেখে! খুলে দেখে যে কেবল রাম নাম লেখা রয়েছে। তখন সে ভাবলে "একি! শুধু রামনাম একটি লেখা রয়েছে!" যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।'

(১ম ভাগ, ২৯ পৃঃ)

এতে হুগলি-কামারপুকুর অঞ্চলের কয়েকটি মৌখিক ভাষার শব্দ রয়েছে, কিন্তু তাতে কথ্য বা চলিতরীতির কিছুমাত্র ক্ষতি বা বিকৃতি ঘটেনি। যেমন দিছল, নাই (নেই), যাই (যেই) ইত্যাদি। এই রকম : গিছিস, গিছি, গিছ্‌লো, গিছিল গিছ্‌লাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এটুকু আঞ্চলিকতা থাকলেও কথামৃতে রামকৃষ্ণের সমস্ত গল্পই চলিত রীতিতে ধরা হয়েছে বললে আপত্তি হবে না। কেন না, কলকাতার শিষ্টসমাজের যে কথ্যরূপটিকে চলিত রীতির আদর্শ নিদর্শন বলা হয়েছে, এ গদ্য তা থেকে আলাদা করা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ এখান থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে চলিত ভাষার পক্ষে 'বাংলা ভাষা' প্রবন্ধে তাঁর জোরালো মতামত তুলে ধরেন।

চলিত গদ্যে সংকলিত রামকৃষ্ণের গল্পগুলি, তা সে চার-ছ লাইনের হোক বা কুড়ি পঁচিশ লাইনের হোক সবগুলোই উত্‌রে গেছে। 'বুড়ো সাপের ফোঁস করা, মাহুত নারায়ণ বা রামের ইচ্ছা' গল্পগুলো তাঁর বড় মাপের গল্প। তুলনায় ছ-আট লাইনের গল্পগুলোর আয়তন ছোট বলে হীন মনে করার কোন ব্যাপার নেই। যেমন, নিষ্কাম কর্মের উদ্দেশ্য 'ঈশ্বর দর্শন' এটা বোঝাতে একটা গল্প বলেন :

'আরো এগিয়ে যাও। কাঠুরে কাট কাটতে গিছিল, ব্রহ্মচারী বল্লে, এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে দেখে চন্দনগাছ। আবার কিছু দিন পরে ভাবলে, তিনি এগিয়ে যেতে বলেছিলেন, চন্দন গাছ পর্যন্ত তো যেতে বলেন নাই। এগিয়ে গিয়ে দেখে রূপার খনি। আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে গিয়ে দেখে, সোনার খনি। তারপর কেবল হীরা, মাণিক। এই সব লয়ে একেবারে আণ্ডিল হয়ে গেল।'

(৩য় ভাগ, ১৫-১৬ পৃঃ)

গল্পটি এই পর্যন্ত। এর পর নীতি বা উপদেশের কথা বলা হয়। তা যাক। কিন্তু কি অনবদ্য গল্প। গভীর তার ব্যঞ্জনা। গল্পগুলির বড় বৈশিষ্ট্য এর বস্তুতান্ত্রিকতা। এইখানেই তাঁর সঙ্গে অন্য সব ধর্মগুরুর পার্থক্য। তিনি সন্ন্যাসী হলেও লোকজীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কোন পরিমাপ ছিল না। যেমন, এখানে কাঠুরের গল্প আরম্ভ করার আগে, তিনি নিষ্কাম কর্মসম্বন্ধে ঘরোয়া অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত দেখান, বলেন :

'কিন্তু যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাসা আসবে, ততই তোমার কর্ম কমে যাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয়—শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। যতই মাস বাড়ে, শাশুড়ী কর্ম কমায়। দশমাস হলে আদপে কর্ম করতে দেয় না, পাছে ছেলের কোন হানি হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়।'

(৩য় ভাগ, ১৫ পৃঃ)

শুধু ব্যাখ্যায় নয়, গল্পের মধ্যে দিয়েও আমরা বাস্তব জগৎকে খুঁজে পাই। কেউ কেউ এই কারণে রামকৃষ্ণের গল্পের মধ্যে কথাসাহিত্যের সন্ধান পান।[১]

তাঁর গল্পে ধর্মজগৎ বাস্তবজগৎ একাকার হয়ে আছে। অজস্র উপমা, অজস্র চরিত্র সহজ আটপৌরে ভাষায় ভাস্বর হয়ে রয়েছে। তিনি সাহিত্যিক নয়, সংসারীও ছিলেন না, অথচ কি আশ্চর্য অভিজ্ঞতার চোখ দিয়ে দেখেছেন বিচিত্রতর মানুষের চরিত্র, শুনিয়েছেন অসাধারণ সংসারী খুঁটিনাটির বিবরণ। তাতে দাসদাসীরাও আছে, বড়মানুষও রয়েছে। তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে গিন্নির ন্যাতাকাতার হাঁড়ির মত অনেক কিছুর সন্ধান পেয়ে যাই, যা অনেক গল্পকারেরও কল্পনাশক্তির বাইরে। 'কথামৃত' থেকে আমরা বস্তুরসে আপ্লুত কিছু চরিত্র উপমা ও শব্দ তুলে দিচ্ছি। যথা :

এক. 'বড় মানুষের বাড়ীতে দাসী সব কাজ করছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে, মনিবের ছেলেদের আপন ছেলের মত মানুষ করে বলে 'আমার রাম' 'আমার হরি', কিন্তু মনে মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।'

দুই. 'কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান? আড়ায় পড়ে আছে, যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।'

তিন. 'কিন্তু এই ভক্তিলাভ করতে হলে নির্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না।'

চার. 'তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এই সব নিয়ে খেলা করেন। বুড়ীকে আগে থাকতে ছুঁলে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন করে হয়? সকলেই ছুঁয়ে ফেললে বুড়ী অসন্তুষ্ট হয়। খেলা চললে বুড়ীর আহ্লাদ হয়।'

পাঁচ. 'মন যে রঙয়ে ছোপাবে সেই রঙে ছুপবে। যেমন, ধোবাঘরে কাপড় লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙয়ে ছোপাও সবুজ।'

ছয়. 'কোলকাতার লোক হুজুগে। এই এইখানটাই কুয়া খুঁড়ছে। বলে জল চাই। সেখানে পাথর হলো তো ছেড়ে দিল। আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ হল। এই রকম।'

সাত. 'উট কাঁটা কাঁটা ঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায় মুখ দিয়ে রক্ত দরদর করে পড়ে, তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না। সংসারীলোক এত শোকতাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমন।'

আট. 'ছোকরাদের অত ভালবাসি কেন জান? ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়—ঠাকুর সেবায় চলে।'...জোলো দুধ অনেক জ্বাল দিতে হয়—অনেক কাঠ পুড়ে যায়।'

ছোকরারা যেন নূতন হাঁড়ি-পাত্র ভাল-দুধ নিশ্চিন্তে রাখা যায়। তাদের জ্ঞানোপদেশে

১. বাংলা সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব, স্বামী নীলানন্দ।

শীঘ্র চৈতন্য হয়। বিষয়ীলোকদের শীঘ্র হয় না। দইপাতা হাঁড়িতে দুধ রাখলে ভয় হয়, পাছে নষ্ট হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গদ্যে কলকাতা-অঞ্চলের মুখের ভাষা যেমন পাই, কামারপুকুর অঞ্চলের কিছু উপাদানও পাই। ক্রিয়ার ব্যবহারে বেশি করে আঞ্চলিকতার পরিচয় মেলে। যেমন :

আঞ্চলিক ক্রিয়াপদ : গিছ্‌লো, গিছিলো, গিছিস, গিছি, কচ্ছিল, দিছ্‌ল, পাল্লাম ইত্যাদি।

অন্যান্য আঞ্চলিক শব্দ : ব্যামো, খপর, ইদিক উদিক, হাতচাপ্‌ড়ি, ভাতাররা, নকস, ভ্যাৎ ভ্যাৎ ইত্যাদি।

আবার অনেক সময় তাঁর ব্যবহৃত সরস আটপৌরে গদ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের শব্দ ব্যবহারেও কিছু কারিকুরি চোখে ধরে। যেমন : 'দেখ এর একটু উমের বেশী কিনা, তাই একটু গম্ভীর।'

এতে 'উমের' শব্দটি হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। এর অর্থ 'ওজন' বা 'বুদ্ধি' ইত্যাদি।

আবার 'নকস খেলা জান' 'নকস' (নক্‌সা) বলতে 'ছলাকলা' বোঝান হয়েছে। এই রকম 'লোকে মাগ ছেলের জন্য একঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে বল?' তখন 'ঘটি' শব্দ বিশেষণ হয়ে ভাষার ধার বাড়ায়। 'জটিলে কুটীলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না।' এখানে পোষ্টাই শব্দেও একই ক্ষমতা চোখে পড়ে।

আবার কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগেও শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্বতা চোখে ধরে। যেমন : 'দু চারটা ধপাঙ ধপাঙ করে জাল থেকে পালায়।' 'জেলে হড় হড় করে টেনে আড়ায় তুলবে।' 'দুধ কেমন না, ধোবো ধোবো'। 'যতক্ষণ কাঠে জ্বাল, দুধ ফোঁস করে ফোলে' ইত্যাদি। এখানে 'ধপাঙ ধপাঙ' মাছ পালানোর শব্দ, হড়হড় করে জালটানা, 'ধোবো', ধোবোয় দুধের 'ধবলত্ব' যেন চোখে ভেসে ওঠে। 'ফোঁস' করে দুধ উথলে ওঠার শব্দের মধ্যে যেন আরও নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে। এই রকম 'ছ্যাঁক কল্ কল্', 'তিড়িং মিড়িং' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৫.

স্বামী বিবেকানন্দ (৯ জানুয়ারি, ১৮৬২–৪ জুলাই, ১৯০২)

উনিশ শতকে নবজাগরণের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-সাধনার আন্দোলন কেবল ধর্ম-জগতে সীমাবদ্ধ ছিল না, বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রেও তা নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। ধর্ম সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি নানা জটিল বিষয়ে চলিত ভাষার সহজ ও সুন্দর প্রকাশ যে সম্ভব, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও বিবেকানন্দের রচনায় তা প্রমাণিত।[১]

পরাধীন ও দরিদ্র ভারতের গ্রামগঞ্জে ঘুরে বেড়িয়ে বিবেকানন্দ সাধারণ মানুষের সত্য পরিচয় লাভ করেন। তাঁর মত ঐ কালের আর কেউই সাধারণের এমন প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন নি। আর তার ফলে এদেশের দুর্দশার আসল কারণ যে শিক্ষার অভাব, সেকথা স্বামীজীর বার বার মনে হয়েছে। তাঁর পত্রাবলীতে তাই তিনি গণশিক্ষার কথা একাধিকবার আলোচনা করেছেন। প্রতিষ্ঠিত সাধুগদ্যের কালে চলিতরীতির প্রতি তাঁর একান্ত পক্ষপাতের কারণও সেই অভিজ্ঞতা তথা গণশিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি জাত।[২]

১. রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিভঙ্গী, ড জলধিকুমার সরকার, উদ্বোধন, ১৩৮৭ শারদ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২. বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য, ড. প্রণবরঞ্জন ঘোষ, ২৯ পৃঃ দ্রঃ।

'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে তাই তাঁকে পরিষ্কার করে বলতে শুনি : 'বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।'[১]

তিনি মনে করেন যে, কৃত্রিম বা কেতাবী ভাষার সঙ্গে সাধারণের যোগ কম। তাতে লেখা যায়, কিন্তু বলা বা ভাবা সোজা নয়। অতএব যা সহজ নয়, তাতে শক্তিও নেই। শক্তি আছে মুখের ভাষায়। যে ভাষায় আমরা চিন্তা ভাবনা শোক দুঃখ ভালবাসা জানাই, তাতে। তিনি তাই মন্তব্য করেন, 'ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও, সেদিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরি-ভাষা কোন কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে যেমন সাফ-ইস্পাত, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।'[২]

অতএব চলিত বা মৌখিক ভাষার শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সবল সুস্থ দেহমনের সঙ্গে শক্তিশালী ভাষার যোগ থাকে। তিনি বলেছেন, 'আহার, চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গিতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সবদিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে, সব ধমনীতে রক্ত প্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণ স্পন্দন অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবন-সংগ্রামে দেশের লোক Survive করতে পারবে।'[৩]

কত সহজ-বলিষ্ঠ যুক্তি! তেজস্বিতা, প্রাণ ও রক্তপ্রবাহ—যেমন দেহমনকে সবল করে, শক্তি যোগায়, ভাষার বেলাতেও সেই রকম গতি দরকার, শক্তি দরকার। শক্তি আছে প্রাণের ভাষায়, মুখের ভাষায়।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন অঞ্চলের মুখের ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে? প্রবন্ধকার তাও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, 'প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকাতার ভাষা।'[৪]

তিনি বলেন, রেল ব্যবস্থার উন্নতিতে দূর যখন কাছে সরে আসবে, লোকে একবার যখন কলকাতার ভাষা বলছে, সে আর তাকে ছাড়ছে না। কলকাতার ভাষা সেই কারণে ছড়িয়ে পড়ছে, তার সীমানা ছেড়ে। সে শক্তিশালী হচ্ছে। তাকেই প্রবন্ধকার সাহিত্যের বা লেখ্যভাষা করতে বলেন। বিবেকানন্দের এই বলিষ্ঠ যুক্তি এতকাল বাদে সত্যে পরিণত হয়েছে।

চলিত ভাষা নিয়ে এর আগে ১৮৭২ খৃস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে একটি প্রবন্ধে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু সেখানে কেবল মাত্র সাধুগদ্যের কাঠামোর মধ্যে আবশ্যক মত চলিত-উপাদান ব্যবহার করার উপরেই জোর দেন। অর্থাৎ তিনি চান, গদ্যে দুমুখো রীতি বজায় থাকুক! আর দূরদর্শী বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন মুখের ভাষা একদিন লেখার ভাষার স্থান নেবে।

তিনি বিশ্বাস করেন, 'স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায়

১. বাঙ্গালা ভাষা প্রবন্ধ, দ্রষ্টব্য।
২. ঐ
৩. বাণী ও রচনা, ৯ম, ৯৪ পৃঃ।
৪. বাঙ্গালা ভাষা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ক্রোধ-দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না।'[১]

সুতরাং দেখতে পেলাম চলিত ভাষার স্বপক্ষে বিবেকানন্দের বক্তব্য স্পষ্ট ও জোরালো। কারণ, 'দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই।'[২]

তিনি নিজে সাহিত্যিক নন। তবু তাঁর কয়েকটি রচনায় চলিত রীতিতে আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় মেলে। মাত্র ন-বছর তাঁর সাহিত্যিক-জীবন। তার আগেই তাঁর বক্তৃতা ও পত্রাবলী প্রকাশিত হয়। বক্তৃতাগুলো বেশির ভাগ ইংরাজিতে। বাংলা মৌলিক রচনা সে তুলনায় সামান্যই। এর মধ্যে কথ্যভাষায় লেখা গ্রন্থের সংখ্যা দুটি।

আলোচনার সুবিধার জন্যে কথ্যভাষার রচনাকে তিনটি ভাগে ভাগ করলাম, যথা—প্রবন্ধ, ভ্রমণ ও পত্র।

প্রথমত, প্রবন্ধ বলতে একটি মাত্র রচনা 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে লেখাটি 'ভাববার কথা' গ্রন্থের অন্তর্গত। বলা বাহুল্য, এর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের বাকি দুই রচনার কথ্যগদ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। 'ভাববার কথা' নামের লেখাটি আখ্যানমূলক এবং এটা ঠিক গল্পও না, প্রবন্ধও না, আলাদা জাতের রচনা। আখ্যানগুলোর ভাষাও এক একটার এক এক ধরন। যেমন, প্রথমটির ভাষা সাধু, বাকি গুলো চলিতে। কোথায়ও সাধুগন্ধী চলিত, কোথাও আরবি ফার্সির বোঝা, আর কোথাও অর্ধ-তৎসম তদ্ভব শব্দের আধিক্য।

আরবি-ফার্সি শব্দযুক্ত চলিতের একটা দৃষ্টান্ত দিলে এর প্রমাণ পাবো। যথা : 'সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফ-গাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সমেত লস্করী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবা কাবা চুস্ত-পায়জামা তাজ-মোড়াসার রঙ্গবেরঙ্গ সহরপসন্দ ঢঙ্গ অত দূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর সাহেবদের স্পর্শ করতে আজও পারেনি। কাজেই ঠাকুররা সরল-সিধে, সর্বদা শিকার করে জমামরদ কড়াজান আর বেশায় মজবুত দিল্।'

এসব ক্ষেত্রে লেখকের মুড বেশ হালকা। নিপুণ রসিকের মত। বিদেশি শব্দ এখানে বোঝা না হয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

'শিবের ভূত' একটি অসমাপ্ত ছোটগল্প। রচনাবলীর সম্পাদক জানিয়েছেন যে, স্বামীজীর দেহত্যাগের অনেক দিন পর তাঁর ঘরের কাগজপত্র গুছোবার কালে এটা পাওয়া যায়। গল্পের পটভূমি জার্মানি। শুরুটা এই রকম, 'জার্মানির এক জেলায় ব্যারণ 'ক'য়ের বাস। অভিজাতবংশে জাত ব্যারণ 'ক' তরুণ। যৌবনে উচ্চপদ, মান, ধন, বিদ্যা ও বিবিধ গুণের অধিকারী। যুবতী, সুন্দরী, বহুধনের অধিকারিণী, উচ্চকুল প্রসূতা অনেক মহিলা ব্যারণ 'ক'য়ের প্রণয়াভিলাষিণী। রূপে গুণে, মানে, বংশে, বিদ্যায়, বয়সে এমন জামাই পাবার জন্য কোন্ মা বাপের না অভিলাষ?'

এই-ই হচ্ছে আজকের সর্বজনীন চলিত। কলকাতার শিষ্ট-সমাজের ব্যবহৃত মুখের ভাষা। সংস্কৃত তৎসম ও সমাসবদ্ধ শব্দের এমন সমাবেশ আমাদের মুগ্ধ করে। ছোট ছোট বাক্য—একাধিক বিশেষণ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বড় কম। পাঠকের মন এক লহমায় গল্পের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

শেষটায় বলা হয়েছে : 'প্যারীসে মহাপ্রদর্শনী। নানাদিগ্দেশাগত গুণিমণ্ডলীর এখন প্যারীসে সমাবেশ; নানা দেশের কারুকার্য, শিল্পরচনা এখন প্যারীসে আজ কেন্দ্রীভূত। সে

---

১. বাঙ্গালা ভাষা।
২. ঐ

আনন্দতরঙ্গের আঘাতে শোকেজড়ীকৃতহৃদয় আবার স্বাভাবিক বেগবান স্বাস্থ্য লাভ করবে, মন দুঃখচিন্তা ছেড়ে বিবিধ আনন্দজনক চিন্তায় আকৃষ্ট হবে—এই আশায় আত্মীয়দের পরামর্শে বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে ব্যারণ 'ক' প্যারীসে যাত্রা করলেন।'...

রচনাটির রচনাকাল জানা যায়নি। তবু অনুমান করা যায়, 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটির কাল থেকে দেহত্যাগের মধ্যেকার কোন এক সময়ের রচনা। ভাষার আদল একেবারে আধুনিক। গল্পে-উপন্যাসে-প্রবন্ধে আজকের দিনে চালু রয়েছে এই ভাষার রূপটি। কতদিন আগেই বিবেকানন্দের কলমে আত্মপ্রকাশ করেছে দেখে আমরা অবাক হই। আমাদের দুর্ভাগ্য, এই অসমাপ্ত গল্পে, শক্তিমান কথাশিল্পী বিবেকানন্দের একটা ছবি ফুটে উঠতে উঠতে চিরকালের মত থেমে গেল।

১৮৯৯ খৃঃ ২০ জুন স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতা থেকে গোলকোণ্ডা জাহাজে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে বিবেকানন্দ নিয়মিতভাবে তাঁর ভ্রমণকথা লিখে পাঠাতে সম্মত হন। পত্রধারায় লিখিত সেই কাহিনী, 'উদ্বোধন'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় 'বিলাতযাত্রীর পত্র' নামে ছাপা হতে থাকে। তারপর তৃতীয় বর্ষের (১৩০৭-৮) প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যা থেকে 'পরিব্রাজক' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। শেষে ১৩১২ সনে স্বামী সারদানন্দের প্রযত্নে বই হয়ে 'পরিব্রাজক' নামেই আত্মপ্রকাশ করে।

'পরিব্রাজক' জলপথে কলকাতা থেকে ইউরোপের নানাদেশে যাত্রার কাহিনী। কাহিনীর কেন্দ্রীয় পাত্র প্রবন্ধকার নিজে। ভ্রমণকাহিনী বলতে সচরাচর কিছু ভৌগোলিক বিবরণ ও চোখে-দেখা দেশগুলোর সাদামাটা বর্ণনার কথা মনে আসে। 'পরিব্রাজক' সে তুলনায় ভিন্ন জাতের বই। এতে ভৌগোলিক বিবরণ তো আছেই, তার সঙ্গে সেসব দেশের মর্মদেশ পর্যন্ত ভেদ করার বৃত্তান্ত আছে। ধর্ম, ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি, শিল্প, স্বাস্থ্য এমন কী রাষ্ট্রীয় কাঠামো পর্যন্ত প্রবন্ধকার নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। আর তার সঙ্গে কোথায় আমাদের দেশের মিল, কোথায় অমিল, কাদের কি সমস্যা, সমাধানই বা কোথায় সব কথা ঝরঝরে চলিত গদ্যে বলেছেন। অথচ তা তথ্যভারে ক্লান্তিকর নয়।

'পরিব্রাজকের' সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এর পরিবেশন-নৈপুণ্য। প্রবন্ধকার যখন যে প্রসঙ্গের অবতারণা করেন, সরসতায় তা-ই আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে এমন একটা ভ্রমণ কথা বিবেকানন্দের মতো একজন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর কলমে বেরিয়েছে, সে কথা ভাবতে অবাক লাগে।

আগাগোড়া ঝরঝরে শ্রুতিমধুর মুখের ভাষায় এই জাতীয় রচনা, ইতিপূর্বে এক রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' ও 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরী'[১] এই দুই ভ্রমণকাহিনী ছাড়া সমসাময়িক কালের আর কারও হাত দিয়ে প্রকাশিত হয়নি। তবে রূপ ও ভাবনায় বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে অনেক দিক দিয়ে মিল হলেও বিবেকানন্দের অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা তখনও রবীন্দ্রনাথে অনুপস্থিত। সেদিক থেকে 'পরিব্রাজক' অদ্বিতীয় ভ্রমণ কথা।

বরং বিবেকানন্দের এই গ্রন্থের মেজাজের সঙ্গে বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তরের'[২] মিল

---

১ ১৮৯১ খৃস্টাব্দে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, ১৮৯৩ খৃঃ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরী আত্মপ্রকাশ করে।

বেশি। কেননা, এখানে বিবেকানন্দের মুড্ অনেক হাল্কা, খোসমেজাজী, রসিক ও আলাপচারী। যেন সম্পাদকের সঙ্গে মুখোমুখি বসে রসের নাগরি খুলে দিয়েছেন। একটু পরে নাগরির মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তখন নানা তথ্য ও তত্ত্ব নিয়ে পড়েছেন। কিন্তু হাসিটা মিলিয়ে যায় না। এই পর্যায়ে লেখক একটু সিরিয়াস, কিন্তু গোমড়ামুখো নন। কেননা, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব কিংবা নিছক প্রাকৃতিক বর্ণনায় আমরা কোথাও এতটুকু বিরক্ত হই না। এইখানেই 'পরিব্রাজকের' বড় গুণ।

এই জাতীয় রসনানিপুণ ভ্রমণবৃত্তান্ত সাধুগদ্যে লেখা সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। 'পরিব্রাজকের' কথ্যভাষার সার্থকতা এখানে। তবে শেষের দিকে তথ্যভার সরসতাকে একটু ম্লান করে ফেলেছে। তাতে মনে হয়, লেখক কোন কারণে লেখার পালা খুব তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে চান। সেখানে লেখকের মুড্ অনেকটা গাইডের মতো। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমরা পরিব্রাজকের ভাষারূপের পরিচয় নিতে পারি। যথা :

'খাবার সময় সে শত ছোরার চক্‌চকানি আর শত কাঁটার ঠক্‌ঠকানি দেখে শুনে তু-ভায়ার তো আক্‌কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ছুরিখানা তাঁরই গায়ে বা বসায়—ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা। বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র-পার হতে হনুমানের সী-সিকনেস হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছো? তোমরা পোড়ো-পণ্ডিত মানুষ, বাল্মীকি-আল্মীকি কত জান; আমাদের গোঁসাইজী তো কিছুই বলছেন না।'

আরম্ভটা অনেকটা 'কমলাকান্তের দপ্তরের' কথা মনে করিয়ে দেয়। শব্দ-ব্যবহারে কোথাও এতটুকু জড়তা নেই। ইচ্ছেমত বাংলা ইডিয়াম ভাষায় ফুল ফুটিয়েছে। পড়তে পড়তে 'শত ছোরার চক্‌চকানি' ও 'শত কাঁটার ঠক্‌ঠকানির' শব্দ আমরাও পাই। আবার মাঝে Sea-Sickness জাতীয়শব্দ মোটেও বেমানান ঠেকে না।

আবার বড় বড় বলশালী শব্দ কোথাও বা ব্যবহৃত হয়ে এ ভাষার বলবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। তার একটা দৃষ্টান্ত :

'কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চিরনীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত, পর্বত শিখর, উত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গকল্লোলশালী কত বারিনিধি দেখলুম, শুনলুম, ডিঙ্গুলুম, পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম-ঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে—কিংবা পানের পিক-বিচিত্রিত দ্যালে, টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে আঁব কাঠের তক্তায় বসে, থেলো হুঁকো টানতে টানতে কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে-হুবহু ছবিগুলি চিত্রিত করে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেছেন, সেদিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা।'

দেখতে পাচ্ছি, চলিত গদ্যের আশ্চর্য শোষণক্ষমতা। চিরনীহারমণ্ডিত, মেঘমেখলিত, উত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গকল্লোলশালী প্রভৃতি সমাসবদ্ধ বড় বড় শব্দের পাশে পাশে লেখক সুনিপুণভাবে আবার ট্রাম-ঘড়ঘড়ায়িত, পানের পিকবিচিত্রিত দ্যাল, টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো মুখরিত শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। এমনকি পরিব্রাজকের ভাষায় সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী, পুঞ্জীকৃত-ভাবরূপস্থিরসৌদামিনী জাতীয় শব্দও মিলবে। যেখানে যেমন সেখানে তেমন শব্দের প্রয়োগ দেখিয়ে চলিত গদ্যে স্বামীজী আপন কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সেইখানেই আবার আটপৌরে ভাষার অজস্র শব্দ অবিকৃতভাবে গদ্যে স্থান করে দেন। যেমন--সোঁদবনন, পোড়ো (পোড়ুয়া), কলকেতা, ওছুল পাছুল, আঁব কাঠের দ্যাল, শোর, নিবুতে, হিঁদু, এগুচ্ছেন, লুকুচ্ছিল, চিবুচ্ছে, কেলাস, পাঁটা চড়ছে ইত্যাদি। আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় এগুলোকে 'কলকাতার কক্‌নি' বলে চিহ্নিত করেছেন।[১]

আবার জাহাজ যখন সমুদ্রে পড়ে, তখন সেই জলরাজ্যের বর্ণনায় আমরা যেন কবি কালিদাসের 'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্যতন্বীতমালতালীবনরাজিনীলা' ইত্যাদি সেই শ্লোক বর্ণিত ধ্বনিই শুনতে পাই। আমরা যেন এখানে বিবেকানন্দের কবিমানসকেই খুঁজে পাই। তিনি বলছেন :

'কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘননীলজলতরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই গঙ্গাফেনমিতা জটাপশুপতেঃ। সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের, একবার কালো জলের উপর উঠছে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ-আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটি কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল, আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী ; মহাগর্জন বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস্য, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে!'

প্রাবন্ধিক বিবেকানন্দের সঙ্গে কবি বিবেকানন্দের এখানে একাকার হতে দেখি। তার সঙ্গে মিলিত হন ভারতবিদ্ স্বামীজী। রচনার মধ্যে মধ্যে তাই উঁকি মারে পুরাণকথা। কোথাও বা কবিপ্রকৃতিই নিসর্গ-সৌন্দর্যের প্রেমে আত্মলীন হয়ে যায়। তখন শুনি, 'জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময় মুসলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল নারিকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদেকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ--এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার--বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ করলে সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল নারিকেল, খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ চামরের মতো হেলছে'...।

বর্ণনার গুণে বর্ণনীয় বিষয় আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। এত জীবন্ত, এত নিখুঁত, সাধুগদ্যে সম্ভব হোত কিনা জানা নেই।[২]

আবার পরক্ষণেই ইতিহাসবেত্তা বা নৃতত্ত্ববিদের ভূমিকায় মানচিত্রের দিকে ছড়ি ঘুরিয়ে যেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন : 'স্বামীজী! দেশ, নদী, পাহাড় সমুদ্রের কথাতো অনেক শুনলে, এখন প্রাচীন কাহিনী কিছু শোন। এ প্রাচীন কাহিনী বড় অদ্ভুত। গল্প নয় সত্য ; মানব জাতির যথার্থ ইতিহাস।...এখন পুরানো পাথর, বাড়ী, ঘর, টালিতে লেখা পুঁথি, আর ভাষাবিশ্লেষ শতমুখে গল্প করছে। এ গল্প এখন সবে আরম্ভ হয়েছে, এখনই কত আশ্চর্য

১. স্বামীজীর বাংলা রচনা, উদ্বোধন, শারদীয়া সংখ্যা।

২. 'বঙ্গভাষা যে অত অল্পায়তনে অত অধিক ভাবরাশি প্রকাশে সমর্থ, ইহা আমরা পূর্বে আর কোথাও দেখি নাই। পদলালিত্যেও অনেক স্থানে বিশেষ বিকশিত।' বর্তমান ভারত, স্বামী সারদানন্দের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কথা বেরিয়ে পড়েছে, পরে কি বেরুবে কে জানে ঃ দেশ দেশান্তরের মহামহা পণ্ডিত দিনরাত এক টুকরো শিলালেখ বা ভাঙ্গা বাসন বা একটা বাড়ী বা একখান টালি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, আর সেকালের লুপ্ত বার্তা বার করছেন।'

প্রাচীন ইতিহাসের আধুনিক গবেষকদের জটিল কর্মপদ্ধতির নিখুঁত বিবরণ, কত সহজ ভাষায় বিবেকানন্দ আমাদের কাছে হাজির করেছেন, এখানে তারই প্রমাণ পাই।

এইভাবে গোটা 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে স্বামীজী, শক্তিশালী চলিত ভাষায় পাশ্চাত্য দুনিয়ার খবর লিখে গেছেন। সে ভাষায় যেমন সংস্কৃত তৎসম সমাসবদ্ধ, বড় বড় শব্দও দেখি, তেমনি আঞ্চলিক বা মৌখিক, দেশি-বিদেশি শব্দও প্রচুর পাই। ইতিপূর্বে সংস্কৃত তৎসম ও বড় বড় শব্দ প্রয়োগের প্রমাণ পেয়েছি। নীচে কিছু দেশি-বিদেশি ও মৌখিক ভাষার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা :

'মাফ ফরমাইয়ে ভাই—ভাল লোককে কাজের ভার দিয়েছো। রামকহো', 'ট্রাম ঘড়ঘড়ায়িত', 'আসল গরুখেকো নেড়ে', 'হাই-সী', 'কোলকেত্তাই চাকর নয়া রোশনাই পেয়েছে', 'সে নেটিভি পা-চাটা ভাব', 'কেলাস' প্রভৃতি। 'নেটিভ'-ইংরাজি শব্দ এখানে 'পায়ের' বিশেষণ রূপে 'নেটিভি' সৃষ্টিতে আমরা মুগ্ধ হই।

সময় সময় স্বামীজী এতে পুরোনো কলকাতার ভাষাও ব্যবহার করেছেন। যেমন, ওছল পাছল, আঁব কাঠের, লোহার দেল (দেয়াল), দ্যালে (দেয়ালে), শোর (শুয়োর), কলকেতার প্রভৃতি। এগুলোকে 'কলকাতার ককনি' বলে।[১]

'উদ্বোধন' পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষ ১৩০৬-০৮ সাল থেকে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ধারাবাহিক ছাপা হয়। 'পরিব্রাজকের' কিছু পর থেকে প্রথমে ছাপা হতে থাকে পরে একসঙ্গে বেরোয়। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে দিয়ে চিন্তাধারার সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা স্বামীজীর রচনাবলীর একটা প্রধান সুর। সহজ চলিত গদ্যে এতে সেই চিন্তা-রাশিকেই সংহত সামগ্রিক আকার দান করেন। বিষয়-বিশ্লেষণ ও ভাবনৈপুণ্যের বিচারে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বাংলা গদ্যসাহিত্যের একটা বিস্ময়কর কীর্তি। এতে লেখকের গভীর মনস্বিতা ও ভুয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় রয়েছে।

গ্রন্থটির মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের নানা ধর্ম, জাতি এবং তাদের শিল্প-ব্যবসায়, আচার আচরণ, পোশাক-ফ্যাসন, আহার ও পানীয়, রীতি-নীতি, পুজো থেকে শুরু করে পরিণাম-বাদ, সমাজের ক্রমবিকাশ, পুরানো ইউরোপীয় জাতিদের সংঘাত এবং সবশেষে দুই সভ্যতার তুলনা। সব কিছুই তিনি এত খুঁটিয়ে দেখেছেন ও আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন যা ইতিপূর্বে এমন করে সম্পূর্ণভাবে এর আগে কেউ বলেন নি।

'পরিব্রাজকে' লেখকের মুড্ ছিল প্রথমে হাল্কা, পরে কিছু গম্ভীর মুখে একটুকরো হাসি। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে হাসিও আছে, গাম্ভীর্যও আছে। তবে আরও উজ্জ্বল, আরও সতেজ। কারণ এখানে লেখকের ভূমিকা একজন দার্শনিকের ও শিক্ষকের। শিক্ষকের মতো তিনি দুই সভ্যতার বহু জটিল তত্ত্ব সাধারণের মুখের ভাষায় সহজ করে বুঝিয়েছেন। বলা যেতে পারে 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের পরিপূরক 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। 'পরিব্রাজক' ভ্রমণ, আর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' মনন। স্বামীজীর ভাষায় : 'ইউরোপ সম্বন্ধে, তোমাদের তো নানা কথা শোনা আছে,—তারা

১. ড. সুকুমার সেন. উদ্বোধন, শারদ সংখ্যা ১৩৮৭, পৃঃ ৪৫০।

কি খায়, কি পরে, কি রীতি-নীতি আচার ইত্যাদি! তা আব আমি কি বলবো। তবে ইউরোপী সভ্যতা কি, এর উৎপত্তি কোথায়, আমাদের সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ, এ সভ্যতার কতটুকু আমাদের লওয়া উচিত--এ সব সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার রইল।'[১] সেই 'অসমাপ্ত অনেক কথা'-ই 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'।

বর্ণনীয় বিষয় তা সে নারী বা পুরুষ যার বিষয় হোক না কেন, লেখায় কোথাও কোন জড়তা নেই। যেমনি এর বিষয়, তেমনি এর ভাষা। বরং চলিত ব্যবহারের দিক দিয়ে 'পরিব্রাজকের' চেয়ে এতে লেখক আর এক ধাপ এগিয়ে এসেছেন তদ্ভব শব্দ, আটপৌরে কথ্যশব্দের ব্যবহার বাড়িয়ে। ভাষা দিয়ে শব্দ দিয়ে বিষয়কে ছবির মত ফুটিয়ে তুলেছেন, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের' গদ্যের বিশেষত্ব এখানে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা বিবেকানন্দের আলোচ্য গ্রন্থের ভাবারীতির পরিচয় নিতে পারি। যথা :

'ঠাণ্ডা দেশে সর্দি লাগবার সদাই সম্ভাবনা; গরম দেশে খেতে বসে ঢক্ ঢক্ জল। এরা কাজেই না হেঁচে যায় কোথা, আমরা ঢেঁকুর না তুলেই বা যাই কোথা? এখন দেখ নিয়ম এ দেশে খেতে বসে যদি ঢেঁকুর তুলেছ, তো সে বেয়াদপির আর পার নেই। কিন্তু রুমাল বার করে তাতে ভড় ভড় করে সিকনি ঝাড়ো, এদের তায় ঘেন্না হয় না। আমাদের ঢেঁকুর না তুললে নিমন্ত্রক খুশীই হন না; কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে খেতে খেতে ভড় ভড় করে সিকনি ঝাড়াটা কেমন?' (রীতিনীতি)

কত সহজ ভাষায় দুটো জাতির আচার ব্যবহারের তফাৎটা তুলে ধরেছেন। বলার মধ্যেও রাখঢাক নেই। ভড় ভড় করে সিকনি ঝাড়া থেকে শুরু করে হাঁচি, ঢেঁকুর কিছুই বাদ দেননি।

আবার হাতে পয়সা এলে এদেশ আর ওদেশের লোকে ছেলেমেয়েদের খাবার দাবারে কি পার্থক্য করে লেখক তাও কটাক্ষ করে বলেছেন। যথা :

'যার দু' পয়সা আছে আমাদের দেশে, সে ছেলেপিলেগুলোকে নিত্য কচুরি মণ্ডা মেঠাই খাওয়াবে। ভাতরুটি খাওয়া অপমান! এতে ছেলেপিলেগুলো নড়ে-ভোলা পেটমোটা আসল জানোয়ার হবে নাতো কি? এত বড় ষণ্ডাজাত ইংরেজ, এরা ভাজাভুজি মেঠাই মণ্ডার নামে ভয় খায়, যাদের বরফান দেশে বাস, দিনরাত কসরত! আর আমাদের অগ্নিকুণ্ডে বাস, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে নড়ে বসতে চায়নি, আর আহার লুচি কচুরি মেঠাই—ঘিয়ে ভাজা, তেলেভাজা!! সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এককথায় দশ ক্রোশ হেঁটে দিত, দুকুড়ি কইমাছ কাঁটাসুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, ১০০ বৎসর বাঁচত। তাদের ছেলেপিলেগুলো কলকেতায় আসে, চশমা চোখে দেয়, লুচি কচুরি খায়, দিনরাত গাড়ী চড়ে, আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মরে, কলকেত্তাই হওয়ার এই ফল!!' (আহার ও পানীয়)

তৎসম, সংস্কৃত ও সমাসবদ্ধ শব্দ প্রায় অনুপস্থিত বল্লেই চলে। মুখের ভাষার বাক্‌রীতির ব্যবহার এখানে বেড়েছে। ড. প্রণবরঞ্জন ঘোষ বলেছেন, 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' দুই গ্রন্থেরই ভাবাশৈলী মোটামুটি এক। তবু পরিব্রাজকের ভাষায় তৎসম শব্দ বা সমাসবদ্ধ পদের বাহুল্য, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' এসে স্বামীজীর চলিত ভাষা স্বচ্ছন্দ দেশজ শব্দ ও

১. বাণী ও রচনা, (পরিব্রাজক) ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১৭ পৃঃ।

রীতিতে সমৃদ্ধ, পাঠক ও লেখকের অন্তরঙ্গতাও গভীরতর।'[১]

এখন তাঁর এই গদ্য থেকে দেশজ ও আটপৌরে শব্দপ্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় নেওয়া যাক। যথা :

ভেড়িয়া-ধসান (গড্ডালিকা প্রবাহ), নেড়িকুত্তার খেয়োখেয়ী, সাজন্ত (সাজা), সেঁধুচ্চে, বিষলড্ডক, তেলক, বাকিচচ্চড়ি, সাপড়ান (খায়), গরমিকাল, দৌড়ুল প্রভৃতি।

শব্দদ্বিত্ব ঃ ফিলটার মিলটার, ডাক্তার বদ্দি, নেবু টেবু, উপাধি-টুপাধি, মেয়ে-মদ্দে, ঘড়ি-ঘড়ি বদলাচ্ছে প্রভৃতি।

বাংলা প্রবাদ ভাষার আর একটা আকর্ষণ। যেমন—বল, বুদ্ধি, ভরসা তিন পেরুলেই ফরসা ; উলটা সমঝলি রাম ; যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি ; দেখতোর, না দেখ মোর, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি ইত্যাদি।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীও বাংলা ভাষার সম্পদ। সেগুলির মধ্যে আবিষ্কারক বিবেকানন্দের পরিচয় মেলে, পরিব্রাজক বিবেকানন্দের সন্ধান পাই। দেশ ও জাতির সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ প্রবাসী-স্বামীজীর বহু ভাললাগা মন্দলাগার কথা পাই। সব ছাড়িয়ে তিনি যে একটা মানুষ, সেকথাও পত্রগুলোর মূল সুর। গদ্যের ইতিহাসে তাদের গুরুত্ব কম নয়।

পত্রাবলীতে মোট পত্রসংখ্যা ৫৭৬ খানি। এর মধ্যে বাংলা ১৫৩, সংস্কৃত ৩টি এবং ৪১৮ খানিই ইংরাজি ও ২টি ফরাসি ভাষায় লেখা থেকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে ছাপা।[২]

বাংলা পত্রের সংখ্যা ১৫৩-এর মধ্যে ১০০টির ভাষা সাধু। বাকি চলিত বা সাধুমিশ্রিত চলিত। আবার সাধুভাষার পত্রের মধ্যে এক আধটা চলিত ক্রিয়ার দেখা মেলে। তেমনি চলিত ভাষার পত্রগুলোর মধ্যেও উল্টোটির সন্ধান পাই।

কিছু এমন পত্র আছে যেগুলোর শুরু সাধুতে শেষ চলিতরীতিতে।[৩] তবে পত্রগুলোর গদ্যরূপ সমীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, ১৮৯৭ খৃঃ পর থেকে চলিতরূপ স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিয়েছে। প্রথম চলিত ব্যবহার ১৮৯৪ খৃঃ থেকে।[৪] এর প্রথম দুটি বাক্য কেবল সাধুতে লেখা।

ভাষার এই রীতি-বিপর্যয় দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পত্র লেখকের ভাষার চেয়ে বিষয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল বেশি। কিন্তু শেষ দিককার পত্রে পত্র-লেখকের ভাষার প্রতিও লক্ষ্য ছিল। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমরা তার প্রমাণ নিতে পারি। যেমন, 'আমার বহুত চিঠি লেখবার সময় বড় একটা হয় না। Lecture ফেকচার (বক্তৃতা) তো কিছু লিখে দিই না, একটা লিখে দিয়েছিলুম, যা ছাপিয়েছে। বাকি সব দাঁড়াঝাঁপ যা মুখে আসে গুরুদেব জুটিয়ে দেন। কাগজপত্রের সঙ্গে সম্বন্ধই নাই। একবার ডেট্রয়েটে

১. বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য ৪২৮-৪২০ পৃঃ।
২. স্বামীজীর বাংলা রচনা, ড. সুকুমার সেন, উদ্বোধন শারদীয় ১৩৮৭ সংখ্যা দ্রঃ।
৩. ঐ, ৪৫০ পৃঃ।
৪. বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠখণ্ড, ১০২ নং পত্র দ্রঃ।

তিনঘণ্টা ঝাড়া বুলি ঝেড়ে ছিলুম। আমি নিজে অবাক হয়ে যাই সময়ে সময়ে; 'মাধো, তোর পেটে এতও ছিল!!' এরা সব বলে, পুঁথি লেখ; একটা এইবার লিখতে ফিকতে হবে দেখছি। ঐ তো মুসকিল, কাগজ কলম নিয়ে কে হাঙ্গামা করে বাবা।'[১]

(১৮৯৪ খৃঃ)

শ্বাস-প্রশ্বাসের মত পত্র লেখকের কলম দিয়ে এই গদ্য বেরিয়েছে। ঝরঝরে যেমন এর ভাষা, তেমনি এর শব্দচয়ননৈপুণ্য। বড় বড় শব্দ নেই। তৎসম ও সংস্কৃত শব্দের অত আড়ম্বরও নেই। সহজ-সাধারণ কথাবার্তার ভাষা এখানে দেখতে পাই।

আবার শেষ দিককার একটা পত্র থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা : 'আমি এখন কিছু দিন অজ্ঞাতবাস করছি। ফরাসীদের সঙ্গে থাকব তাদের ভাষা শিখবার জন্য। একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে, অর্থাৎ ট্রাস্ট-ডীড্ ফিড্ সই করে কলকাতায় পাঠিয়েছি; আমার আর কোন সত্ব বা অধিকার রাখি নাই। তোমরা এখন সকল বিষয়ে মালিক, প্রভুর কৃপায় সকল কাজ করে নেবে।

আমার আর ঘুরে ঘুরে মরতে ইচ্ছা বড় নাই। এখন কোথাও বসে পুঁথিপাটা নিয়ে কালক্ষেপ করাই যেন উদ্দেশ্য।

ফরাসী ভাষাটা কতক আয়ত্ত হয়েছে, কিন্তু দু-একবার তাদের সঙ্গে বসবাস করলে বেশ কথাবার্তা কইতে অধিকার জন্মাবে।'[২]

এ গদ্যের সঙ্গে 'বাঙ্গালা ভাষা'[৩] প্রবন্ধের ভাষারীতির কোন পার্থক্য নেই। বরং অনুমান করতে পারা যায় স্বামীজীর গদ্যরীতির গতি কোন দিকে এগোচ্ছিল। তাঁর এই সব পত্রের শক্তিবৃদ্ধি করেছে অজস্র আটপৌরে বাক্‌বিধি। যেমন : চেলা, বিদ্যে-সাদ্যি, আগ বাড়িয়ে, ফলানা জায়গায় (বাজে), পুঁথি—পাত্ড়া, পুঁথিপাটা, চোখ খুলে দাও, গরীব-গুব্‌রো, শুধু ঘণ্টানাড়া (পুঁথিগত বিদ্যা), করে কর্মে নাও, ঠাউরে, নেপালওয়ালা (নেপালী)।

৬.

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)

বঙ্কিমচন্দ্রের কালে বঙ্কিম-অনুসারী বাংলা লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ স্বকীয়তায় বিশিষ্ট হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথা সবার আগে মনে আসে। তিনি ১৮৫৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯৩১ খৃঃ পরলোক গমন করেন (বাং ১২৬০, ২২ অগ্রহায়ণ ও ১৩৩৮, ১লা অগ্রহায়ণ)। এই দীর্ঘ আটাত্তর বছর ধরে তাঁর জীবনকালে এদেশে ধীরে ধীরে একটা সাংস্কৃতিক ক্রান্তি বা যুগান্তর ঘটে যায়।[৪]

একদা এদেশের রাজভাষা ছিল ফার্সি। তখন লোকে ইচ্ছে করে ফার্সি শিখত। ইংরেজ আসার পরে রাজভাষা হল ইংরাজি। ফারসি ছেড়ে লোকের মধ্যে তখন ইংরাজি শেখার আগ্রহ জাগে। কিন্তু তারপরেও এদেশে মধ্যযুগীয় প্রথায় সংস্কারধারা বজায় থাকে। এক সময় যুক্তিবাদী চিন্তার আলোকে আধুনিক সংস্কৃত-শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করলেন বিদ্যাসাগর

১. বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০২ নং পত্র (১৮৯৪ খৃঃ)।
২. বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ৫০৭ নং পত্র দ্রঃ (১ সেপ্টেম্বর ১৯০০)।
৩. ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯০০ সালে 'উদ্বোধন' সম্পাদককে লিখিত পত্র ঐ নামে ছাপা হয়।
৪. হরপ্রসাদ রচনাবলী (১ম সম্ভার), ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা দ্রঃ।

মশাই। তবু টোল-চতুষ্পাঠীর ধারা টিমটিম করেও টিকে থাকে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ওই ধারায় লালিত নৈহাটির একটি প্রাচীন 'বিদ্যাজীবী' বংশের সন্তান। কিন্তু সেখান থেকেও আধুনিক যুক্তিবাদী শিক্ষায় নিজেকে গড়ে নিতে কিছুমাত্র বেগ পাননি। কারণ তাঁর পারিবারিক ছকটা বদলে গিয়ে তাঁর পথটা সুগম করে তোলে। তাঁর বড়দা নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু—কান্দীর স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন। পরিবারে ওই দাদা থেকেই প্রথম ইংরাজি শিক্ষার যোগাযোগ ঘটে। মেজো ও সেজদাদা—রঘুনাথ ও যদুনাথ সংস্কৃত বিদ্যার সঙ্গে সংস্রব রাখেননি। ইংরেজি ভাষায় দক্ষ রঘুনাথ কিছুকাল কবি মধুসূদন দত্তের লিপিকরের কাজ করেন। পরে তাঁরা অন্য জীবিকার সন্ধানে বাংলার বাইরে চলে যান। ছোট ভাই মেঘনাথ জয়পুর মহারাজা কলেজে অঙ্কের অধ্যাপক ও উপাধ্যক্ষ ছিলেন।[১]

এই পটভূমিতে হরপ্রসাদ ছিলেন একেবারে ব্যতিক্রম। আধুনিককে আহ্বান ও পুরাতনকে বর্জন না করে, দুটোর মধ্যে একটা আপোষ করে নেন। কলেজী ধারায় সংস্কৃত শিক্ষার পাঠ ও ইংরেজি শিক্ষা, এক সঙ্গেই চালান। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করেন, 'বহু পণ্ডিত ঘরের কিশোর ও যুবকদের মত তিনি শিক্ষা-বিষয়ে সব্যসাচী হইয়াছিলেন। সংস্কৃত চর্চা তিনি কখনও ছাড়েন নাই, এবং সংস্কৃত কলেজে একই সঙ্গে এফ. এ. পরীক্ষা পাঠের সহিত সংস্কৃত পাঠও গ্রহণ করেন।'[২]

পরবর্তীকালে তিনি সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, সংস্কৃত বাঙ্ময়, বাংলা সাহিত্য—এমন কি বাঙালি ঘরের ছোট ছোট ঘরোয়া বিষয়কে নিয়েও নিবন্ধ লিখে এদেশের চিন্তা-জগতে যুগান্তর আনেন এবং সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাই মন্তব্য করেন, 'তিনি ছিলেন অন্যতম যুগনেতা, আধুনিক বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর মানসিক সংস্কৃতির তিনি ছিলেন প্রধান পরিচালক'।[৩]

বাঙালি পাঠকের কাছে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান বাংলা সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন 'চর্যাপদের' আবিষ্কার। এই একমাত্র পুঁথিটির আবিষ্কার করে তিনি বাংলা সাহিত্যের আদিম পর্বের ভিত রচনা করে দেন।

বঙ্কিম-সান্নিধ্য লাভের পর তিনি যখন বাংলা গদ্য লিখতে শুরু করেন, তখন ছিল প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্রের তৎসম ও সমাসবদ্ধ শব্দবহুল সাধুগদ্যের ভরা যৌবন। পরবর্তীকালে স্বকীয় রীতিতে শাস্ত্রীমশাই বাংলা গদ্য লিখেছেন, তখন ছিল যুবক-কবি রবীন্দ্রনাথের সরল সাধুগদ্যের পালে হাওয়া লাগার কাল। মাঝখানে একক দ্বীপের মত হরপ্রসাদের প্রবেশ ও প্রস্থান। তাঁর গদ্যে তাই আমরা পরিষ্কার দুটো স্তর লক্ষ্য করি। যথা : (ক) বঙ্কিম-প্রভাবিত সাধুগদ্য এবং (খ) চলিতাশ্রয়ী-স্বকীয় সাধুরীতি।

প্রথম স্তরে গতানুগতিকতা ও দ্বিতীয় স্তরে প্রতিষ্ঠা। তাঁর নিজস্ব স্টাইল বা গদ্যভঙ্গিরও শুরু শেষ পর্ব থেকে। সমালোচক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেন যে, আজ পর্যন্ত যেসব স্বকীয় রীতির উদ্ভব হয়েছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষা তাঁদের অন্যতম। 'বিষয়ী লোকের রীতি তার বনিয়াদ, বঙ্কিমীরীতি তার আদর্শ, কিন্তু পরিণত ফলশ্রুতি একান্তভাবে হরপ্রসাদীয়।'[৪]

১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (১ম খণ্ড), ড. সত্যজিৎ চৌধুরী ইত্যাদি সম্পাদনা, ৩০ পৃঃ দ্রঃ।
২. হরপ্রসাদ রচনাবলী, ১ম সম্ভার, ভূমিকা।
৩. ঐ
৪. বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, ১২৮-১২৯ পৃঃ দ্রঃ।

এই হরপ্রসাদীয় রীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রথমত, এর ক্রিয়াপদগুলো সংক্ষিপ্ত নয়। কোথাও বা বাক্যে ক্রিয়াপদই নেই। দ্বিতীয়ত, বাক্যের বিন্যাসে স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাসের বেশি জোর প্রয়োজন হয় না। তৃতীয়ত, সংস্কৃত-তৎসম, দেশি-বিদেশি-চল-অতিচল শব্দ এতটা সুপ্রযুক্ত যে কানে বাজে না। আলাল ও বীরবলের গদ্যও এই তুলনায় কৃত্রিম মনে হয়। 'খাঁটি সংস্কৃতের সঙ্গে খাঁটি দেশির মেলবন্ধন সামান্য প্রতিভার লক্ষণ নয়। মুখ্যভাষা রচনায় সেই প্রতিভার আবশ্যক। সেই প্রতিভা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীতে অসামান্য রকম ছিল।'[১]

প্রথম স্তরের গুরুগম্ভীর সাধুগদ্য লিখে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে খুশি ছিলেন, তা নয়। এই কালের গদ্যকে বঙ্কিমচন্দ্র যতই প্রশংসা করুন না কেন, শাস্ত্রীমশায়ের লেখক-মানসে আর একটা গদ্য-ভাবনা নিয়ে আলোড়ন চলছিল। ১২৮৮ সালের শ্রাবণে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'বাংলা ভাষা' প্রবন্ধে, আমরা তার প্রমাণ পাই। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের গদ্যের বদলে সাধারণের উপযোগী আর একটা গদ্যরূপের সন্ধানের কথা ঐ প্রবন্ধে তিনিই প্রথম তাগিদ অনুভব করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, আমাদের দেশে সেকালে ভদ্রসমাজে তিন প্রকার বাংলা ভাষা চলিত ছিল। মুসলমান নবাব ও ওমরাহদের সঙ্গে যেসব ভদ্রলোকের কথাবার্তা চলত, তাতে অনেক উর্দু শব্দ মিশানো থাকত। যাঁরা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করতেন, তাঁদের বাংলায় সংস্কৃত শব্দের প্রাধান্য ছিল। 'এই দুই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ভিন্ন বহু-সংখ্যক বিষয়ী লোক ছিলেন।' তাঁদের বাংলায় উর্দু ও সংস্কৃত, দুই মিশানো থাকত। 'কবি ও পাঁচালিওয়ালারা' এই ভাষায় গান বাঁধত। মোটামুটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বিষয়ী লোক ও আদালতের লোক—এই তিনদল লোকের তিন রকম বাংলা ছিল। 'বিষয়ী লোকের যে বাংলা তাহাই পত্রাদিতে লিখিত হইত, এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ঐরূপ বাংলা শিখিলে যথেষ্ট জ্ঞান করিত।'[২]

প্রবন্ধটির মধ্যে প্রবন্ধকার সেকালের বাঙালি সমাজে প্রচলিত একাধিক কথিতরূপের উল্লেখ করে সাধারণের উপযোগী ভাষার সন্ধান দেন। আর তাকেই বিষয়ী লোকের বাংলা বলে চিহ্নিত করেছেন।

কেবল সন্ধান দিয়েই তিনি কলম থামিয়েছেন, তা নয়, সংস্কৃত-পণ্ডিত ও ইংরেজি-নবিশদের ব্যবহৃত গদ্যে সংস্কৃত বা ইংরেজির অনুবাদকর্মকে কঠোরভাবে সমালোচনা করে তিনি ভাবীকালের গদ্যলেখকদের সতর্ক করে দেন। তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'জীবনচরিতের' 'স্যর আইজাক নিউটন' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, তাঁদের ব্যবহৃত গদ্যে যে পরিমাণ পণ্ডিতি আছে, তা সাধারণের উপযোগী করার দিকে তাগিদ একেবারে ছিল না। তিনি তাই মন্তব্য করেন যে, তাঁদের অনুবাদের চেয়ে মূল পড়া সহজ।[৩]

প্রবন্ধকারের এমন বলিষ্ঠ অথচ যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্যের জন্য আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় মন্তব্য করেন, 'বাংলা ভাষা প্রবন্ধটিতে শাস্ত্রী মহাশয়ের যে অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে তা আর কোনো বাংলা ভাষার আলোচনাকারীদের মধ্যে দেখিনি। এমন কি রবীন্দ্রনাথও এমন কথা বলেন নি'।[৪]

১. বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, ১৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. বাংলা ভাষা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ (বঙ্গদর্শন ১২৮৮ শ্রাবণ)।
৩. বাংলা ভাষা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ (বঙ্গদর্শন ১২৮৮ শ্রাবণ)।
৪. হরপ্রসাদ রচনা সংগ্রহ (১ম) 'বাংলা ভাষা' প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক তথ্য দ্রঃ।

আচার্য সেন কথিত 'অন্তর্দৃষ্টির' সঙ্গে 'দূরদৃষ্টি' শব্দটিও যোগ করে বলতে চাই যে, শাস্ত্রী মশাই এই প্রবন্ধ রচনার (১২৮৮) কালেই আগামী দিনের 'মুখ্য ভাষার' স্পষ্ট একটা ধারণা করে নিতে পেরেছিলেন। তাঁর ভাষাতেই বলি, 'আমাদের এক পুরুষ পূর্বে লোকের সংস্কার এই ছিল যে, চলিত শব্দ পুস্তকে ব্যবহার করিলে সে পুস্তকের গৌরব থাকে না। সেইজন্য তাঁহারা বরফের পরিবর্তে তুষার, ফোয়ারার পরিবর্তে প্রস্রবণ, ঘূর্ণীর পরিবর্তে আবর্ত, গ্রীষ্মের পরিবর্তে নিদাঘ প্রভৃতি আভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া গ্রন্থের গৌরব রক্ষা করিতেন। অনেক সময়ে তাঁহাদের ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতেও তত চলিত নহে, কেবল অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র।'[১]

প্রবন্ধকারের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভাল করে বাংলা না শিখে সকলে লিখতে বসেন। এই সব লেখকেরা কেউ কেউ লেখার সময়ে একটা ভাল অভিধান ও একজন পণ্ডিত-লিপিকর নিয়ে বসতেন। তাই তাঁদের কলমের বাংলা আর সাধারণের কথিত বাংলা অনেক তফাৎ হয়ে পড়েছে। 'দুইটীকে একভাষা বলিয়া বোধ হয় না।' ফলে দেশের অধিকাংশ লোকই লিখিত ভাষা বুঝতে পারতো না। সেই কারণে সাধারণের মধ্যে পাঠকের সংখ্যা কম।[২]

শাস্ত্রী মশাই তাই বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যভঙ্গির বাইরে সাধারণের উপযোগী আর একটা গদ্যরীতির অভাববোধ করেছিলেন।

বলা বাহুল্য এই স্তরে অন্যান্য রচনার মধ্যে 'বাংলা ভাষা' প্রবন্ধটির গদ্যরূপ ভিন্ন ধরনের। বড় বড় শব্দভারে সে গদ্য জর্জরিত নয়। 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসের ভাষাও এর থেকে আলাদা।

শাস্ত্রী মশাইয়ের প্রথম স্তরের গদ্য রচনার মধ্যে 'ভারত মহিলা'[৩] 'বাল্মীকির জয়'[৪] ও 'কাঞ্চনমালা'[৫] উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে প্রথম দুটির গদ্য পুরোপুরি বঙ্কিমীগদ্য। আর কাঞ্চনমালায় বঙ্কিমী-প্রভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহধন্য হরপ্রসাদের এই পর্যায়ের গদ্যে সংস্কৃত-তৎসম-যুক্তব্যঞ্জন ও সমাসবদ্ধ দীর্ঘতর শব্দের প্রাবল্য। ভাষা তাই বেশ আড়ষ্ট। 'বাল্মীকির জয়'[৬] থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক : 'মুগ্ধ হইয়া পৃথিবীস্থ আকাশস্থ ব্রহ্মাণ্ডস্থ, অনন্তস্থ জনগণ এই গান শ্রবণ করিলেন। উহা সকলেরই কর্ণে সুধাধারাবৎ বোধ হইতে লাগিল। যেমন বড় সুখের সময়ে সুখসন্তানবৎ—স্বপ্নবৎ—অর্ধচেতনবৎ, অর্ধ অবচেতনবৎ মোহময়, সুখময়, শান্তিময়, অমৃতময়, দূরস্থমধুর—সংগীতধ্বনিবৎ, কালে কি জানি কি বিলীন হয়, সেইরূপ সে গীতিধ্বনি সকলের কর্ণে লাগিল।'

অনেকে একে বঙ্কিমের রচনা বলে মনে করতে পারেন। সংস্কৃত-তৎসম ও বড় বড় শব্দের দিকেই লেখকের ঝোঁক ছিল। তাই দেখি, একতানমনপ্রাণ বিরোধীভাবমালা, স্বরপ্রক্রিয়াপরিশোধিত, ভীষণকোদণ্ডটংকারের মত অনেক গুরুগম্ভীর পাল্লাভারি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

সংস্কৃত কলেজে পড়ুয়া বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রের কালে তরুণ গদ্যলেখক শাস্ত্রী মশায়ের হাত দিয়ে এই ধরনের দাঁতভাঙা বাংলা লেখা স্বাভাবিক ছিল।

সেই পণ্ডিতিগদ্য থেকে মুক্তিলাভের প্রথম চেষ্টা কিছুটা 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে দেখি। সঞ্জীবচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদক তখন এতে 'কাঞ্চনমালা', ১২৮৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় থেকে মাঘ পর্যন্ত আটটা কিস্তিতে ধারাবাহিক ছাপা হয়।[১] তাই মনে করা যেতে পারে, বঙ্কিমের মত, 'পালামৌ'-খ্যাত সঞ্জীবচন্দ্রেরও স্নেহ লাভ করেছিলেন হরপ্রসাদ। আর 'কাঞ্চনমালা'র গদ্যেও যে তার কিছুটা প্রভাব ফেলেছে, তাতে সন্দেহ করার কিছু নেই। লেখকের গদ্যস্রোত এখান থেকে আর একটা দিকে বাঁক ফিরতে চেষ্টা করে। দেখতে পাই সেই সংস্কৃত-তৎসম ও সমাসবদ্ধ শব্দ সবই আছে, তবে অনেক মার্জিত। আর আছে কিছু সহজ আটপৌরে-কথ্য উপাদান, যা নাকি গদ্যে এনেছে একটা অনাড়ম্বর সরল রূপ। যথা : '"আহা মরি মরি কি গানই গাইছ! আবার গাও। আমি রাজসিংহাসন তোমায় দিয়া যাইব।"

কুণালের কাছে গেল। কুণালের চিবুক ধরিয়া তুলিল—কই বাছা, তোমার সে মণি দুটি কই?

কে নিল নয়নমণি। কহ কহলো সজনি!

বড়ো যে আমায় দেখলেই চোখ লুকুতে? খুব হয়েছে। এমনি করে—এমনি করে এমনি করে—এমনি করে পায়ে পিষে ফেলেছি। কেমন একবার চাও তো সোনার চাঁদ।" বলিয়া আবার কুণালের চক্ষে আঙ্গুল পুরিয়া দিতে গেল। সকলে যেমন ধরিতে আসিল, অমনি কুণালের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল'।[২]

চলিত বাকরীতিতে রচিত এমন গদ্য বঙ্কিমের উপন্যাসেও মেলে না। কত সরল অনাড়ম্বর ভাষা। বলা বাহুল্য আগাগোড়া 'কাঞ্চনমালা'য় এরূপ নেই।

তার কারণ প্রথম স্তরের রচনা 'কাঞ্চনমালা'। গদ্যভঙ্গির পরিবর্তন ঘটলেও, প্রথম পর্বের সব লক্ষণই এতে বর্তমান। তাই সহজ গদ্যরূপের পাশে পাশে এখানে বঙ্কিমী-গদ্য ভাষারও পরিচয় মেলে। আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা তার প্রমাণ নিতে পারি। যথা : 'মন্ত্রী তখন এই ঋদ্ধিমতী পতিপরায়ণা ধর্মানুরাগিণী, রমণীকুলললামভূতা কামিনীকে সদ্ধর্ম-বিদ্বেষিণী পতিপ্রাণহারিণী ষড়যন্ত্রকারিণী পরিষ্যরক্ষিতার পরিবর্তে পাটরাণী করিবার প্রস্তাব করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্থির হইল তিষ্যরক্ষা পাটরাণী হইবেন এবং পরিষ্যরক্ষিতা পৌণ্ড্রবর্ধনের দুর্গে অবরুদ্ধ হইলেন।'

কি নেই এই গদ্যে? সংস্কৃত তৎসম ছড়াছড়ি আর একদিকে বড় বড় শব্দের বজ্রনিনাদ। ভাষার এই টানাপোড়েন দেখেই গদ্যলেখকের মনের ছবিটা পড়তে কষ্ট হয় না। তাই 'কাঞ্চনমালা'-পরবর্তী কালের গদ্যে হরপ্রসাদকে স্বকীয় ভূমিতে পা রাখতে দেখতে পাই।

১. বঙ্গদর্শন (১২৮৯ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক অগ্রান পৌষ এবং মাঘ, মোট আটটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়)।

২. অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ সম্পাদিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (১ম) দ্রঃ।

'কাঞ্চনমালা' থেকে 'বেনের মেয়ে' পর্যন্ত সাঁইত্রিশ বছর শাস্ত্রী মশাই আর কোন উপন্যাস লেখেননি। কিন্তু বাংলা গদ্য রচনায় ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্যের আলোচনার মধ্যেই তখন তাঁর গদ্য সীমাবদ্ধ ছিল। আমাদের আলোচ্য সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা। এর মধ্যে মেঘদূত[১] আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া কালিদাসের মেয়ে দেখানো[২], কালিদাসের বসন্ত বর্ণনা[৩] প্রভৃতি রচনার গদ্যরূপও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এ গুলোর মধ্যে লেখকের এক নতুন পরিচয় পাই। কেননা, এই আলোচনাগুলো সংস্কৃত সাহিত্যের ঠিক অনুবাদ বা ভাবানুবাদ নয়। মূলকে ভিত্তি করে এক রকম নতুন সৃষ্টি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাই সঙ্গত কারণেই এই সব রচনার পরিচয় দিতে গিয়ে মন্তব্য করেন, 'শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করিতেন কেবল ঐতিহাসিক শুষ্ক দৃষ্টি লইয়াই নহে, পরন্তু তাঁহার সাহিত্যরসিকেরও দৃষ্টি ছিল। এই জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের নানা কথা লইয়া বাঙ্গালায় লিখিত তাঁহার প্রবন্ধগুলি সকলের পক্ষেই সুপাঠ্য।'[৪]

সবার পক্ষে সুপাঠ্য শুধু বিষয় বৈচিত্র্যের জন্যেই নয়, বিষয়কে যেভাবে রসনামণ্ডিত করে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অতএব আমরা এখন সাহিত্যরসিক হরপ্রসাদের এই পর্যায়ের গদ্যের প্রমাণ নিতে পারি। আগেই বলা হয়েছে 'মেঘদূত' রচনাটি এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে এই আলোচনার প্রকাশ রূপের পরিচয় দিতে পারি : 'গরীব যক্ষ মেঘ দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। মেঘ যে জড় পদার্থ, ধূমময় ব্যতীত আর কিছুই নয়, একথা তাহার মনেও রহিল না ; মেঘ উত্তরদিকে যাইতেছে। আহা! আমার প্রিয়া এতদিনে জীবিত আছে কি না, যদি থাকে, মেঘ দেখিলে সে আর প্রাণ রাখিতে পারিবে না, যে দূরে আসিয়াছি, সংবাদ দিবার, সংবাদ লইবার লোকও নাই, এই মেঘ দিয়া যদি একটি খবর পাঠাইতে পারি, হয়ত প্রিয়া বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।'

সন্দেহ নেই সাধু গদ্য, অথচ কত সহজ করে বলা। সংস্কৃত কাব্যের আলোচনা বলে অযথা তৎসম যুক্তব্যঞ্জন সমাসবদ্ধ প্রভৃতি নানা ভারি গম্ভীর শব্দের উৎপাত নেই। তারও পর এক টুকরো সরল স্নিগ্ধ হাসি এই সাধুগদ্যের শরীরের এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে বিষয়কে আস্বাদ্য করে তুলেছে। বলা বাহুল্য এখানেই হরপ্রসাদের বিশেষত্ব।

লেখক বিষয়কে স্বাচ্ছন্দ্যচারী করতে প্রয়োজনে গদ্যে চলিত উপাদান কেন, ক্রিয়াপদেও হাত বাড়ান। যথা : 'তিনি মেঘকে বলিয়া দিতেছেন, "ভাইরে! যদি সে তখন ঘুমাইয়া থাকে, তাহাকে জাগাস্ না, যদি কোনরূপ একটু নিদ্রা গিয়া থাকে, নিশ্চয়ই সে স্বপ্নে আমাকে পাইবে। তাহাকে জাগাইয়া বিরহের উপর আবার বিরহ দিস্ না।'

এতে সাধু গদ্যের চরণে একাসনে 'জাগাস্ না' এবং 'দিস না'-র মত আটপৌরে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করা হয়েছে।

আবার 'কালিদাসের মেয়ে দেখানো' থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি : 'কোমরে বড়জোর

---

১. মেঘদূত। বঙ্গদর্শন ১২৮৯ অঘ্রান পৌষ ফাল্গুন সংখ্যা। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বাংলা ছন্দে অনূদিত মেঘদূত গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধ রচিত।

২. নারায়ণ, ১৩২২ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

৩. নারায়ণ, ১৩২২ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক গ্রন্থ দ্রঃ।

৪. হরপ্রসাদ রচনাবলী (১ম সম্ভার), ভূমিকা।

দেড় ফের কি দুই ফের হইত। আর একখানা বাকল একটা কাঁধের উপর গিয়া বুকটা ঢাকিয়া রাখিত। এইরূপ দুখানা বাকল পরিয়া শকুন্তলা নুইয়া নুইয়া গাছে জল দিতে ছিলেন বাকল আঁটা ছিল তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছিল--তাই তিনি একজন সখীকে বলিলেন, আমার বাকলখানা একটু শিথিল করিয়া দাও।'

সংস্কৃত ভাষার একজন বিদগ্ধ পণ্ডিতের হাত দিয়ে বাংলা গদ্যের এত সহজ-স্নিগ্ধরূপ আগে দেখা যায়নি। বাংলা ভাষার নিজস্ব ভাণ্ডারের দিকেই তাঁর নজর ছিল। আটপৌরে বা দেশি শব্দের প্রতি তাঁর এত আগ্রহ এত ভালবাসা, বাংলা ভাষার কারবারীদেরও রচনায় বিরল। তাইতো কোমর, ফের, বাকল, পুরু, ছাল ইত্যাদি অতি পরিচিত কথ্যশব্দগুলোকে অনায়াসে তিনি গদ্যে স্থান দিয়েছেন। এমন কি নত হইয়া না লিখে 'নুইয়া নুইয়া'তেই শকুন্তলার গাছে জল দেবার ব্যাপারটাকে যেন সত্য করে তুলেছেন। সংস্কৃত ভাষার একজন কৃতীছাত্র এবং বিদগ্ধ পণ্ডিত হয়েও খাঁটি বাংলা ভাষাকে এত গভীর ভাবে ভালবাসা বাংলা সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট ঘটনা।

'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে হরপ্রসাদী-রীতির সমস্তই এই পর্যায়ে বর্তমান। সাধুগদ্যের গদা ঘোরানোর কালে চলিত-আটপৌরে উপাদানে সহজ-স্নিগ্ধ সাধুগদ্য রচনা হরপ্রসাদের কৃতিত্বের আর একটি দৃষ্টান্ত 'কালিদাসের বসন্ত বর্ণনা'[১] থেকে দেখিয়ে এই পর্যায়ের ইতি করতে চাই। যথা : 'সে মুখ দেখিয়া কাহার মন না উড়ু উড়ু করে। চারিদিকে পলাশের ফুল ফুটিয়াছে, ফুলের ভারে গাছ সব নুইয়া পড়িয়াছে ও তাহার উপর বাতাস বহিতেছে। বোধ হইতেছে যেন অগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া বেড়াইতেছে। চারিদিকে পলাশবনে আচ্ছন্ন হওয়ায় বোধ হয়, যেন পৃথিবী লাল চেলি পরিয়া আবার বিয়ের কনে সাজিয়াছেন। একে তো চারিদিকে পলাশ ফুটিয়াছে, ফুলগুলা যেন টিয়া পাখীর ঠোঁট, তার উপর সোঁদালের ফুল, ইহার উপর আবার কোকিল ডাকিতেছে--এ সময় কি কেহ স্থির থাকিতে পারে? এ সময়ের বাতাস বড় মিষ্ট, কারণ হিম আর পড়ে না, বাতাস গায়ে লাগিলে মনের একটু স্ফূর্তি হয়। বাতাস আসে আমের বোল কাঁপিয়ে ; বাতাস আসে দূর হতে কোকিলের স্বর ব'হে নিয়ে। এ বাতাসে সকলের মন মোহিত হইয়া যায়। কুঁদুফুলে বাগান আলো ক'রে রয়েছে, দেখিলে বোধ হয় যেন কোন রসিকা যুবতী হাসিতেছে।'

সংস্কৃত সাহিত্যের এত সহজ-মধুর ব্যাখ্যা এর আগে পাইনি। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'কিন্তু ব্যাখ্যাকর্ম হলেও এটা অন্তরঙ্গ ব্যাখ্যা। 'মাষ্টারি' বা পণ্ডিতী ব্যাখ্যা নয়।' সখা সম্মিত ব্যাখ্যা। তাই তার ছন্দে আছে লৌকিক কথ্যছন্দের লাবণ্য। তার লয়ে আছে সহৃদয় সামাজিকের ধীরতা। তাঁর কথায় সুর-স্বর একান্তভাবেই বাঙালির সুর স্বর। এই সুর-স্বরের জন্য বাঙালিকে কারো দ্বারস্থ হতে হয় না।[২]

'বাংলা ভাষা' প্রবন্ধের সাঁইত্রিশ বছর বাদে আমরা 'বেনের মেয়ে' উপন্যাস থেকেই 'বাংলা ভাষা' প্রবন্ধে কথিত বিষয়ী লোকের বাংলার সন্ধান পেলাম। এখান থেকেই হরপ্রসাদী গদ্যের পরিণত স্তর তথা হরপ্রসাদী-রীতির সূচনা।

'বেনের মেয়ে'র ভূমিকা বা মুখপাতে লেখক বলেছেন, 'আমাদের রক্ত-মাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখনো হইতেও চাই না। 'বেনের মেয়ে' একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প

১. নারায়ণ, ১৩২২ ফাল্গুন সংখ্যা।
২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ, ২৮৭ পৃঃ দ্রঃ।

যেমন আছে, এও তাই। তবে এতে একালের কথা নাই। সব সেই সে কালের যে-কালে বাংলার সব ছিল। বাংলার হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল।'

উপন্যাসটির মুখপাতে গদ্যভাষার ছাঁদ দেখে লেখকের স্বকীয়তার পরিচয় মেলে। ছোট ছোট বাক্যে, আস্তে আস্তে প্রভাতী ফুল সূর্যের দিকে চোখ মেলে তাকানোর মত--এ পাঠকের মনটাকে টেনে ধরে। শব্দের অযথা অত্যাচার নেই। এই হচ্ছে 'বিষয়ী লোকের বাংলা।' 'বেনের মেয়ে' থেকে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা তার স্বরূপটা উদ্ধার করতে পারি। যথা : 'সাতগা পার হইয়াও ধরমপুর পর্যন্ত তারাপুকুরের মতোই সাজানো-গুজানো। তবে ধরমপুরের আলোর কারখানাটা খুব বেশি। সন্ন্যাসীদের সেখানে দু-এক রাত থাকিতে হইবে কিনা, তাই এই আলোর ব্যবস্থা। সেখানেও তারা-পুকুরের মতো কোথাও তালপাতার বড়ো বড়ো ঘর, কোথাও তালপাতার মেরাপ, কোথাও তাঁবু, কোথাও শামিয়ানা, কোথাও কাঠগড়া, সব জায়গাই আলো, আলো ও বিচিত্র মশালের বন্দোবস্তই বেশি। বড়ো শামিয়ানার নীচে বাঁশের তেকোনার উপর সরা; তাহাতে সরিষার তেল, তেলের মধ্যে সরিষার পুঁটলি; পুঁটলির গেরোর উপরে যে কাপড় আছে, তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আর সেইটা জ্বলিতেছে।'

দেখতে পাচ্ছি এখানে, প্রথমত, বড় বড় শব্দ নেই। দ্বিতীয়ত, তদ্ভব ও অতিচল শব্দের ব্যবহার। তৃতীয়ত, ক্রিয়াপদহীন বহু বাক্যের প্রয়োগ লক্ষণীয়। তাছাড়া, 'আলোকের বদলে আলো', 'রাত্রির বদলে রাত', 'তৈলের বদলে তেল' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'পুঁটলি' ও 'গেরোর' মত অতিচল কথ্যশব্দকেও লেখক কত সহজেই স্থান করে দিয়ে ভাষার শক্তি বাড়িয়েছেন।

আবার সহজ সরল ভাষায় ছোট বাক্যে ও সহজ শব্দে উপস্থাপ্য বিষয়টিকে ধীরে ধীরে ছবির মত ফুটিয়ে তোলা কথাশিল্পের একটা ধর্ম। 'বেনের মেয়েতে' সেটা সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মনে হয় যেন লেখক ভাষা দিয়ে ছবিই এঁকেছেন। যথা :

'রামপুরের সঙ্ঘারামের মধ্যে একটি ছোটোখাটো বিহার ছিল। বিহারটি দোতলা, চকমিলানো, বারান্দার ওপাশে সারি সারি ছোটো ছোটো ঘর। বারান্দার দিক ছাড়া আর কোনো দিকে জানালা বা দরজা নাই।'

এতে কেবল সরল ভাষারূপই নেই, কথ্যবাক্‌রীতিও ইচ্ছেমত সাধুগদ্যের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে ভাষায় গতিদান করেছে। আর এইখানেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কৃতিত্ব, বাংলা গদ্যের 'সব্যসাচী' বঙ্কিমচন্দ্রেও তা ফুটে ওঠে নি।

আবার, বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদ একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। তাকে ভেঙে চুরে অনেক গদ্য লেখকই বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু ক্রিয়াপদহীন বাক্য ওই কালে ভাবাই যায় না। অথচ আমরা মৌখিক ভাষায় হামেশায় অনেক শব্দ উহ্য রাখি, কখনো বাদ দিয়ে বা অসম্পূর্ণ রেখেই ব্যবহার করি। 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে এমনটা অনেক জায়গায় দেখি। সে কারণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে এদিক থেকে 'পথ প্রদর্শক' মনে করা যেতে পারে। যথা : 'তবে আমরা জানি, বিহারী রাউত আশ্রমের বেনে। ছাউনিতে ছাউনিতে মসলা বেচা তাহার পৈত্রিক ব্যবসা। বাংলায় তখন অনেক রাজা। সকলেরই দশ-বিশটা ছাউনি। বিহারীর মোকামও সব ছাউনিতে। তার বড়োগোলা সাতগাঁয়ের গঙ্গার ধারে।'

উদ্ধৃতির অনেক বাক্যেরই ক্রিয়াপদ নেই। অথচ তা কানে বাজে না। মনে হয় রবীন্দ্র-পরবর্তী কালের কারও গদ্য পড়ছি। এই জন্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রধান ষ্টাইলিষ্ট। সমালোচক প্রমথনাথ বিশী তাই মন্তব্য করেন, 'স্বীকার করিতে বাধা নাই যে--আমি তাঁর ভাষারীতির বিশেষ ভক্ত।'[১]

বলা বাহুল্য হরপ্রসাদী-রীতি বা ওই ষ্টাইল ফুটে উঠেছে এমন কিছু কিছু উপাদানের একটা তালিকা দেওয়া হচ্ছে। যথা :

গ্রাম্য ইডিয়াম ঃ সটান, চাঁই, দবদবা, বাহির-চটক, সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, গৃহস্থালী, নাছোড়বান্দা, আহ্লাদে আটখানা, পোড়া, মেয়ের পয়েই, গলদঘর্ম, জবুথবু, মৎলব হাঁসিল, গুড়ের নাগরি ইত্যাদি।

মৌখিক ও আঞ্চলিক ভাষার উপাদান : খুরা, টুকনি, আঁতড়ি, পোঁটা, হাওদা, খেউরি, বাখারি, ছই, মাচা, ফাঁদালো, ফেটা, সেঁউতি, ফাঁপরে প্রভৃতি।

আরবি-ফার্সিশব্দ : ইস্তফা, শামিয়ানা, সামিল, মুনাফা, মোকাম, দৌলত প্রভৃতি।

বেনের মেয়ের পরেও হরপ্রসাদী-গদ্যের আরও একটি পরিণত স্তর দেখতে পাই তাঁর শেষ দিকে লেখা দুটো গল্পে ও একটা প্রবন্ধের ভাষায়। তখন গদ্যে-পদ্যে রবীন্দ্রনাথেরও পরিণতি পর্ব চলছে। সুতরাং হরপ্রসাদের ভাষায় কিছু হয়তো রবীন্দ্র-প্রভাব পড়তে পারে।

গল্প দুটি--'বামুনের দুর্গোৎসব' (১৩২৬ সাল), ও 'পাঁচ ছেলের গল্প' (১৩৩৩ সাল) এবং প্রবন্ধটির নাম 'জগদিন্দ্রনাথ রায়'। এগুলোর ভাষাভঙ্গি দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, তাঁর গদ্য কোন দিকে পা বাড়াচ্ছিল। যেমনি ভাষার কারিকুরি, তেমনি এর শব্দ ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্য ভাব। যেমন : 'বামুনের দুর্গোৎসব' থেকে :

'মা, তুমি কান্‌ছ কেন?

একটি আট-নয় বছরের ব্রাহ্মণের ছেলে, গলায় একগোছা ধপধপে পইতা, দিব্য মোটাসোটা নুন্‌ধুগ্‌ড়িপানা ছেলে, একটি ঘেরা বাড়ির উত্তরে পোতার বড়ো ঘরের দাওয়ায় এক পাশে খেলা করিতে করিতে দৌড়িয়া আর এক পাশে মায়ের কাছে গেল ও মায়ের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দেখিল, মায়ের চোখ দিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল : "মা, তুমি কান্‌ছ কেন?"'

দেখতে পাচ্ছি গল্প বলার বিশিষ্ট ঢঙটি ভাষায় আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে। ভারতবিদ্ প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদকে পরিণত বয়সে গল্পকার হরপ্রসাদ রূপে সহজ-আটপৌরে ভাষায় আত্মপ্রকাশ করতে দেখি।

গদ্যের ঐ রূপ ঐ ভাব 'পাঁচ ছেলের গল্পে'ও পাই। যথা ঃ 'এক আছেন রাজপুত্র, তাঁর আছেন চার বন্ধু, গুরুপুত্র, পাত্রের পুত্র, পুরুতপুত্র, আর কোটালের পুত্র। তাঁদের বয়স এক, বাড়ী একখানে, এক পাঠশালায় পড়া, একত্রে খেলা করা, যেন পাঁচটিতে এক। রাজা ছেলেগুলিকে ভালোবাসেন, গুরুঠাকুর তাদের ভালোবাসেন, পাত্র ভালোবাসেন, পুরুত ভালোবাসেন, কোটালও ভালোবাসেন। সকলেই পাঁচটি ছেলেকে আপনার ছেলের মতো দেখেন।'

লেখকের এ গদ্য দেখলে মনেই হয় না—চলিতরূপ বলে আরো একটা রূপ আছে।

১. বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, ১২৮-১২৯ পৃঃ দ্রঃ।

পরবর্তীকালে কথাশিল্পে অনেকেই একে গ্রহণ করেন। আর একেই সঠিক হরপ্রসাদী-রীতি বলা যায়। শেষ দিককার কিছু প্রবন্ধে এই রূপ বর্তমান। তার মধ্যে 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়' (১৩২২ সাল) 'এস এস বঁধূ এস আধ আঁচলে বস' (১৩৩৮ সাল) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এবার 'জগদিন্দ্রনাথ রায়'[১] প্রবন্ধটির কথায় আসা যাক। শাস্ত্রী মশায়ের গদ্যের মধ্যে এটি একেবারে আলাদা। কারণ প্রথমত, আগাগোড়া চলিত রীতিতে লেখা। দ্বিতীয়ত, ক্রিয়ার ব্যবহারেও কেবল চলিত রূপকেই মেনেছেন। ইতিপূর্বে কোন রচনাতে তিনি গদ্যের দুই রূপ নিয়ে বাছবিচার করেননি। কথ্য-আটপৌরে-উপাদান ঘেঁষা গদ্য লিখলেও চলিত ক্রিয়ার পাশে সাধুরূপের ক্রিয়া অনায়াসে ব্যবহার করে এসেছেন। কিন্তু জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রবন্ধটি সেদিক থেকে ব্যতিক্রম। যথা : 'মহারাজ জগদিন্দ্রের অমায়িকতার পার ছিল না। আমার মতো একজন সামান্য লোক—তিনি একদিন আমাকে বলে পাঠালেন—"আমি তোমার বাড়ী যাব।" আমি অবাক হয়ে গেলুম। নাটোরের মহারাজ হুকুম করলে আমার মতো কত লোক তাঁর দ্বারদেশে উপস্থিত হত। কী রকম করে বাড়ী সাজাব, কী রকম করে তাঁকে অভ্যর্থনা করব, বসাব কোথায়—এই নিয়ে আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লুম। বসাবার জায়গাতো করলুম, তিনি কিন্তু এসেই আপনা হতে আমার ভাঙ্গা চেয়ারে গিয়ে বসলেন এবং দুঘণ্টা আমার সঙ্গে গল্প করলেন।'

দেখতে পাচ্ছি—'বেনের মেয়ের' গদ্য আর এই গদ্যের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেড়ে গেছে। 'বেনের মেয়ে'কে যদি পরিণত গদ্য বলা হয়ে থাকে, এই গদ্যকে তবে কি বলা যাবে? পূর্বোক্ত ছোটগল্প দুটির মধ্যে যেমন গল্পকার হরপ্রসাদকে নতুন ভাবে দেখি, এই স্মৃতিচারণ প্রবন্ধটির মধ্যেও রাজা জগদিন্দ্রনাথকে নিয়ে ঘটনাধারায় বাক্‌মুখর হয়ে উঠেছে। বাংলা গদ্যে চলিত রূপের ধারায় এই বিশিষ্ট ভঙ্গিটি রবীন্দ্রনাথেও যেমন মেলে হরপ্রসাদেও তেমনি। 'এ রীতিকে অপরের পদাঙ্ক বলে ভুল করা চলবে না।'[২] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যে কোনো বিষয় শাস্ত্রী মহাশয় হাতে নিয়েছেন, তাকে সুস্পষ্ট করে দেখেছেন ও সুস্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না।'[৩]

১. মানসী ও মর্মবাণী, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে শ্রাবণে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' শোকসভা' শিরোনামে প্রবন্ধটি প্রথম ছাপা হয়।

২. বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী।

৩. হরপ্রসাদ রচনাবলী (১ম সম্ভার ১৩৬৩), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অষ্টম অধ্যায়

চলিত গদ্যের আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠার কাল

সবুজপত্র ও কল্লোল

আধুনিক গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে চিন্তা-ভাবনা ও রূপ-রীতির দিক থেকে বেশি করে সকল স্তরের পাঠককে নাড়া দিয়েছে—এমন দুটি সাময়িক পত্রের কথা স্বভাবতই এসে পড়ে, এর একটি 'সবুজপত্র'[১] অন্যটি 'কল্লোল'।[২] দুটোই রবীন্দ্র-সমকালীন চিন্তা-ভাবনার বাহক। একটির মধ্যে প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের এবং পরেরটিতে উপন্যাস ও গল্পের বিস্ময়কর আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করি। আর সেই সঙ্গে চলিত গদ্যের আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠাও সংঘটিত হয়।

এই ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে 'সবুজপত্রের' নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 'সবুজপত্র', 'সংবাদ প্রভাকর', 'তত্ত্ববোধিনী', 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', 'সাধনার' মতই একটি কালজয়ী সাময়িকপত্র। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল' ছদ্মনাম নিয়ে বাংলা পত্রপত্রিকার ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন আলোড়ন সৃষ্টি করেন। গড়ে তোলেন 'বীরবলী যুগ' ও 'বীরবলী-চক্র'।

কালের দিক থেকে প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্র-সমকালীন, কিন্তু স্বকীয় সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে রবীন্দ্র-গোষ্ঠীর মধ্যে ধরা চলে না। রবীন্দ্রনাথের কাছের মানুষ ও নিকট আত্মীয় হয়েও রবীন্দ্র-ভাবনা থেকে প্রমথ চৌধুরী নিজেকে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। চলিত রীতির প্রবর্তনার দিক থেকে তিনিই বরং রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেন।[৩] সুতরাং ভাবীকালের আদর্শ ভাষারীতি গড়ে তুলতে 'সবুজপত্রের' ভূমিকা ছিল অপরিহার্য।

'সবুজপত্র' একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে ইতিহাস হয়ে আছে। উনিশ শতকের গোড়া থেকে সাধুগদ্যে সাহিত্য সৃষ্টি হলেও, অল্পকালের মধ্যে চলিত ভাষায় সাহিত্যকর্ম করার দাবি ওঠে। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের সম্পাদনায় ১৮৫৪ খৃঃ 'কথাবার্তার ভাষায়', 'মাসিকপত্রিকাও' প্রকাশিত হয়। তারপর টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোমের নক্‌শা', ভুবনচন্দ্রের 'হরিদাসের গুপ্তকথা' ও 'সমাজ কুচিত্র' ইত্যাদি চলিত গদ্যে রচিত হতে থাকে। তবু চলিত রীতি সর্বজন স্বীকৃতি পায় নি। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাংলা ভাষা' প্রবন্ধে একে কিছুটা মেনে নিলেও তিনি কখনও চলিত গদ্যে লেখেননি। রবীন্দ্রনাথ গদ্যচর্চার সূচনায় চলিতরূপে ভ্রমণ কাহিনী তথা পত্রধারা লিখলেও কিন্তু 'সবুজপত্র' প্রকাশের কাল পর্যন্ত সাধু গদ্যেই মগ্ন ছিলেন। তারপর 'সবুজপত্র' প্রকাশের কালে চলিত রীতির আন্দোলনকে সমর্থন করে চলিতরূপে গদ্যরচনা শুরু করেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তা বজায় রাখেন। 'সবুজপত্রের' পক্ষে এর চেয়ে গৌরবের আর কী আছে। এইভাবে বাংলা গদ্যের দুই রীতির দ্বন্দ্বের বিরোধ মিটে যায় ঐ পত্রের মাধ্যমে।

'সবুজপত্র' গতানুগতিক পত্র ছিল না। পুরোনো চিন্তা ও অস্পষ্ট মনোভাবকে কখনই প্রশ্রয় দিত না। আরও অনেক দিক থেকে এর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে; বিজ্ঞাপন, ছবি,

---

১. প্রথম প্রকাশ ১৩২১, ২৫ বৈশাখ (১৯১৪ খৃঃ)।

২. প্রথম প্রকাশ ১৩৩০ বৈশাখ। শেষ সংখ্যা ১৩৩৬ পৌষ মাস।

৩. 'সবুজপত্র' থেকেই মোটামুটি রবীন্দ্রনাথ সবই চলিত গদ্যে লিখতে থাকেন, মৃত্যু পর্যন্ত তা থেকে আর সরে আসেননি।

ফিচার শ্রেণীর নয়ন-রঞ্জন কোন কিছু থাকত না। সম্পাদক নিজে ও রবীন্দ্রনাথ পত্রের বারো আনা অংশ জুড়ে থাকতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে যে নতুন চিন্তার সূত্রপাত ঘটলো, কবিতায় রূপ ও ভাবনায় নবযুগ এল, বাংলা গদ্যেও 'সবুজপত্র' সেই আধুনিক চিন্তা-ধারার বাণীবাহক। রীতি এবং 'বিষয়বৈচিত্র্য' এই দুয়েতেই 'সবুজপত্র' নতুন পথ দেখাল।[১]

এখন 'সবুজপত্র' ও সমকালীন সাময়িক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে এর সম্বন্ধ ও পার্থক্যটা ব্যাখ্যা করা দরকার। সময়টা ছিল নানা মত-পথের চিন্তা-ভাবনার বাদানুবাদের কাল।[২] দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মত পার্থক্যের রেশ তখনও থিতিয়ে যায়নি, এমন সময় 'সবুজপত্র'-এর জন্ম। আবার ওই পত্র গোড়া থেকে বাণীবাহকরূপে চলিত ভাষার ওকালতি শুরু করে দেয় জোর কদমে। আর এমনি লেগে যায় দেশজুড়ে আর এক তর্কযুদ্ধ। 'মানসী', 'নারায়ণ', 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে নারায়ণ 'সবুজপত্র'-বিরোধী রূপেই জন্ম (১৩২১ সন) নেয়।

এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশ ও বিপিনচন্দ্র পাল। ওই পত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রগতিবাদ ও 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের আক্রমণাত্মক সমালোচনাও ছাপা হয়। 'সবুজপত্রের' ভাষাদর্শের সমালোচনায় অন্যান্যদের সঙ্গে এগিয়ে আসেন নলিনীকান্ত গুপ্ত।[৩] 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকাও রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির সমর্থক ছিলো।[৪]

'সবুজপত্র'-বিরোধী ভূমিকার বাইরে আরও কিছু পত্র-পত্রিকার নাম করা যায়। সেগুলোও কিছু লেখক-গোষ্ঠী গড়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। এগুলো ঠিক 'বাজারে' পত্রিকাও ছিল না, তেমনি খাঁটি সৃজনশীল সাহিত্যপত্রের মর্যাদাও দাবি করতে পারে না।[৫] 'ভারতবর্ষ, 'মাসিক বসুমতী' প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এদের মাঝখানে 'সবুজপত্র' সবুজ দ্বীপের মত বিরাজ করছিল।

২.

প্রমথ চৌধুরী : বীরবল (১৮৬৮ খৃঃ–১৯৪৬ খৃঃ)

'সবুজপত্র' নামের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরী বা 'বীরবলের' নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ঐ পত্রের আলোচনায় সম্পাদক গল্পকার ও প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য কৃতিত্বের আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রমথ চৌধুরী বীরবল ছদ্মনামে বাংলা গদ্যে এক বিশিষ্ট রীতি বা স্টাইল প্রবর্তন করেন। তাঁর গল্পে ও প্রবন্ধে প্রচলিত রীতি মানা হয়নি। তাই প্রবন্ধ ও গল্প দুয়েতেই বীরবল বাংলা গদ্যে একক। তিনি একুশটিরও অধিক গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন।[৬] এর মধ্যে গল্প গ্রন্থের সংখ্যা সাত, বাকি প্রবন্ধের। গল্পকার হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠার মূলে 'সবুজপত্র'। কেননা, তার আগে

১. ড. রথীন্দ্রনাথ রায়, বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী, (২য় মুদ্রণ) ২৮ পৃঃ দ্রঃ।
২. ঐ, ৩৭ পৃঃ দ্রঃ।
৩. ড. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রমথ চৌধুরী, ২৭ পৃঃ দ্রঃ।
৪. ঐ, ২৮ পৃঃ দ্রঃ।
৫. ঐ, ২৯ পৃঃ দ্রঃ।
৬. আরও মুদ্রিত গ্রন্থ থাকা সম্ভব। কিছু কিছু মুদ্রিত ভাষণের কথা জানা যায়।

তাঁর তেমন মৌলিক গল্প ছিল না।[১]

'সবুজপত্রের' দ্বিতীয় বর্ষ থেকে তিনি স্বরচিত ছোটগল্প লিখতে থাকেন। এদেব মধ্যে 'চার ইয়ারী কথা', 'আহুতি', 'বড় বাবুর বড়দিন', 'একটি সাদা গল্প', 'ফরমায়েসি গল্প' 'ছোট গল্প', 'অদৃষ্ট' ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি আত্মপ্রকাশ করে।

তাঁর গল্প বলার ঢংটি ছিল একেবারে নিজস্ব। প্রচলিত রীতিনীতি অস্বীকার করে তিনি গল্প লেখেন। 'কারণ প্রমথ চৌধুরীই সর্বপ্রথম গল্পলেখক যিনি প্রবন্ধ ও গল্পের ব্যবধান অনেকখানি ঘুচিয়ে দিয়েছেন--সাহিত্যের এই দুটি প্রকরণের ভাসুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক মানেন নি'।[২]

গল্পের মাঝখানে নাটকীয়তা আনেন, যা কাহিনীর দ্রুতসঞ্চারী প্রবহমানতাকে মাঝে মাঝে থামিয়ে দেয়। গল্পের মূল কাহিনীটা হয়ত ছোট, অতি সাধারণ বা অলীক ; গল্পকার তাকেই বাক্‌বিন্যাস-যাদু দিয়ে অনেক দূর টেনে নিয়ে যান। তাতে অনেক সময় গল্পের চেয়ে ভূমিকা বড় হয়ে উঠেছে। অথচ পাঠক বিরক্তবোধ করেও ছাড়ে না, এমন একটা নেশা ধরিয়ে দেন, যাতে পাঠক কোন অংশ টপ্‌কিয়ে না যান। গল্পের মাঝে নানা তর্ক-বিতর্ক ও বিচিত্র প্রসঙ্গ এনে তার গতি-রস খণ্ডিত করে দেয়। অনেক সময় গল্প নয় প্রবন্ধ বলেও ভ্রম হতে পারে। তাতে মনে হতে পারে গল্পকার প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু পরিণামে জেলের হাত-জালের মত কাহিনীর জাল আবার হাতেই গুটিয়ে তোলেন। প্রমথ চৌধুরী নিজের গল্পের মধ্যেই আপন গল্পের বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরে বলেছেন, 'তার দু আনা গল্প, আর পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা তর্ক ; অর্থাৎ বাক্যি।'

(ঘোষালের হেঁয়ালী)

'এই ঘণ্টাখানেক ধরে বকর বকর করে আমাকে একটা গল্প লিখতে দিলে না।—

—আমাদেব এই কথোপকথন লিখে পাঠিয়ে দেও, সেইটেই হবে—

--গল্প না প্রবন্ধ?

একেবারে ও দুই-ই।' (গল্প লেখা)

এত স্পষ্ট করে এবং এত সহজ ভাষায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর মত আপন ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রমথবাবু তুলে ধরেছেন যে, আনাড়ি সমালোচকদেরও অসুবিধে হবার কথা নয়।

আবার গল্পের মত প্রবন্ধের বেলাতেও প্রচলিত রীতিনীতিকে অস্বীকার করা হয়েছে, দেখিতে পাই। যুক্তি তথ্য মনন ছাড়াও আখ্যান বা গল্পরসও তাঁর প্রবন্ধের একটা অঙ্গ। 'বিষয় যাই হোক না কেন, মোটামুটি ভাবে তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধেই সাহিত্যিক-ধর্ম পরিস্ফুট।'[৩]

'সবুজপত্র' নিজের পত্র হওয়ায় 'বীরবল' ছদ্মনামে বা স্বনামে, প্রমথ চৌধুরী অগণ্য বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার সুযোগ করে নেন। প্রাক-'সবুজপত্র' পর্যায়ে তাঁর প্রবন্ধে 'বীরবলী' ঢঙ থাকলেও 'সবুজপত্রে' তা আরও ব্যাপকতা লাভ করে।

তাঁর প্রবন্ধের মূল সুর বিষয় নয়, বলার ব্যাপারটাই বড় হয়ে উঠেছে। 'সবুজপত্রে' 'তিনি

১. ড. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রমথ চৌধুরী, ১৯ পৃঃ দ্রঃ।
২. ড. রথীন্দ্রনাথ রায়, বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী, ৯৫ পৃঃ।
৩. ঐ, ২২০ পৃঃ দ্রঃ।

বাংলার সাহিত্যিক সমাজকে শিখিয়ে দিলেন—নীরস বস্তুকে কি করে সরস করে পরিবেশন করতে হয়, লিখতে জানলে বাংলার প্রজাস্বত্ব আইন থেকে (রায়তের কথা) ইতিহাস (অনু হিন্দুস্থান) পর্যন্ত সব বিষয় নিয়ে 'সাহিত্য' রচনা করা যায়।'[১]

নানা কষ্টিপাথরের বিচারে প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যের বড় সম্পদ। প্রবন্ধগুলিতে মনের সর্বাঙ্গীন মুক্তির আহ্বান, উপদেশ ও আচরণে প্রাচীন ও নবীন সংস্কারের অন্ধতা থেকে মুক্তি, অর্থহীন বন্ধন থেকে মুক্তি।[২]

চলিত গদ্যের আন্দোলনের ইতিহাসে 'সবুজপত্র' ও প্রমথ চৌধুরীর অবদান সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। 'সবুজপত্রের' আগেও 'আলাল', 'হুতোম', 'গুপ্তকথা' সাহিত্যে চলিত রীতি চালানোয় সচেষ্ট ছিল। কিন্তু সাধুগদ্যের রাজপথে তা কেবল ঘোড়সওয়ারের পাশে পাশে পায়ে হাঁটা পথিকের মতই নগণ্য মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরী' ইত্যাদি পত্রধারা চলিত ভাষায় লিখেও 'সবুজপত্র' প্রকাশকাল পর্যন্ত গতানুগতিক সাধুগদ্যেই সমস্ত সাহিত্য-কর্ম লিখতে থাকেন। সেই পটভূমিতে 'সবুজপত্র' ওই আন্দোলনকে বড় আকারে রূপ দেয় এবং রবীন্দ্রনাথের মত বড় মাপের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বকেও সামিল করার গৌরব অর্জন করে।

গদ্যশিল্পী 'বীরবল' বা প্রমথ চৌধুরীও বাঙালির মুখ থেকে গদ্যভাষার উপাদান তুলে আনেন। সমালোচক অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, প্রাক্-প্রমথ কালের তুলনায় আজকের বাংলা গদ্য অনেক সংহত, তার গতি অনাড়ষ্ট, জটিলকে স্বচ্ছন্দ প্রকাশের প্রসাদগুণ তার অনেক বেশি। এর মূলে প্রমথ চৌধুরীর আদর্শের প্রভাব অনেকখানি। 'বাংলা গদ্যের ভাষা ও রচনারীতিতে তিনি যে পরিবর্তন এনেছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর বড় দান বলে তা স্বীকৃত হবে। কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গিতে তাঁর বলার বিষয় যদি চাপা পড়ে তা হবে দেশের দুর্ভাগ্য। এই ঋজু কঠিন তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে তিনি যা বলেছেন তার প্রধান কথা হচ্ছে মন ও সাহিত্যের মুক্তির কথা। সে কথা বলার প্রয়োজন চিরকাল থাকবে। এবং আজকের দিনে তার প্রয়োজন বোধ হয় সবচেয়ে বেশি।'[৩]

আমরা তাঁর গল্প প্রবন্ধ থেকে এই 'ঋজু কঠিন তীক্ষ্ণ ভঙ্গির' পরিচয় করতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। যথা :

'এ কথা শুনে আমরা একটু উতলা হয়ে উঠলুম, কেননা একা সীতেশের নয়, আমাদের সকলেরই বাড়ি যাবার তাড়া ছিল। ঝড়বৃষ্টি আসবার আশু সম্ভাবনা আছে কি না তাই দেখবার জন্য আমরা চারজনেই বারান্দায় গেলুম। গিয়ে আকাশের যে চেহারা দেখলুম তাতে আমার বুক চেপে ধরলে গায়ে কাঁটা দিলে।'

(চার-ইয়ারি-কথা)

'সবুজপত্রে' ১৩২২ চৈত্র থেকে ধারাবাহিকভাবে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ সন পর্যন্ত 'চার-ইয়ারি কথা' প্রকাশিত হতে থাকে। এতে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ-পত্রধারার প্রভাব লক্ষ্য করি। তদ্ভব শব্দ

১. ড. জীবন্দ্রে সিংহ রায়, প্রমথ চৌধুরী, ১৯ পৃঃ।
২. অতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম খণ্ড), ভূমিকা।
৩. ঐ

প্রধান। তবে সমাসবদ্ধ ও বড় বড় শব্দ কম।

আবার প্রায় একই কালে রচিত 'সবুজপত্র' শীর্ষক প্রবন্ধের ভাষারূপ আগের ভাষার ঠিক উল্টো। অর্থাৎ তদ্ভব শব্দের সংখ্যাই কম অন্যান্য বড় বড় শব্দের চেয়ে। একে সাধু গদ্যের সঙ্গে আপোষ করা চলিত বললেই ভাল হয়। যথা : 'বাংলাদেশ যে সবুজ, এ কথা বোধ হয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য লোকেও অস্বীকার করবেন না। মার শস্যশ্যামল রূপ বাংলার এত গদ্যে পদ্যে এতটা পল্লবিত হয়ে উঠেছে যে, সে বর্ণনার যাথার্থ্য বিশ্বাস করবার জন্য চোখে দেখবারও আবশ্যক নেই। পুনরুক্তির গুণে এটি সেই শ্রেণীর সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার সম্বন্ধে চক্ষু কর্ণের যে বিবাদ হতে পারে, এরূপ সন্দেহ আমাদের মনে মুহূর্তের জন্যও স্থান পায় না।'

(বৈশাখ ১৩২১)

বড় আকারের বাক্য প্রয়োগে এ গদ্য অনন্যতা লাভ করেছে। ধনুকের ছিলার মত বেঁকে যায়, কিন্তু ভাঙে না। এ গদ্য পড়তে গিয়ে আমাদের জিহ্বার লাফালাফি বড় বেশি হয়। ড. জীবেন্দ্র সিংহ রায় তাই বলেন, 'বীরবলের লেখা পড়বার সময় তাঁর ভাষার গঠন বারে বারে আমাদের মনোযোগ ও জিহ্বার জোর আকর্ষণ করে এবং তা সহজ ও স্বাভাবিক নয়, বরং কৃত্রিম বলেই মনে হয়।'[১]

অতএব বুঝতে পারা গেল, বীরবলের গল্প ও প্রবন্ধের ভাষারূপ ঠিক এক জাতের নয়। গল্পের ভাষা আমাদের কথাবার্তার ভাষার উপর দাঁড়িয়ে, আর প্রবন্ধের ভাষা সাধুভাষার আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে। এই সাধু-ঘেঁষা কৃত্রিম চলিতরীতি প্রবর্তনার জন্যেই তাঁর কৃতিত্ব। 'আলালী-হুঁতোমী' চলিতরূপের থেকে বীরবলের ভাষারূপের তফাৎ এখানেই।

আবার গল্প থেকে একটা উদাহরণ : 'আমি বললুম, "কি nonsense হে?" সুপ্রসন্ন বললেন, "তোমাদের এই বাংলা বইয়ে যা লেখা হয় তাই। সাধে ভদ্রলোকে বাংলা পড়ে না। এই বইখানা খুলেই দেখি লেখক বলছেন, ছোটোগল্প প্রথমত ছোটো হওয়া চাই, তারপর তা গল্প হওয়া চাই। কি চমৎকার defination! এর পরেও লোকে বলে বাঙালির শরীরে লজিক নেই।"

অনুকূল এই শুনে একটু হেসে উত্তর করলেন, "ওহে অত চট কেন? দেখছ না, লেখক নিজের নাম রেখেছেন 'বীরবল'? ঐ থেকেই তোমার বোঝা উচিৎ ছিল যে ও হচ্ছে রসিকতা?"'

(ছোটগল্প)

প্রবন্ধের থেকে এতে অনেকটা কথাবার্তার স্বাভাবিক মেজাজটা লক্ষণীয়। এই হচ্ছে শিষ্ট সমাজের কথ্যভাষা। রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূতের' মতো এখানেও একটা তর্ক লাগিয়ে দেন, তারপর নানা প্রসঙ্গ জমে ওঠে। শেষে এই ফাঁকে মূল গল্পটা বলে দিয়েই বিতর্কের অবসান ঘটান। কখনও এই বিতর্ক নাটকীয় রূপ নেয়, যেমন, সিরিয়াস বিষয়ের উপর রচিত প্রবন্ধের মাঝখানে হঠাৎ নিখাত সাহিত্য রস বা গল্পরস আমদানি করেন। উদ্দেশ্য গল্প ও প্রবন্ধের হাত ধরাধরি ভাব। এই রকম প্রবন্ধ থেকে একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। যথা : 'মোটামুটি তাঁদের বক্তব্য এই যে, লাট-দরবারে তাঁরা ঢুকলে বাংলাদেশকে সেই দেশে পরিণত করবেন, যে দেশে আমাদের মেয়েরা খোকাবাবুর বিয়ে দিতে চায়, অর্থাৎ যে দেশে—

১. প্রমথ চৌধুরী, ১৩৮ পৃঃ দ্রঃ।

লোকে গাই বলদে চষে,
দাঁতে হীরে ঘষে,
রুই মাছ পালঙের শাক ভারে ভারে আসে।

এ সংকল্প যে অতি সাধু সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু সন্দেহ আছে তার সিদ্ধির উপায় নিয়ে। স্বদেশকে 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' করে তোলবার উপায় সম্বন্ধে এঁরা নীরব।'

(রায়তের কথা, ১৩২৬ সন)

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই, বাংলা গদ্যে প্রমথ চৌধুরী বলার ভঙ্গি বা স্টাইলের জন্যে বেঁচে থাকবেন। সহজ কথাকে তিনি ভেঙে দুমড়িয়ে তির্যক ব্যঙ্গের সানপালিশ দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তাঁর শব্দচয়ন, বাচনভঙ্গি, কথার মারপ্যাঁচ ও অলঙ্করণ ইত্যাদি সব মিলে ভাষার এমন একটা রূপ দাঁড়িয়ে গেছে যা সবার পক্ষে সুবোধ্য নয় এবং তাকে কোন বিশেষ স্থানের কথাবার্তার ভাষা বলতেও অনেকের আপত্তি।[১] অনেক ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু সাধারণ হলে, ভাষা কেবল বাক্‌চাতুরীতে পরিণত হয়।[২] তবে তা প্রবন্ধের ভাষাতেই বেশি।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'য় 'বীরবলীরীতির' প্রভাব ফেলেছে তা প্রমথ চৌধুরীর গর্বের বিষয়।[৩] 'সবুজপত্র'-উত্তর বাংলা চলিতরূপে ওই বাক্‌চাতুরীটুকু ছাড়া আর সবই এসে পড়েছে। চলিত গদ্যরীতির ইতিহাসে 'সবুজপত্র' ও প্রমথ চৌধুরীর গুরুত্ব এইখানেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হইনি।'[৪]

৩.

কল্লোল

'সবুজপত্র'-পরবর্তীকালে 'কল্লোল' পত্রিকাকে ঘিরে রবীন্দ্র-বিরোধী আর একটি সাহিত্য গোষ্ঠীর সূচনা হয় (১৯২৩ সাল)। এই পত্রকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যের জোয়ার এসেছিল তার অনেকটাই বিদেশি রূপরীতি ও ভাবের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ঐ পত্রের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসে ও গল্পে যে-সব সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছিল, তা এতকাল গোপনই ছিল। তাঁদের বলার বিষয় ও ভঙ্গি দুই-ই ছিল নতুন। মনোবিকার, দারিদ্র্য, নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক ধঃপতন—যে কোন ব্যাপার নিয়ে তাঁরা গল্প, উপন্যাস লিখেছেন, তার পিছনে একটা বাস্তববোধ-সম্মত-বলিষ্ঠ প্রবণতা কাজ করেছিল। তাঁরা পুরাতন সংস্কারকে ভেঙে সেখানে একালের নতুন সংস্কারকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তী কালের অনেক খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিকের অনেকেই 'কল্লোলের' পাতাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। 'বঙ্গদর্শন' ও 'সবুজপত্রের' মতই 'কল্লোল'ও বাংলা সাহিত্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র। অবশ্য এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।[৫]

১. ড. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রমথ চৌধুরী, ১৩৭-১৩৮ পৃঃ।
২. ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ১৭৯ পৃঃ।
৩. ঐ
৪. গল্প সংগ্রহ, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৫. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য, ভূমিকা দ্রঃ।

সূত্রে ঢাকায় যান। সেখানে তিনি এক সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। তারপর 'ভারতীর' আসর ভেঙে গেলে পর, তাঁদের কয়েকজন তরুণ ঢাকা-গোষ্ঠীর সহায়তায় কলকাতায় 'কল্লোল' পত্রিকার সূচনা করলেন (১৯২৩ সালে)। এই পত্রের বীজবপন হয়েছিল ঢাকায়– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের বার্ষিক পত্রিকা 'বাসন্তিকায়' (১৯২২)। কিন্তু ছাত্রনিবাসে সে বীজ বড় হতে পারেনি।[১] 'কল্লোল' একটু বেড়ে উঠলে ঢাকায় তার একটা কচি শাখাও দেখা দেয় 'প্রগতি' (১৯২৭)।

কিন্তু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোলের' বীজবপন প্রসঙ্গে আর এক কথা শুনিয়েছেন। বলেন যে, গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, মণীন্দ্রলাল বসু ও সুনীতি দেবী মিলে 'ফোর আর্টস ক্লাব' গঠন করেন। ওই চারজনে 'ঝড়ের দোলা' নামে একটা গল্পবইও প্রকাশ করেন। প্রত্যেকের একটা করে গল্প ছিল ওতে। পরে মাসিকপত্র বের করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুবছর বাদে ক্লাব উঠে গেল।[২] তার পরের বছর 'কল্লোল' বেরোল।

'কল্লোল' ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ খৃঃ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। তারপর দেনার দায়ে সম্পাদক পত্রটি বন্ধ করে দেন।[৩]

'কল্লোল' নামটা কি করে রাখা হয়েছিল, সেটা গোষ্ঠীর অনেকের লেখার মধ্যে দিয়েই ফুটে ওঠে। দীনেশরঞ্জন দাশ বলেন, 'নাম ঠিক করিয়া ফেলিলাম—কল্লোল।'[৪] তিনি 'কল্লোল'-নামে একটা কবিতা প্রথম সংখ্যায় লেখেন। ওই নামে ওই সংখ্যাতে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের লেখা একটা প্রবন্ধও ছাপা হয়।

দীনেশরঞ্জন 'কল্লোল' সম্পর্কে আর্ত-পীড়িত মানুষের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। 'কল্লোল'-এ মানুষের দুঃখকষ্টের ভাষা ব্যক্ত করার আশা প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

'আশা আছে তবু যদি কোন দিন শত শত যুগ পরে
বধির শিলায় ফেটে যায় বুক
গুঁড়াইয়া যায় তার নিজ সুখ,
জল-কল্লোল তুলি ভীমরোল বক্ষ তাহার ভরে।'

এই দুঃখ বেদনার আশা ব্যক্ত করার দিক দিয়ে 'কল্লোল' এই কালে নতুন কথা শুনিয়েছে। শুধু দুঃখ যন্ত্রণা নয় যুগধর্মকে প্রকাশ করাও এই পত্রের লক্ষ্য ছিল। তাই দেখতে পাই 'কল্লোলের কালের কথা কল্লোলে বলা হয়েছে।'[৫] সমসাময়িক কালের চিন্তা-ভাবনা, জীবনের অস্থিরতা, বিভিন্ন সমস্যা 'কল্লোলে' প্রকাশ করা হয়েছে। বস্তুত 'কল্লোল' যুগে দুটো প্রধান সুর ছিল—এক প্রবল বিরুদ্ধবাদ, দুই বিহ্বল-ভাব-বিলাস। একদিকে অনিয়মাধীন উদ্দামতা, অন্যদিকে সর্বব্যাপী নিরর্থকতার কাব্য। একদিকে সংগ্রামের মহিমা, অন্য দিকে ব্যর্থতার মাধুরী। আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারিত হচ্ছে—এই যন্ত্রণাটা সেই যুগের যন্ত্রণা।[৬] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাই মন্তব্য করেছেন : 'তাই একদিকে যেমন

---

১. ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, ২৫৮-৫৯ পৃঃ।
২. কল্লোল যুগ, ৪ পৃঃ দ্রঃ।
৩. কল্লোল ১৩৩৬ পৌষ দ্রঃ।
৪. ড. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, কল্লোলের কাল, ১৯ পৃঃ।
৫. কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য, ড. দেবকুমার বসু, ১১ পৃঃ।
৬. কল্লোল যুগ, ৬৫-৬৬ পৃঃ।

তার বিপ্লবের অস্থিরতা, অন্যদিকে তেমনি বিফলতার অবসাদ। যাকে বলে 'ম্যালাডি অব দি এজ' বা যুগের যন্ত্রণা তা কল্লোলের মুখে স্পষ্ট রেখায় উৎকীর্ণ।'[১]

'কল্লোলের' সাফল্যে কেউ একে 'কল্লোল যুগ' বলে মন্তব্য করেছেন, আর কেউ বা 'কল্লোলের কাল' বলে চিহ্নিত করেন। 'বঙ্গদর্শন' ও 'সবুজপত্র' যেমন বাংলা সাহিত্যের কাল নিরূপক মাপকাঠি, কল্লোলও সেই রকম গুরুত্ব পেতে পারে বলে—ঐ সব সমালোচকদের মন্তব্যের কারণ। কিন্তু সেটা বিতর্কের ব্যাপার। যদি কেউ 'কল্লোলগোষ্ঠীকে', 'ভার্জিনিয়া উল্‌ফের' 'ব্লুম্‌সবেরী গ্রুপের' সঙ্গে সমতুল্য করতে চান তাতে আপত্তি হবার কথা নয়। কিন্তু কল্লোলকে একটা যুগের মুখপত্র বলে নির্দেশ করলে কেউ কেউ হয়ত প্রতিবাদ করতে পারেন। সে বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে না গিয়েও বলতে হয়, 'কল্লোল' বাংলা সাহিত্যকে কিছু উপহার দিতে পেরেছে। এই পত্রের সঙ্গে যুক্ত কথাশিল্পীদের অনেকে পরবর্তীকালের বাংলা গল্প-উপন্যাসে নিজ নিজ মৌলিকতা দেখিয়ে সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করার গৌরব অর্জন করেন। কেউ কেউ বিষয় ও ভঙ্গিতেও নতুন পথ দেখান। সমালোচক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় : 'কল্লোল গোষ্ঠীরা' আমাদের পশ্চিম দিকের বাতায়ন ভালো করে খুলে দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।'[২]

'বঙ্গদর্শন' ও 'সবুজপত্রের' সঙ্গে 'কল্লোলের' একটি পার্থক্য আছে। 'বঙ্গদর্শনে' মুখ্যত বঙ্কিমচন্দ্র, 'সবুজপত্রে' বীরবল, 'কল্লোলে' তেমন একক ব্যক্তিত্বের প্রকাশের বদলে একাধিক কথাসাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ লক্ষণীয়। সেই জন্যেই এখানে আমরা বিশেষ কোন গদ্য লেখকের গদ্যের আলোচনায় যাব না।

'সবুজপত্রের' মত 'কল্লোল' কোন ভাষারীতির আন্দোলনে অংশীদার হয়নি। এই পত্রে চলিতরীতিও থাকত, সাধুরীতিও স্থান পেতো। আগেই বলা হয়েছে, এঁরা প্রধানত যুগধর্মকে নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে। তাঁদের সেই বক্তব্য চলিতেই হোক বা সাধুতেই হোক আটকায়নি। তবে 'সবুজপত্রের' ভাষা-আন্দোলন কোন কোন লেখককে নাড়া দিতে পারে, সেকথা বলাই বাহুল্য। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা ভাষা ব্যবহারে 'কল্লোলের' ভূমিকার পরিচয় নিতে পারি। যথা : 'বাড়ির সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে শুধু শ্রীশের ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। মায়া দীপ্তিকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, দেখ, Sinner have no rest! শ্রীশদা এখনও বসে বসে লিখছে। কিন্তু কি লিখছে জানিস?
দীপ্তি। আমি জগতের অনেক জিনিসই জানি না বা বুঝতে পারি না, আমার দাদাটি তার মধ্যে একটি। জন্মে অবধি ওকে দেখছি, কিন্তু ওই পর্যন্ত। ওকে বুঝতে পারলাম না।'

(পথিক, গোকুলচন্দ্র নাগ)

প্রথম সংখ্যা থেকে 'কল্লোলে' প্রকাশিত গোকুলচন্দ্র নাগের 'পথিক' উপন্যাসের অংশ তুলে দেওয়া হল। সাধুভাষায় রচিত। তবে সহজ সাধু। প্রত্যক্ষ উক্তিতে চলিত গদ্য পাচ্ছি। কলকাতার শিষ্ট-সমাজের মৌখিক ভাষার রূপ। তাই স্বভাবতই ইংরেজি কথাও ঢুকে পড়েছে।

আবার প্রথম বর্ষ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সাধুরীতির গল্প থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 'রূপসা কয়লাকুঠির সাঁওতাল কুলিগুলো সব ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। এই দুরন্ত বর্ষার দিনে

১. কল্লোল যুগ, ৬৫-৬৬ পৃঃ।
২. কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য, ভূমিকা।

ছাতি ব্যতীত কেমন করিয়া চলিবে? একে ত ঘরের ফুটা চাল গড়াইয়া জল পড়িবে, তাহার উপরে ছেলে মেয়ে সকলে মিলিয়া নাঙ্গাশিরে চলাফেরা করিলে পরিণাম যাহা হইবে তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। কোম্পানি ছাতা কিনিয়া দিবে না, নিজেদের তেমন সঙ্গতি নাই যে পয়সা খরচ করিয়া কিনিবে। নিকটে বন-জঙ্গল থাকিলেও বা শিয়াড়ি পাতায় ছাতা প্রস্তুত করিয়া লইত।'

(ঝমরু. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়)

'কল্লোলের' নিয়মিত লেখক এবং পরবর্তী কালে আঞ্চলিক উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন, সেই শৈলজানন্দের 'ঝমরু' গল্প থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। দেখতে পাচ্ছি, এই গদ্যের ভাষা সরল--ক্রিয়াপদ ছাড়া সবই চলিতরূপের। এই অনাড়ম্বর সাধুগদ্য ব্যবহারে 'কল্লোলের' ভূমিকা প্রশংসনীয়।

আবার কেবল চলিত গদ্যেও অসংখ্য গল্প উপন্যাস ছাপা হয়েছে 'কল্লোলে'। চতুর্থ বর্ষ আশ্বিন মাসে প্রকাশিত 'বেদে' উপন্যাস থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক : 'ন' পেরিয়েছি, কিন্তু আহ্লাদিকে দেখেই আমার ভালো লাগল।

জীবনারম্ভের সেই প্রথম ভালো-লাগাটি আজকের বিষণ্ণ অপরাহ্নে ঠিক ধরতে পারছি না। সেটা ভৈরবী না ভূপালির সুর তাও বা কে বল্‌বে?

--কাদায় পড়ে গিয়েছিলি বুঝি?

আমি কথা বলতে পারছিলাম না। কাঁদছিলাম।'

(বেদে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

সহজ ভাব সহজ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। এর মধ্যেই ভাষার কারিকুরি চোখে ধরার মত। 'অপরাহ্ন' শুধু হাতে নেই--'বিষণ্ণ' বিশেষণ সহযোগেই গদ্যের সারিতে বসেছে।

আমরা ইতিপূর্বে সাধুগদ্যে বহু গদ্যলেখকের রচনা-কৌশল দেখেছি, বিস্মিতও হয়েছি। আবার 'বীরবলী' ভাষার ধারও দেখেছি, দেখেছি চলিত রীতির কত শক্তি। বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা' থেকে এমনি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি : 'এইমাত্র সূর্য অস্ত গেল। আমাদের সামনে পূবদিক--সন্ধ্যারানীর লাজনম্র রক্তাভ মায়াটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি নে, যেন আমরা দেখছি খুব মস্ত এক টুকরো আকাশ--কুয়াশার মত অস্পষ্ট ; তার রংটা ঠিক চেনা যাচ্ছে না --মনে হচ্ছে, কে যেন তার মুখ থেকে সমস্ত রঙের ছোপ মুছে নিয়েছে অমন বিবর্ণ বিশ্রী, ম্লান চেহারা, আমাদের দেশে আকাশে বড় একটা হয় না।'

(রজনী হল উতলা, বুদ্ধদেব বসু)

কবিতার মত অলঙ্করণ-সমৃদ্ধ এই চলিতরীতি ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের হাতেই আত্মপ্রকাশ করে। এখানে তারই প্রভাব দেখতে পাই। 'সন্ধ্যারানীর লাজনম্র রক্তাভ মায়া', 'আকাশের মুখ থেকে রং-এর ছোপ মুছে নিয়েছে', আবার এই আকাশটা মানুষের মুখের মত 'বিবর্ণ'-'বিশ্রী' এবং 'ম্লান চেহারা' যুক্ত। এ যেন কবি বুদ্ধদেব বসুর কবিতা।

আবার চলিত ভাষার শোষণশক্তিরও পরিচয় ইতিপূর্বে কাব্য-কবিতায় পেয়েছি। গদ্যেও পাওয়া গেছে। 'কল্লোল' প্রথম বর্ষ আশ্বিন সংখ্যা থেকে তেমনি একটা উদাহরণ দিচ্ছি : 'সমাজের কি দাবী আছে আমার উপর? আমি তাকে গ্রাহ্য করি না। কেন করব? অত্যাচারী পাষাণে গড়া ধনীর পদলেহী সমাজ, তোমার ছদ্মবেশের আবরণ উন্মোচন করে তোমার বীভৎসতা লোকের চোক্ষে প্রকাশ করে দেব। এই পোশাকপরা ভদ্রতার ছদ্মবেশী বর্বর

হৃদয়হীন সভ্যসমাজ ছেড়ে সভ্যতার ছলাকলা-অজ্ঞ-হৃদয়বান এই কুলির দলে মিশে তাদের বিদ্রোহী করে তুলবো,--এই নির্মম অবিচারক সুসভ্য সমাজের বিপক্ষে।'

(বিদ্রোহের ডায়েরী, ভূপতি চৌধুরী)

শ্রমিক-মালিক তিক্তকর সম্পর্কের বাতাবরণে অত্যাচারী নিঃস্ব সাম্যবাদী মনোভাবাপন্ন শ্রমিকের জ্বালাময়ী উক্তি চলিত গদ্যে দেখি। এতে তৎসম ও যুক্তব্যঞ্জনের ছড়াছড়ি। ভাষা গম্ভীর অথচ মার্জিত বীরবলী ঢঙকে মনে করায়।

'কল্লোলে' প্রকাশিত গল্প-উপন্যাস থেকে কিছু কিছু লাইন তুলে দিয়ে আমরা চলিত ব্যবহারের দিক থেকে কল্লোলগোষ্ঠীর কৃতিত্বের আরও কিছু পরিচয় নিতে পারি। শব্দচয়ন, বাক্‌বিন্যাস, ভঙ্গি, সবেতেই তাঁরা গতানুগতিকতা থেকে সরে আসতে চেয়েছেন। যথা :

'পথ আগলে রক্তচক্ষু বাতিগুলি পাহারা দেয় অসম্পূর্ণ রাস্তার ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের পোষ্টগুলি সৈন্যশ্রেণীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে।'

(আগামীকাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র)

'তবু যখন দেখি আমারই পাশের টেবিলে আমার চেয়ে হতভাগ্য কেরানীর দল নিশ্চিত ঔদাসীন্যে হাসছে, গল্প করছে, পরনিন্দা, পরচর্চা করছে, স্বদেশ উদ্ধার, কত কি করছে তখন যন্ত্রণায় আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে।'

(দুনিয়াদারি, সরোজকুমার রায়চৌধুরী)

'বাড়ীতে গেলে সেই ঘেনর ঘেনর কেন বাপু? দিনে ১৮ ঘণ্টা খেটে দুমিনিট বাড়ী যাব তাও সইবে না। ধুৎ-তোর মাগ ছেলে। বোতল উড়িয়ে দিয়ে আবার মেশিনের পাশে বসে পুরোদমে কাজ চালালাম।'

(মেশিনের পাশে, তারানাথ রায়)

এমনি অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, যাতে করে 'কল্লোলে' চলিত গদ্য ব্যবহারের পরিচয় মেলে। 'সবুজপত্রের' চলিতরীতির আন্দোলনে 'কল্লোল' জড়িত না হয়েও চলিত গদ্য প্রকাশ করে ভাষার আন্দোলনকে পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দিয়েছে। আবার সাধুরূপ ব্যবহৃত হলেও সে সাধুরূপ চলিত উপাদানে অনেকটা সরল। তার উপর চলিতরীতির আন্দোলনের কাণ্ডারী প্রমথ চৌধুরীর 'প্রিনস্'[১] ও 'বীরপুরুষের লাঞ্ছনা'[২] গল্প ছাপিয়ে 'কল্লোল' প্রকারান্তরে সেই ভাষা-আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছে বললে, ভুল বলা হবে না।

১. কল্লোল, বৈশাখ ১৩৩১ সন।
২. ঐ, কার্তিক ১৩৩১ সন।

নবম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের গদ্য

পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-ক্ষমতার প্রকাশ বহুমুখী--গদ্য, পদ্য, নাটকে, সঙ্গীতে ও চিত্রেও তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা শতধারায় উৎসারিত হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, তাঁর বিপুল কবিকৃর্তির অতিভাস্বর দীপ্তি তাঁর গদ্য রচনাকে কিছুটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে শুধু যে একজন বিশিষ্ট কবি তা নন, প্রথম সারির গদ্যশিল্পীও বটেন--এই সরল সত্যটি আমরা অনেকেই ভুলে যাই।

ভাষণ ও গদ্য নাটকগুলো নিয়ে প্রায় ১০৭টির মত গদ্য গ্রন্থ রচনা করে তিনি বাংলা গদ্যে নিজের আসন পাকা করে নেন। সতের বছর বয়স থেকে[১] তিনি গদ্যের কলম হাতে করেছেন ও মৃত্যুর আগে অবধি তাঁর কলমের তেজ অব্যাহত ছিল। উপন্যাস-গল্প, নাটক তো আছেই, আরও আছে সমালোচনা, আলোচনা, সাহিত্যতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ, সংগীত, শিক্ষা, ভ্রমণ, ভাষণ আরও অনেক কিছু। বাংলা গদ্যসাহিত্যের কোন কিছুই সে তালিকার বাইরে নেই। তাঁর কালজয়ী প্রতিভার পরশ গদ্যের যেখানে লেগেছে, তা-ই হয়ে উঠেছে সর্বকালের সাহিত্যের প্রেরণার সামগ্রী। তাঁর পত্র তাই হয়ে উঠেছে পত্র-সাহিত্য। সমালোচনা হয়ে উঠেছে সৃষ্টি। তার উপর বাংলা ছোটগল্পের তিনি রাজা। উপন্যাস নাটক ছন্দ ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় তিনি খুলে দিলেন নতুন দিগন্ত। এক কথায়, বাংলা গদ্যসাহিত্যেব ইতিহাসে এখনো তিনি শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পীর আসনেই প্রতিষ্ঠিত আছেন।

এখন তাঁর সেই বিপুল গদ্যশিল্প সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন জড়িত দেখি। প্রথম, এই গদ্য পুরোপুরি আলাদা একটা প্রকাশরীতি, না, অনেকটা কবির কাব্য-ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত, অথবা কাব্যেরই একটা অধীনস্থ শাখা কিনা। দ্বিতীয়, কবির কাব্যের বিবর্তন আছে, স্তরভেদ আছে, এই অগ্রগতির সঙ্গে গদ্যের বিবর্তনের কোন যোগ আছে কিনা। তৃতীয়, কাব্যের যে কোন প্রেরণার মাধ্যমে রূপ ও ভাবনার রূপান্তর দেখি, গদ্যও তেমন কোন প্রেরণা-সঞ্জাত কিনা! রবীন্দ্র-কবিতায় রূপ-নির্মিতি ও ভাবনার এক এক জায়গায় বাঁক ফিরেছে। সে তুলনায় গদ্য পুরোপুরিই বিষয়-নির্ভর। এখানে বাঁক বা মোড় ফেরার ব্যাপারটা স্পষ্ট নয়। তার কারণ একই সঙ্গে একাধিক বিষয় এবং একাধিক রূপ-মাধ্যমে গদ্য দেখা দিয়েছে। একই সঙ্গে গল্প উপন্যাস নাটক লিখেছেন যেমন, তেমনি আলোচনা, সমালোচনা, ভাষাতত্ত্ব, রাজনীতি, ভ্রমণ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে গদ্য লিখেছেন। কোথাও কথ্য গদ্য, কোথাও সাধুরীতি, আর কোথাও বড় বড় শব্দ ভারে তা গম্ভীর। কবিতায় এ ব্যাপারটা প্রায় নেই বললেই চলে।[২]

আবার কবিতায় Style-এর পরিণতি যত সহজে ধরা যায়, গদ্যের বেলায় ততটা সুস্পষ্ট অনুভব সম্ভব নয়।[৩] রবীন্দ্রকাব্যে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' পর থেকেই রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রমোন্নতিশীল। রবীন্দ্রগদ্যের বেলায় রীতিটি দ্বিধাগ্রস্ত, লেখক-ব্যক্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিক নানা ঘটনা তার জন্য দায়ী।[৪]

---

১. রবীন্দ্র রচনাবলী, (জন্মশতবর্ষ সং) ১৫ খণ্ড, ভাষার কথা, ২০৫ পৃষ্ঠা দ্রঃ।

২. ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-সৃষ্টি সমীক্ষা, প্রথম খণ্ড, ২১৪-২১৫ পৃঃ দ্রঃ।

৩. ঐ

৪. ঐ

রবীন্দ্রনাথের আগে আর কোন কবি-সাহিত্যিক গদ্য পদ্যের জোড় কলম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেননি। মধুসূদন গদ্য লিখতে পারতেন না, বঙ্কিমচন্দ্র পদ্য লিখতে পারতেন না, যদিও কবিত্বগুণ বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক রচনায় ছিল। রবীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের জোড় কলম নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিলেও তাঁর গদ্যকে পদ্য প্রভাবিত ও চালিত করেছে, তা বিস্ময়কর।[১] তাঁর পদ্যের কলমটাই যেন মাঝে মাঝে গদ্যের ছদ্মবেশ পরে। সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর ভাষায়, 'এ যেন রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ।'[২]

আবার কালের দিক থেকে ১৮৯৪ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সাতচল্লিশ বছর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের কাল। এর মধ্যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক-পট নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ভারসাম্য বজায় থাকেনি। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও তার ছায়াপাত ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ যখন লিখতে শুরু করেন তখন ইংরেজ শুধু দেশের শাসক নয়, কল্যাণকারী একটি শক্তিও। কিন্তু জীবনের শেষে সেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী একটা দুষ্ট শক্তিমাত্র। ১৮৯০ সালে 'মন্ত্রী অভিষেক' প্রবন্ধ এবং ১৯৪১ সালে মৃত্যুর মাস কয়েক আগে প্রকাশিত 'সভ্যতার সংকট'— এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভাব ও ভাষায় প্রথমটির বিপরীত দ্বিতীয়টি। 'একটিতে পূর্ণ আস্থা আর একটিতে সম্পূর্ণ অনাস্থা'[৩]। ভাষারীতির দিক থেকেও এটি সত্য। প্রবন্ধের প্রকাশরীতি এতকাল সাধারণত সাধুগদ্যের খাতেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। শেষের দিকে সেটা পরিত্যাগ করে শুধু কথ্যরীতিকেই অবলম্বন করে গদ্যের কলম ধরে এগিয়ে এসেছেন। দীর্ঘকালের 'অবহেলিত মরা গাঙটাই প্রবলতর হয়ে উঠল—'কথ্যরীতি' স্থায়ী আসন লাভ করলো।'[৪]

আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্র-গদ্যে কথ্য বা চলিত রীতির ক্রম ব্যবহার। সেদিক থেকে নজর রেখে আমরা তাই প্রকাশ মাধ্যম ধরেই তার ভাষারূপের পরিচয় নেব।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, 'ক্ষণিকায়' তিনি প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকৃত বাংলা[৫] ও প্রকৃত বাংলার ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। তখন তিনি সেই ভাষার শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য প্রথম স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন। তিনি আরও মন্তব্য করেন : 'দেখিলাম এ ভাষা পাড়াগাঁয়ের টাট্টুঘোড়ার মতো কেবলমাত্র গ্রাম্য ভাবের বাহন নয়, ইহার গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশি।'[৬]

তারপর তিনি দুই রূপেই কবিতাকর্ম করেন। কারণ, 'ক্ষণিকায়', তিনি কোন একটা 'পাকামত' খাড়া করে লেখেননি। তিনি বলেছেন, 'আমার ভাষা রাজাসন এবং রাখালী, মথুরা এবং বৃন্দাবন, কোনোটার উপরেই আপন দাবী সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই।'[৭]

তথাপি তাঁর কবিজীবনের শেষপাদে এক অনাড়ম্বর আটপৌরে গদ্যছন্দের সহজ পথকেই তিনি বেছে নেন পুনশ্চ, শেষ সপ্তক ইত্যাদি গ্রন্থে। গদ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু ভিন্ন চিত্র চোখে পড়ে। তিনি তাঁর ব্যবহৃত ভাষারূপ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'এইখানে বলা আবশ্যক

১. বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, ভূমিকা, ১৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. ঐ, ঐ
৩. প্রমথনাথ বিশী, বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, ১৩৮-১৩৯ পৃঃ।
৪. ঐ, ১৩৯ পৃঃ দ্রঃ।
৫. চলিত বাংলাকেই কখনো কখনো প্রকৃত বাংলা বলেছেন।
৬. রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবর্ষ সং), ১৫ খণ্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৭. ঐ

চিঠিপত্রে আমি চিরদিন কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়াছি। আমার সতেরো বছর বয়সে লিখিত "য়ুরোপ যাত্রীর পত্রে" এই ভাষা প্রয়োগের প্রমাণ আছে। তা ছাড়া বক্তৃতা সভায় আমি চিরদিন প্রকৃত বাংলা ব্যবহার করি, "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে তাহার উদাহরণ মিলিবে।'[১]

এই গদ্য নিয়েও রবীন্দ্রনাথের মনে একটা 'কিন্তু' ছিল, সেকথা স্বীকার করে ওই প্রবন্ধে বলেছেন, 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশির ফরমাসে এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়াছিল, সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আসন দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাঁড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই। সীতাকে নির্বাসন দিয়ে ঘাতকর্তার ফরমাশে তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন।'[২]

সুতরাং গদ্যলেখক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক-মানস কি চাইছিলো, সেকথা বুঝিয়ে বলার আবশ্যক নেই।

এখন প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথ কথ্যগদ্য বলতে কি ধরনের কথ্যগদ্য পছন্দ করেন? সে কথাও স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন।[৩] তিনি বলেন, 'আমি যে কথাটা বলিতেছিলাম সে এই— যখন লেখার ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার অসামঞ্জস্য থাকে তখন স্বভাবের নিয়ম অনুসারেই এই দুই ভাষার মধ্যে কেবলি সামঞ্জস্যের চেষ্টা চলিতে থাকে। ইংরেজি গদ্যসাহিত্যের প্রথম আরম্ভে অনেক দিন হইতেই এই চেষ্টা চলিতেছিল। আজ তার কথায় লেখায় সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে বলিয়াই উভয়ে একটা সাম্যদশায় আসিয়াছে। আমাদের ভাষার অসামঞ্জস্য প্রবল, সুতরাং স্বভাব আপনি উভয়ের ভেদ ঘুচাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে আয়োজন চলিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ আইন-কর্তার প্রাদুর্ভাব হইল। তাঁরা বলিলেন, লেখার ভাষা আজ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ইহার বেশী আর তার নড়িবার হুকুম নাই।'

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ লেখার ভাষা ও মুখের ভাষার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটিয়ে ইংরেজির মত একটা 'সাম্যদশার' চেহারা কামনা করেন। এখানে সাম্যদশা বলতে সাধু-উপাদানে চলিত গদের কথা বোঝানো হয়।

তাই 'সবুজপত্র' সম্পাদকের সাথে তিনিও একমত। কারণ, পুঁথির ভাষার প্রাণ কাঁদছে কথার ভাষার সঙ্গে মালাবদল করার জন্য। 'গুরুজন ইহার প্রতিবাদী। তিনি (সবুজপত্র সম্পাদক) ঘটকালি করিয়া কৌলীন্যের নির্মম শাসনভেদ করিবেন এবং শুভবিবাহ ঘটাইয়া দিবেন—কারণ কথায় আছে, শুভস্য শীঘ্রং।'[৪]

রবীন্দ্রনাথ অতঃপর কলকাতার শিষ্ট-সমাজের শিক্ষিতজনের কথিত-ভাষাকেই সাহিত্যের ভাষার পক্ষে বক্তব্য রেখে বলেছেন, 'দিকে দিকে বৃষ্টির বর্ষণ হয় কিন্তু জমির ঢাল অনুসারে একটা বিশেষ জায়গায় তার জলাশয় তৈরি হইয়া উঠে। ভাষারও সেই দশা। স্বাভাবিক কারণেই কলিকাতা অঞ্চলে একটা ভাষা জমিয়া উঠিয়াছে তাহা বাংলার সকল দেশের ভাষা। কলিকাতার একটা স্বকীয় অপভাষা আছে, যাহাতে 'গেনু', 'করনু' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার

১. রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ), ১৫ খণ্ড, ২০৫ পৃঃ দ্রঃ।
২. ঐ।
৩. ঐ।
৪. ঐ।

হয় এবং 'ভেয়ের বে' (ভাইয়ের বিয়ে) 'চেলের দাম' (চালের দাম) প্রভৃতি অপভ্রংশ প্রচলিত আছে, এ সে ভাষাও নয়।'

অর্থাৎ শক্তিমান গদ্যলেখক কলকাতার ভাষাকে নিয়ে নিজ প্রতিভায় কিছু সাধুরীতির উপাদান সহ সঠিক একটা চলিতরীতির সন্ধান দিতে পারেন। মহাকবি দান্তের প্রসঙ্গ টেনে এনে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, কলকাতা অঞ্চলের শিষ্ট-সমাজের ভাষাই সকল বাঙালির সাহিত্য ভাষা।[১]

এখন আমরা রবীন্দ্র গদ্যগ্রন্থ থেকে দৃষ্টান্ত দ্বারা গদ্য বিশ্লেষণ করে তাঁর চলিত ব্যবহারের পরিচয় নিতে পারি। প্রথমেই তাই রেখাচিত্র দ্বারা রবীন্দ্র-গদ্যের একটা শ্রেণী বিভাগ দেখাতে পারি :
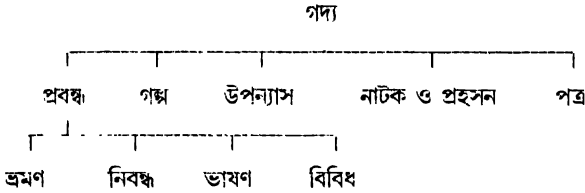
ভ্রমণ

সতের বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণমূলক পত্রধারা লিখেই ভ্রমণ-সাহিত্যের তথা গদ্যের কলম হাতে করেন একথা আগেই বলা হয়েছে। পৃথিবীর নানাদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বিভিন্ন সময়ে ধারাবাহিক ভাবে পত্র-প্রবন্ধের রূপে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পরে সেগুলি একটি দেশের নামে গ্রন্থাকারে ছাপাও হয়। এগুলিই ভ্রমণ-পর্যায়ের গদ্য সাহিত্য। ভূগোল ইতিহাসের বেড়া টপকে রসের জগতে টেনে আনতে পেরেছেন বলেই এটি 'সাহিত্য'। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত মোট নটি গ্রন্থ এই তালিকায় পাই।

তাঁর এই পরিক্রমায় বিশ্বের অনেক দেশ রয়েছে। আছে প্রাচ্যের জাপান, জাভা ও শ্যাম। আছে পাশ্চাত্যের বৃটেন সহ ইউরোপের বহু দেশ, রাশিয়া প্রভৃতি। মাঝে মধ্যপ্রাচ্যের রুক্ষ-মরু-প্রধান দেশ পারস্য প্রভৃতি। বিচিত্র সে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য, বিজ্ঞান যেমন পাই, তেমনি ধর্ম দর্শন ও আদর্শের তুলনামূলক মূল্যবান আলোচনাও পাশাপাশি দেখি।

কোথাও দেখি তরুণ পরিব্রাজকের কৌতূহলী চোখ, সে চোখ কেবল সব কিছুকে খুঁটিয়ে হৃদয় ভরে দেখে নিতে চায় এবং আমাদেরও দেখান। কোন গ্রন্থে আবার সেদেশ আর আমাদের দেশের সমাজ-ধর্ম-রাষ্ট্র-অর্থনৈতিক জীবনে মিল-অমিলের ঐতিহাসিকের জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি।

কখনো বা কোন দেশের মন্দিরে-প্রাসাদে প্রাচীন ভারতকে খুঁজে পাওয়া এক পুরাতত্ত্ববিদের চোখ। অথচ কোথাও কোন রচনা তথ্য-ভারগ্রস্ত বোধ হয়নি। বর্ণনা-চাতুর্যে তা ভূগোল ইতিহাসের পোস্টার বা পত্র পত্রিকার নীরস সংবাদ না হয়ে, হয়ে উঠেছে

১. রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতঃ সং), ১৫ খণ্ড, ২০৯ পৃঃ দ্র।

সাহিত্যের মত আস্বাদ্য। এইখানে রবীন্দ্র-ভ্রমণ-গদ্যগ্রন্থের বিশেষত্ব। তবে গোড়ার দিকে দেখি নবীন বয়সের চাপল্য। শেষের দিকে বয়সের ভারে মিতব্যয়ী কবি-দার্শনিকের রসদৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ বিস্মিত করে।

ভাষারূপের আলোচনায় বিশেষ করে চলিত ব্যবহারের দিক দিয়ে এই সব ভ্রমণগদ্য গ্রন্থগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এই গদ্যের পরিচয় নিতে পারি। যথা : 'এডেনে পৌঁছে বাড়িতে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেম কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি যে, এই কদিন নাড়াচাড়া খেয়ে মাথার ভিতরে যেন সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে, বুদ্ধির রাজ্যে একটা অরাজকতা ঘটেছে--কী করে লিখব ভালো মনে আসছে না। ভাবগুলো যেন মাকড়সার জালের মতো, ছুঁতে গেলেই অমনি ছিঁড়ে খুঁড়ে যাচ্ছে।'

(য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, ১৮৭৬)

'বৃহস্পতিবার বিকেলে সমুদ্রের মোহনায় পাইলট নেবে গেল। এর কিছু আগে থাকতেই সমুদ্রের রূপ দেখা দিয়েছে। তার কূলের বেড়ি খসে গেছে। কিন্তু, এখনও তার মাটির রঙ ঘোচেনি। পৃথিবীর চেয়ে আকাশের সঙ্গেই যে তার আত্মীয়তা বেশি, সে-কথা এখনো প্রকাশ হয়নি ; কেবল দেখা গেল জলে আকাশে এক দিগন্তের মালা বদল করেছে।'

(জাপান যাত্রী, ১৯১৯)

'এখানে সাজে পরিচ্ছেদে সবাই এক। সবটা মিলেই শ্রমিকদের পাড়া ; যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেইখানেই ওরা। এখানে শ্রমিকদের কৃষানদের কি রকম বদল হয়েছে তা দেখবার জন্যে লাইব্রেরীতে গিয়ে বই খুলতে অথবা গাঁয়ে কিংবা বস্তিতে গিয়ে নোট নিতে হয় না। যাদের আমরা "ভদ্দর লোক" বলে থাকি তারা কোথায় সেইটেই জিজ্ঞাস্য।"

(রাশিয়ার চিঠি, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩০)

দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যে দিয়ে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা হল ভ্রমণগ্রন্থ সবগুলোই চলিত গদ্যে লেখা। আর এগুলোয় চলিতরূপ সচেতন ভাবেই এসেছে--সে কথা নিজেই স্বীকার করে বলেছেন, 'আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয় স্বজনদের সহিত মুখোমুখী এক প্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর এক প্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসংগত বলিয়া বোধ হয়।'[১]

১৮৭৬ সাল থেকে পত্রাকারে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'। এর ভাষারূপ থেকে পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমশই ভাষার কারিকুরি চোখে পড়ে। প্রথম গ্রন্থে প্রথম বাইরে বেরোবার ঘোর ভাষায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। এখানে উচ্ছ্বাস বেশি, তাই গদ্যের রশি কিছু শিথিল।[২] এর দশ বছর বাদে লেখা 'য়ুরোপ যাত্রার ডায়েরীর' ভাষা অনেকটা

১. রবীন্দ্র রচনাবলী, আদি সং, ভূমিকা দ্রঃ।

২. 'ইহাতে লেখকের বর্ণনা ও মনন যেমন প্রাথমিক পর্যায়ের ও তরুণ, অপরিণত মনের নব নব দৃশ্যসঞ্জাত কৌতূহলের তরল প্রকাশমাত্র Style-ও সেইরূপ বিশেষত্বহীন ও শিথিলগ্রন্থিত।' ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা (১ম), ২১৭ পৃষ্ঠা।

পরিণত। এই পর্বের তিন সংখ্যক গ্রন্থ 'জাপান যাত্রীর' (১৯১৯ সাল) ভাষা অনেক বেশি শক্তিশালী এবং পরিণত। অভিজ্ঞতা ও ভাষা দুয়েতেই লেখক বেশ সংযমী। ছোট ছোট বাক্য। বড় বড় শব্দের চিহ্ন নেই। অন্যদিকে গদ্যে নিজস্ব রীতি প্রকট হয়েছে। তাই গদ্যে, পদ্যের রঙ লেগেছে। সেইজন্যে 'জলে-আকাশে হয়' মালা-বদল,' জলের ঢেউগুলো দেখে মনে পড়েছে কবি কালিদাসের মন্দাক্রান্তা ছন্দের কথা।

ক্রমশ চলিত গদ্যে স্বাভাবিক রূপ এসেছে। শব্দ ব্যবহারেও লেখক আগের থেকে বেশি মিতব্যয়ী। 'রাশিয়ার চিঠি' থেকে এগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু ভ্রমণ পর্বের শেষে লেখা 'পথের সঞ্চয়'-এ সাধুরূপ চলিত গদ্যের ধারাকে কি কারণে বিঘ্নিত করল, তার কোন সদুত্তর খুঁজে পাই না। তবে সেখানে ক্রিয়াপদগুলোই সাধু।

কিন্তু ভ্রমণ-গদ্যধারার এই কথ্যরূপ যে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, তাতে সন্দেহ নেই ঠিকই, তবে সর্বত্রই যে লেখকের দাবি অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলার ভাষার আদর্শ রক্ষিত হয়েছে, সেকথা মেনে নেওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরী' থেকে তুলে দিচ্ছি : 'অনতিদূরে মাস্তুল কণ্টকিত ম্যাসীলিয়া তার দীপালোকিত ক্যাবিনগুলোর সুদীর্ঘশ্রেণীবদ্ধ বাতায়ন উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে পৃথিবীর আদিম কালের অতি প্রকাণ্ডকায় সহস্রচক্ষু জলজন্তুর মতো স্থির সমুদ্রে জ্যোৎস্নালোকে নিস্তব্ধভাবে ভাসছে।'

এ গদ্য সাধু না কথ্য তা নিয়ে চুলচেরা হিসেব শক্ত। তবে ক্রিয়াপদের মানদণ্ডে চলিত বলতেই হয়। তবু গদ্য লেখককে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়—এই ভাষাতেই কি তিনি আত্মীয়দের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতেন? বলা বাহুল্য, কিছু কিছু প্রবন্ধে এই ভাষা তিনি ব্যবহার করে দেখিয়েছেন। তাঁর ধারণা এতে 'প্রকাশপটুতা'[১] আছে। আমাদের বক্তব্য এটি "সহজ"[২] রূপ কিনা সন্দেহ জাগে।

আশার কথা, এই সাধুগন্ধী চলিতরূপ 'জাপানযাত্রী' থেকেই এক রকম বর্জন করে চিঠির ভাষাতেই ভ্রমণচিঠি লেখা শুরু করেন। জাপানযাত্রার দৃষ্টান্তটির মধ্যেই তার প্রমাণ আগেই পেয়েছি। আর এখান থেকেই চলিত গদ্যে তাঁর Style স্পষ্টতর হয়েছে। তাতে বিষয়টি সহজে না সেরে দৃষ্টান্ত সহ বিশদ করাই গদ্য লেখকের উদ্দেশ্য। যেমন : 'কিন্তু মানুষের একটা বিশেষ খাতা আছে; তার আলগা পাতা, সেটা যা-তা লেখবার জন্যে, সে লেখার দামের কথা কেউ ভাবেও না। লেখাটাই তার লক্ষ্য, কথাটা উপলক্ষ। সে রকম লেখা চিঠিতে ভালো চলে, আটপৌরে লেখা তার না আছে মাথার পাগড়ি, না আছে পায়ে জুতো। পরের কাছে পরের বা নিজের কোনো দরকারে নিয়ে সে যায় না—সে যায় যেখানে বিনা দরকারে গেলেও জবাব দিহি নেই, যেখানে কেবলমাত্র বকে যাওয়ার জন্যেই যাওয়া আসা।'[৩]

এ গদ্যে আর একটা জিনিস চোখে পড়ে তা হচ্ছে এর শব্দভাণ্ডার। প্রথম গদ্যরচনার সুবাদে ও বিলেত ভ্রমণের জন্যে গোড়ায় চলিত গদ্যে প্রচুর ইংরেজি শব্দ পাই। প্রথম গ্রন্থে—ইংরেজি শব্দ ইংরেজি ভাষাতেই ব্যবহৃত এবং প্রচুর। পরে অবশ্য তা বঙ্গাক্ষরেই রূপ নিতে

১. রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবর্ষ সং) দশমখণ্ড, মুখবন্ধ, পাশ্চাত্য ভ্রমণ ও পরিশিষ্ট, ৪০ পৃঃ দ্র।
২. ঐ
৩. ঐ, ৬০৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ।

দেখি। যেমন : ডেকে প্যাসেঞ্জারদের অফিস, কাপ্তেন, টেবিল, ক্যাবিন, ব্রেকফাস্টের সময়, ডিনারের সময়, সারকুলেটিং প্রভৃতি। তবে 'রাশিয়ার চিঠিতে' এসে লেখককে দেখি পরিভাষা গড়ে নেবার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছে। যথা ঃ পরশ্রমজীবী (Bourgeouis), অকারী (Passive) সকারী (Active), স্থানিক তথ্য সন্ধান (rigion study), চিত্রবস্তুর সংস্থান (Composition), বর্ণ কল্পনা (Colour Scheme), অবকাশ (Space), আঙ্গিক (Technique), স্বতন্ত্রশাসিত (Autonomous), পাঠগৃহ (Reading room), আরামের জায়গা (Recreation Corners) ইত্যাদি।

নিবন্ধ

প্রকৃষ্ট রূপ বন্ধন বা যুক্তি-তথ্য-মনন যুক্ত রচনাকেই নিবন্ধ বা প্রবন্ধ বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেই জাতীয় লেখা লেখেননি। তাঁর হাতে বিষয়টা গৌণ, রচনাটাই বড়। বাংলা ১২৮২-৮৩ সন থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত একটানা নানা বিষয়ের উপর অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেন। আলোচনা, সমালোচনা, জীবনী, ধর্ম, শিক্ষা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, চিত্র, সঙ্গীত ইত্যাদি।

কিন্তু প্রায় ষাটের কাছাকাছি এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে একের তিনভাগ মাত্র চলিত গদ্যে লিখেছেন। তাঁর প্রবন্ধের গ্রন্থ-তালিকায় প্রথম পাচ্ছি ১২৯০ সনে (১৮৮৩ খৃঃ) প্রকাশিত 'বিবিধ প্রসঙ্গ'। তারপর 'সমালোচনা' ১৮৮৩ খৃঃ, 'পঞ্চভূত' ১৮৯৭, 'ঔপনিষদিক আত্মশক্তি ভারতবর্ষ'—সাধুগদ্য পর্বের সূচনা ও বিকাশ এইভাবে লক্ষ্য করা যায়।

কিছু পরে ১৯০৭ খৃঃ 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ছাপা হয়।[১] 'বিচিত্র প্রবন্ধের' মধ্যে গদ্যের একটা বিচিত্র রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এতে কিছু চলিতরীতির প্রবন্ধও স্থান পেয়েছে। এখান থেকে গদ্যের আর একটা পর্ব অনুমিত হয়। ঐ একই বছরে 'চরিত্রপূজা' চলিতরূপে ছাপা হয়।

এর পরেও সাধুগদ্যধারায় একটা দুটো চলিত প্রবন্ধ সহ আরও কিছু গ্রন্থ ছাপা হয়। যেমন : 'ব্যঙ্গ কৌতুক' (১৯০৭), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) 'কালান্তর' (১৯৩৭), 'ছেলেবেলা' (১৯৪০) ইত্যাদি। মৃত্যুর পরেও আরও কিছু প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

সুতরাং তাঁর নিবন্ধ বা প্রবন্ধ গ্রন্থগুলোকে এক নজরে দেখতে গেলে, একটা ব্যাপার আমাদের চোখে পড়ে, সেটা হচ্ছে, 'সিরিয়াস' প্রবন্ধ সবই প্রায় সাধুতে লেখেন অথবা সাধুগদ্যে লিখতেই অভ্যস্ত ছিলেন। কেবল অভ্যস্ত ছিলেন বললেই সব বলা হয় না, বঙ্কিম-পরবর্তী বাংলা গদ্যে রবীন্দ্রনাথেই দেখা দিল সাধুরূপের বিশিষ্ট ভঙ্গি। যেমন, ১৯০৭ খৃঃ প্রকাশিত 'প্রাচীন সাহিত্যের' প্রবন্ধগুলোর বিশিষ্ট গদ্যভঙ্গি আমাদের মুগ্ধ করে। তবু তার ফাঁক ফোঁকর দিয়ে গুটি কতক চলিত প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অবাক করে দেন। অবশ্য ভাষণ বা পত্রমূলক প্রবন্ধের চৌদ্দ আনা কথ্য বা চলিতরীতিতে লিখেছেন সেকথা আগেই বলা হয়েছে।

এমনকি একই গ্রন্থে ছাপা হয়েছে 'সিরিয়াস' বিষয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ হয়ত কোন সাময়িকীতে লিখেছেন, সেটার ভাষারীতি সাধু। আবার সেই রকম জটিল বিষয়ের উপর কাউকে পত্র লিখেছেন প্রবন্ধের মাপে, সেখানে এটির ভাষারূপ স্বভাবতই চলিত। ১৩১৪

১. এই সময় গদ্য রচনাগুলো ১৬ খণ্ডে গদ্যগ্রন্থাবলী নামে ছাপা হতে থাকে।

সনে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' গ্রন্থের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাক। এতে বিভিন্ন সাময়িকীতে সাহিত্যের জটিল তাত্ত্বিক রচনাগুলো ছাপা হয়েছে বাংলা ১২৯৩ সন থেকে ১৩১৪ সন পর্যন্ত মোট পঁচিশটি প্রবন্ধে। এর মধ্যে লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লিখিত চারটি পত্রও আছে, যেগুলি চলিত গদ্যে লেখা। বাদ বাকি প্রবন্ধগুলো গতানুগতিক সাধুরূপেই লিখিত। পরে অবশ্য পত্রগুলো সাধনাতে[১] প্রবন্ধের মতই ছাপা হয়। সুতরাং একই কলমে প্রায় একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ উভয় গদ্য রীতিতে লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন।

আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে আমরা তাঁর গদ্য থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তার চলিত ব্যবহারের স্বরূপটা বুঝে নিতে পারি। যথা :

'দস্তুরমত রাস্তায় চলতে গেলে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবার জো থাকে না। কিন্তু প্রাপ্য জিনিসের চেয়ে ফাউ যেমন বেশি ভালো লাগে তেমনি অধিকাংশ সময়েই অপ্রাসঙ্গিক কথাটায় বেশি আমোদ পাওয়া যায় ; মূল কথাটার চেয়ে তার আশপাশের কথাটা বেশি মনোরম বোধ হয় ; অনেক সময়ে রামের চেয়ে হনুমান এবং লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠিরের চেয়ে ভীষ্ম এবং ভীম, সূর্যমুখীর চেয়ে কলমমণিব বেশি প্রিয় বলে বোধ হয়।'

(সাহিত্য, ফাল্গুন ১২৯৮)

'সেই কবির ভারতবর্ষ, যেখানকার জনপদবধূদিগের প্রীতিস্নিগ্ধ লোচন ভ্রূবিকার শিখে নাই এবং পুরবধূদিগের ভ্রূলতাবিভ্রমে-পরিচিত নিবিড়পক্ষ্মকৃষ্ণনেত্র হইতে কৌতূহলদৃষ্টি মধুকরশ্রেণীর মতো ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সেখান হইতে আমরা বিচ্যুত হইয়াছি ; এখন কবির মেঘ ছাড়া সেখানে আর কাহাকেও দূত পাঠাইতে পারি না।'

(প্রাচীন সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১২৯৮)

'কারো কারো পক্ষে ধর্ম জিনিসটা সংসারের রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবার ভদ্র পথ। নিষ্ক্রিয়-তার মধ্যে এমন একটা ছুটি নেওয়া যে ছুটিতে লজ্জা নেই, এমন-কি গৌরব আছে। অর্থাৎ, সংসার থেকে জীবন থেকে যে-যে অংশ বাদ দিলে কর্মের দায় চোকে, ধর্মের নামে সেই সমস্তকে বাদ দিয়ে একটা হাঁফ ছাড়তে পারার জায়গা পাওয়াকে কেউ কেউ ধর্মের উদ্দেশ্য মনে করেন। এঁরা হলেন বৈরাগী।'

(আত্মপরিচয়, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪)

'আজকেই মোহাম্মদী পত্রিকায় দেখছিলুম কে একজন লিখেছেন যে, রবি ঠাকুরের গদ্য কবিতার রস তিনি তাঁর সাদা গদ্যেই পেয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লেখক বলেছেন যে, "শেষের কবিতায়" মূলত কাব্যরসে অভিষিক্ত জিনিস এসে গেছে। তাই যদি হয় তবে কি জেনানা থেকে বার হবার জন্যে কাব্যের জাত গেল।'

(সাহিত্যের স্বরূপ ১৯৩৯, ২৯ আগস্ট)

'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ

১. আলোচনা, সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮ ; সাহিত্য, সাধনা, বৈশাখ ১২৯৯ ; সাহিত্যের প্রাণ, সাধনা, আষাঢ় ১২৯৯ ; এবং মানব প্রকাশ, সাধনা, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯।

করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন একী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরম্ভে মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দান। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।'

(কালান্তর, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮)

উপরের দৃষ্টান্তগুলো রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি প্রবন্ধ গ্রন্থের। সময় সীমা পঞ্চাশ বছর। এতে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে লেখক চলিত ও সাধু রীতিতে গোড়া থেকেই সমান প্রকাশপটু ছিলেন। একই বছরে দু-তিন মাসের ব্যবধানে লিখিত 'প্রাচীন সাহিত্য' ও 'সাহিত্য' গ্রন্থের ভাষারূপে কত তফাৎ। একটায় বড় বড় শব্দসুষমায় রাজসিক গদ্য, অন্যটায় সাধারণ চলিতরীতি। 'প্রাচীন সাহিত্যের' এই জাতীয় সাধুরূপ ত্যাগ করে, কেমন করে আবার সহজ কথ্যগদ্যে কলম ধরা যায় ভাবতে অবাক লাগে।

আবার রবীন্দ্রনাথ শুধু গদ্য লেখকই নন, গদ্যশিল্পীও। তাঁর গদ্যে ভাষাটা কেবল ভাষা হয়েই নেই, ভাষাশিল্প হয়ে উঠেছে। জগতের তাবৎ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য—বিষয় নিরপেক্ষ। সেখানে কি বলা হচ্ছে বড় কথা নয়, কেমন করে বলা হচ্ছে, তাই-ই বড়। 'বিচিত্র প্রবন্ধের' রচনাগুলো সেই জাতীয়। এগুলো নামে 'প্রবন্ধ' হয়েও আসলে 'প্রবন্ধ সাহিত্য'। 'নানা কথায়' শুরু করেছেন : 'মানুষের হৃদয় ছড়িয়ে আছে, মিলিয়ে আছে, পৃথিবীর আলোয় ছায়ায় তার গন্ধে. তার গানে। অতীত কালের সংখ্যাতীত মানুষের প্রেমে পৃথিবী যেন ওড়না উঠিয়ে আছে ; বায়ুমণ্ডলে যেমন তার বাষ্পের উত্তরীয় ; এ তেমনি তার চিন্ময় আবরণ, এর মধ্য দিয়ে মানুষ রঙ পায়, সুর পায় আপন চিরন্তন মনের।'

তখন এ গদ্যে দেখি কবিপ্রাণের ছোঁয়া লেগেছে। তৎসম ও যুক্তব্যঞ্জনের মত দু-চারটে শব্দ থেকেও তা শ্রুতিমধুর। জটিল বাক্য গঠনের দিকে ঝোঁক। ক্রিয়ার ব্যবহারে বিশেষত্ব পাই। যে কোন শব্দের আগে বা পরে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ লক্ষণীয়। কবিতার মত ইচ্ছেমত ক্রিয়ার ব্যবহারেই রবীন্দ্র-গদ্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনে ইংরেজি শব্দের বদলে প্রতিশব্দ করে নিয়ে গদ্যের শব্দভাণ্ডার বাড়িয়েছেন। এখন বলছি, প্রতিশব্দ ছাড়া অনেক সময় সঠিক অর্থটা জোর দিতে ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ দেখি। যথা, 'মানুষ ক্রাইম কখন করে?' (বাতায়নিকের পত্র)[১] এখানে 'অপরাধ' লিখলে অর্থটা সবটা বলা হত না। ইংরেজি শব্দটার সাথে একটা আইনগত দিক জড়িত। আবার একই প্রবন্ধে পাই—'পাশ্চাত্য দেশে Yellow peril—বা পীতসংকট নাম নিয়ে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।' এখানে 'পীতসংকট' যথার্থ প্রতিশব্দ হতে পেরেছে। 'য়ুরোপের সুঁড়িখানা থেকে পোলিটিক্যাল মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে এমন একদল যুবক আমাদের দেশে আছে।' (বাতায়নিকের পত্র)। এখানে 'সুঁড়িখানা' শব্দটি 'বিশ্ববিদ্যালয়' বা কোন 'শিক্ষায়তনের' কথা বোঝাতে বসেছে। শব্দটা সুপ্রযুক্ত। আবার 'মদ'এর বিশেষণ হয়ে বসেছে ইংরেজি 'পোলিটিক্যাল' শব্দটা। এক কথায় 'মেকি দেশপ্রেমীদের' বদলে ব্যবহৃত হয়। এখানেই 'কালান্তর' তথা রবীন্দ্র-গদ্যের বিশেষত্ব।

১. কালান্তর গ্রন্থের অন্তর্গত।

ভাষণ

রবীন্দ্রনাথের যেসব ভাষণগুলো বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধের আকারে ছাপা হয়েছে সেগুলো, অধিকাংশই চলিত গদ্যে পাই। 'শান্তিনিকেতন', 'প্রাক্তনী' ও 'বিশ্বভারতী' এই জাতীয়।

এই সব ভাষণে লেখককে আর এক বিশেষ 'মুডে' দেখতে পাই। বৈঠকী মেজাজে গল্পে কথায় সহজ প্রসন্ন-মনে বিষয়কে সহজ তরল ভাবে শ্রোতার হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়াই উদ্দেশ্য। আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রদের মিলন অনুষ্ঠানে বছরের পর বছর যে ভাষণ দেন, দুঃখ-সুখ প্রীতি-ভালবাসায় গড়া আশ্রমের রূপকার রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের আর্তি ঝরে পড়েছে ঐ সমস্ত ভাষণের মধ্যে দিয়ে। তার সঙ্গে দূর অতীতের মধুরতর স্মৃতিচারণ একে করে তুলেছে অপরূপ। 'শান্তিনিকেতন'-এর 'ভাঙা-হাট' থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

'ভাঙা মেলার লোকেরা কাল রাত্রে বলেছিল "গোটা কতক কাঠকুটা লতাপাতা পেলে বেঁচে যাই" তখন এমনি হয়েছিল যে না হলে চলে না। শীতে খোলা মাঠের মধ্যে ওই একটুখানি আশ্রয় রচনা করাই জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজন-সাধন বলে মনে হয়েছিল। কোনো মতে একটা চুলো বানিয়ে শুকনো পাতা জ্বালিয়ে, যা হোক কিছু একটা রেঁধে নিয়ে আহার করবার চেষ্টাও অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল। এ চাওয়া ও চেষ্টার কাছে পৃথিবীর আর সমস্ত ব্যাপারই ছোটো হয়ে গিয়েছিল।'

সহজ আটপৌরে কথ্যরূপ এই সব ভাষণের বড় বৈশিষ্ট্য। মুদ্রিত প্রবন্ধমালার রাজ্যে তাই এগুলোর আলাদা একটা মূল্য আছে। বিশেষত, কথ্যগদ্যের আলোচনার ধারায় এদের সহজ রূপ আমাদের বরাবরই মুগ্ধ করে।

জীবনী

রবীন্দ্র-প্রবন্ধগ্রন্থের ধারায় 'জীবনস্মৃতি', 'আত্মপরিচয়' ও 'ছেলেবেলা' গ্রন্থের আলাদা একটা মেজাজ আছে। এদের মধ্যে প্রথমটা সাধু, দ্বিতীয়টির কতক সাধু, কতক চলিত এবং শেষেরটি চলিত গদ্যে রচিত। এদের মধ্যে প্রথম দুটি সম্পর্কে দুটি-একটি কথা আগে বলা হয়েছে। এখানে আমরা 'ছেলেবেলা' গ্রন্থের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

'ছেলেবেলা' এই পর্বের তিন নম্বর বই। নাম দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, কী বলতে চেয়েছেন লেখক। জীবনের একেবারে শেষপর্বে দাঁড়িয়ে সত্তর বছর বয়সে তিনি গোঁসাইজির[১] অনুরোধে ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। ভূমিকায় বলেছেন, 'সেই অতীতের প্রেতলোকে প্রবেশ করতে' ছেলেবেলার ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। দুই কালের তখন 'অন্তর বাহিরের' অনেক পার্থক্য। 'বুদ্ধির এলাকায় তখন বৈজ্ঞানিক সার্ভে আরম্ভ হয়নি, সম্ভব-অসম্ভবের সীমা-সরহদ্দের চিহ্ন ছিল পরস্পর জড়ানো। সেই সময়টুকুর বিবরণ যে ভাষায় গেঁথেছি সে স্বভাবতই হয়েছে সহজ, যথাসম্ভব ছেলেদেরই ভাবনার উপযুক্ত'। বলেন, 'তখনকার কালের বর্ণনার ভাষা বদল করিনি।'[২]

কথা প্রসঙ্গে আরও জানা যায়, সেই সময়ের বিষয়বস্তুর কিছু বিবরণ 'জীবনস্মৃতিতে' মেলে, 'তার স্বাদ আলাদা—সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো। সে হল কাহিনী, এ হল কাকলি ; সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, ওটা দেখা দিচ্ছে গাছে—ফলের সঙ্গে চারদিকের

১. ভূমিকা, ছেলেবেলা।
২. ঐ

ডালপালাকে মিলিয়ে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।' রবীন্দ্রনাথ শেষে দাবি করেন এই বইয়ের রচনাভঙ্গি, 'বালভাষিত গদ্যে।'

'ছেলেবেলা' থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা তার ওই দাবির যৌক্তিকতার প্রমাণ পেতে চাই। যথা : "ছুটির রবিবার। আগের সন্ধ্যেবেলায় ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছিল বাইরের দক্ষিণের বাগানের ঝোপে, গল্পটা ছিল রঘুডাকাতের। ছায়া-কাঁপা ঘরে মিট্‌মিটে আলোতে বুক করছিল ধুক্ ধুক্। পরদিন ছুটির ফাঁকে পাল্‌কিতে চড়ে বসলুম। সেটা চলতে শুরু করল বিনা চলায় উড়ো ঠিকানায়, গল্পের জালে জড়ানো মনটাকে ভয়ের স্বাদ দেবার জন্যে। নিঝুম অন্ধকারের নাড়ীতে যেন তালে তালে বেজে উঠছিল বেহারাগুলোর হাঁই-হুই হাঁই-হুই, গা করছে ছম্ ছম্। ধূ ধূ করে মাঠ, বাতাস কাঁপে রোদ্দুরে।'

চলিত ভাষার এ এক অপরূপ রূপ। বড় বড় শব্দ নেই। ঠাকুরমার মুখ থেকে গল্প শোনা ভাষার স্বাদ এনেছে। গ্রাম্য ইডিয়াম, ধ্বন্যাত্মক শব্দ ইত্যাদির প্রয়োগে কথাবার্তার স্বাভাবিক রীতি মেনে ভাষায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই সত্তর বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ অনেক ধরনের গদ্য লেখেন, চলিত রূপও লিখেছেন, কিন্তু শিশুমনের উপযুক্ত এমন সহজ-সরল গদ্য বড় কমই পাই। এই গ্রন্থের আর এক দৃষ্টান্ত : 'দিনগুলো এমনি চলে যায় একটানা। দিনের মাঝখানটা ইস্কুল নেয় খাব্‌লিয়ে, সকালে বিকেলে ছিট্‌কিয়ে পড়ে তারই বাড়তির ভাগ।'

এতে ভাষার কারিকুরি চোখে ধরে। 'ইস্কুল' নামক বিরক্তিকর জন্তুটা 'খাব্‌লিয়ে' নেয় দিনের মাঝখানটা। শিশুমনকে ভোলাতে এর চেয়ে জীবন্ত ভাষা আর আমাদের জানা নেই। আবার দেখি লিখেছেন : 'এক-একদিন বাড়ির আঙিনায় আসে ভালুক-নাচওয়ালা। আসে সাপুড়ে সাপ খেলাতে। এক একদিন আসে ভোজবাজিওয়ালা একটু দেয় নতুনের আমেজ।' তখন দেখি চরণে চরণে শব্দের-রেখা টেনে কত সহজে ছবি করে চলেছেন। এমন সহজ আটপৌরে শব্দের মেলা রবীন্দ্রনাথের অন্যত্র বিরল। যথা : ভারিক্কি, পেড়ে ফেলতে, লেজ আছড়ে ভীষণ গর্জাতে লাগল, ঘাড়ে-গর্দানে, চোখ-রগড়ানি, মুর্খু, শাঁকচুন্নির নাকী সুর, চাপড়, চত্তির মাসের, রশি কামড়ে, গপ্প, জবুস্থবু ইত্যাদি। তাছাড়া ধ্বন্যাত্মক শব্দেরও যথেষ্ট প্রয়োগ দেখি, উদ্ধৃতিগুলোয় তার প্রমাণ আগেই পেয়েছি, এ যথার্থই 'বালভাষিত-গদ্য'। রবীন্দ্রগদ্য-ধারায় 'ছেলেবেলার' গুরুত্ব এই জন্যেই।

উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। উপন্যাসের রূপনির্মিতি ও বিষয়ভাবনা—এই দুটো দিক থেকেই তাঁর উপন্যাস নতুন পথ ধরে। ব্যক্তি ও সমাজ, দেশকাল ও নরনারীর পারস্পরিক নিগূঢ় সম্পর্কের রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে তাঁর উপন্যাসে যে জীবনবোধ উন্মোচিত হতে দেখা যায়—তাতে একালের স্বরূপ লক্ষণ সন্দেহাতীত ভাবে ফুটে উঠেছে। 'আর এই অগণ্য জীবনদৃষ্টিকে উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছেন তাঁর উপযুক্ত নির্মাণরীতিকে।'[১] আর সেটা হঠাৎ কোন একটা গ্রন্থ থেকে উপস্থিত হয়েছে তা নয়।

১. শ্রীগোপিকানাথ রায় চৌধুরী, রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প, নিবেদন দ্রষ্টব্য।

বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসের দুটি ধারাই সমৃদ্ধিলাভ করে। বঙ্কিমের সেই পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস লেখা শুরু করেন। কিন্তু দুজনের ভিতর শিল্পদৃষ্টিগত মৌলিক পার্থক্যও ছিল বিস্তর। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস-অংশের ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রেই বেশ বড়। সেখানে বর্ণাঢ্য বিরাট পরিবেশ ও চঞ্চল গতিবেগ সৃষ্টির দ্বারা তিনি ইতিহাসের চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলতে ভালবাসতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ চরিত্রের অন্তর্জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে। তাঁর উপন্যাসের ঘটনা-বিন্যাসেও পারিবারিক কাহিনীর অনুগ্র শান্ত সুর। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের মহাকোলাহল ও রোমান্সের উঁচু সুর এখানে নেই।[১]

সামাজিক উপন্যাসের পূর্বসূরী বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'রজনী' (১৮৭৫) এবং 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৭)—উপন্যাসগুলিতে যে জীবন-যন্ত্রণার চিত্র পাই তা মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধ, নীতিবোধ ও মধ্যযুগীয় নারীপ্রেমের আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে। বঙ্কিমের কাছে তখন তাই বিধবা বিবাহ ভালো না মন্দ, ইচ্ছে মত পতি বা পত্নী নির্বাচন বিষয় বড় হয়ে উঠেছিল। অবশ্য সেগুলো তখনকার বিতর্কিত ব্যাপার। তাই রোহিণী নিহত হয়ে প্রমাণ করেছে যে, তার জন্ম হয়েছে এক যুগ আগে।[২] এই সমস্ত কারণেই মনে হয়েছে বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসগুলো আসলে সামাজিক রোমান্স।[৩] অন্যদিকে বঙ্কিমের ওই কালে বালক কবির প্রথম উপন্যাস—'করুণায়'[৪] পারিপার্শ্বিক জীবন-চেতনার ছবিটা ফুটে উঠেছে। অল্প বয়সের কিছু চপলতা থাকলেও লেখকের শক্তি অস্বীকার করা চলে না। বিবাহ বাসর ও অন্তঃপুরের বর্ণনায় বাস্তবতার স্পর্শ আছে। বাসর ঘরের বর্ণনা হাস্যরসোজ্জ্বল। বর্ষার কলকাতা বা কলকাতার বস্তি-অঞ্চলের তথ্যানুগ বর্ণনাতেও অপটু লেখকের পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রশংসনীয় পরিচয় পাই।[৫] গ্রাম-শহরের জীবন সমস্যাকে 'পূর্ণায়ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে অবধারণের এই অন্তর্দৃষ্টি রবীন্দ্র উপন্যাসেরই দান—বাংলা সাহিত্যে করুণার মধ্যেও তার হাতিয়ার চিহ্নটি পরিস্ফুট।'[৬] রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম সমালোচক কবির সাহিত্যিক বন্ধু চন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, 'করুণা অপূর্ণ হইলেও বড় উত্তম জিনিষ', এবং বলতে ভোলেননি, 'গল্পটি পুস্তকাকারে ছাপানো আবশ্যক।'[৭]

আবার 'নারায়ণ', 'বিচিত্রা', 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি পত্র-গোষ্ঠীর অতি-আধুনিকেরা গল্প উপন্যাসে নিত্যনতুন সৃষ্টির চমক দিচ্ছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথকে প্রায় পিছনের সারিতে ঠেলে দিচ্ছিলেন—তখন রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা' লিখে প্রমাণ করলেন, যে টেকনিক অতি আধুনিকদের কাম্য অথচ নাগালের বাইরে—তাতে কেমন অনায়াসে নতুন রূপের সৃষ্টি হতে পারে, কথায় ও লেখায় যে কথা তখন স্পষ্ট করে বলা অসম্ভব ছিল, তাও তিনি বুঝিয়ে দিলেন তাঁদের। প্রবীণ সমালোচক ড. সুকুমার সেনের ভাষায় বলা যায়, 'যাঁহারা

১. ড. ধীরেন্দ্র দেবনাথ, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা দ্রঃ।
২. ড. সুরেশ মৈত্র, রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসে সমাজচেতনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৯ মে রবীন্দ্র সংখ্যা।
৩. ড. ভূদেব চৌধুরী, রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ১৬ পৃঃ।
৪. প্রথম প্রকাশ, ভারতী, আশ্বিন ১২৮৪—ভাদ্র ১২৮৫ সন।
৫. ড. ধীরেন্দ্র দেবনাথ, ঔপন্যাসিক, রবীন্দ্রনাথ, ৪৫ পৃঃ দ্রঃ।
৬. ড. ভূদেব চৌধুরী, রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, ১৯ পৃঃ।
৭. বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫১ সন।

রবীন্দ্রনাথকে দেউলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়া দিয়া নিজেদের নূতন কারবারী বানাইতে চাহেন তাঁহাদের মূলধন তো তাঁহার কাছেই ধার করা। রবীন্দ্রনাথই নিবারণ চক্রবর্তী, যিনি পদে পদে নিজের শিল্পের গুটি কাটিয়া বাহির হইয়া নিজে নূতনতর শিল্প সৃজন করিয়া চলিয়াছেন।'[১]

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর গোটা দুনিয়ার সমাজের চেহারাটা আমূল বদলে গেল। পরাধীন ভারতও তার ধাক্কা সামলাতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ', 'চার-অধ্যায়', 'শেষের কবিতায়' তার ছবি আঁকলেন। কিন্তু কবি যেন বাস্তবকে সমীহ করলেন, সঙ্গী করলেন না। প্রকৃত চিত্র তখন বুদ্ধি-মুক্তির (Age of Reason) যুগের শেষ হয়েছে। জাতীয় মুক্তিরও প্রশ্নে মধ্যবিত্ত অপেক্ষা শ্রমিক-কৃষকদের উপর জোর পড়েছে।[২] 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটকে এবং 'রাশিয়ার চিঠির' পত্রধারায় যেসব বক্তব্য দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পেরেছেন, এই পর্বের উপন্যাসগুলিতে তাকে পাশ কাটিয়ে গেলেন। অথবা তিনি যেভাবে চেয়েছিলেন, গোটা দেশের চিত্তের সঙ্গে তাঁর মিল হল না বলে, এই পর্বের উপন্যাসগুলোর জন্যে তাঁকে কিছু নিন্দা মন্দ শুনতে হয়। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস এর মধ্যে একটি। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই, তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই সন্দীপদের কারও কারও মেকী ছদ্মাবরণ খুলে পড়তে দেখে আমরা হতবাক হই। আর সেইখানেই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব।

বাংলা ১২৮৫ সন থেকে ১৩৪১ সন পর্যন্ত তিনি মোট চোদ্দটি উপন্যাস লেখেন। গদ্যগ্রন্থের তুলনায় উপন্যাসের সংখ্যাটা নগণ্য। এখন আমরা রবীন্দ্র উপন্যাসে চলিত রূপ ব্যবহারের দিক থেকে উপন্যাসগুলিকে তিনটি পর্বে ভাগ করতে চাই।

১. সাধুগদ্যরীতি প্রধান

করুণা (ভারতী, আশ্বিন ১২৮৪ ভাদ্র ১২৮৫[৩])

বউঠাকুরানীর হাট (ভারতী, কার্তিক ১২৮৮-৮৯) ১২৯০

রাজর্ষি (২৬ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ; বালক, আষাঢ়-ফাল্গুন ১২৯২) ১২৯৩

২. কথ্য উক্তিযুক্ত সাধুগদ্যরীতি

চোখের বালি (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮—কার্তিক ১৩০৯) ১৩০৯

নৌকাডুবি (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১০—আষাঢ় ১৩১২) ১৩১৩

গোরা (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৪—ফাল্গুন ১৩১৬) ১৩১৬

চতুরঙ্গ (সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ—ফাল্গুন ১৩২১) ১৩২২

৩. চলিত গদ্যরীতি প্রধান

ঘরে বাইরে (সবুজপত্র, বৈশাখ-ফাল্গুন ১৩২২) ১৩২৩

যোগাযোগ (বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৪—চৈত্র ১৩৩৫) ১৩৩৬

শেষের কবিতা (প্রবাসী, ভাদ্র-চৈত্র—১৩৩৫) ১৩৩৬

দুই বোন (বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩৩৯) ১৩৪০

মালঞ্চ (বিচিত্রা, আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৪০) ১৩৪০

চার অধ্যায়--১৩৪১ সন।

সাহিত্যের সব শাখারই নিজস্ব একটা ভাষা আছে, উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সেকথা প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে একই সঙ্গে অথবা কখনো বিভিন্ন স্তরে একাধিক ভাষারূপ প্রয়োগ করে এসেছেন, আর তা গদ্যলেখক রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই করেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। উপন্যাসের বেলাতেও সেইকথা মনে রেখেই আমরা এগোবো।

তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসের সংখ্যা তিন। 'করুণা', 'বউঠাকুরানীর হাট' এবং 'রাজর্ষি'--প্রধানত বঙ্কিমের পথ ধরেই রচিত। ভাষায় বঙ্কিমী-প্রভাব স্পষ্ট। যুক্তব্যঞ্জন, সমাসবদ্ধ ও তৎসম শব্দের প্রচণ্ড প্রতাপ--গদ্যভাষাকে গাঢ়তর করে তুলেছে। তবে 'রাজর্ষি'তে এসে সাধুভাষা অনেকটা গদ্যলেখকের আয়ত্তে আসার চেষ্টা লক্ষ্য করি। যথা :

'এদিকে মহেন্দ্র এমন বিদ্বান, এমন মৃদু-স্বভাব, এমন সদ্বন্ধু ছিল, এমন আমোদ-দায়ক সহচর ছিল, এমন সহৃদয় লোক ছিল যে, সেও সকলকে ভালোবাসিত, তাহাকেও সকলে ভালোবাসিত, রজনীর কপাল-দোষে সে মহেন্দ্রও বিগড়াইয়া গেল। মহেন্দ্র পিতাকে কখনো অভক্তি করে নাই, কিন্তু বিবাহের পরদিনেই পিতাকে যাহা বলিবার নয়, তাহাই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছে। পিতা ভাবিলেন, তাহারই বুঝিবার ভুল, কলেজে পড়িলেই ছেলেরা যে অবাধ্য হইয়া যাইবে, ইহা তো কথাই আছে।' (করুণা)

দেখতে পাচ্ছি উপন্যাসকারের দুর্বল হাতের কলমের গদ্যে বিরক্তিকর শব্দ-সংযোজনা। তাই, 'এমন' শব্দের বহু ব্যবহার ও 'আমোদ-দায়ক', 'বিগড়াইয়া' প্রভৃতি শব্দগুলো কানে বাজে। এই উপন্যাসেই আরও দেখি--দুষ্য কিছু নয়, স্বামী-আলয়ে, তদ্বৈপরীত্যই লক্ষিত হচ্ছে, মর্মান্তিক অপ্রস্তুত হইলেন প্রভৃতির ব্যবহার।

পরবর্তী উপন্যাস দুটিতে আর এই জাতীয় ভাষারূপ দেখি না। সেখানে ভাষায় একটা ওজন এসেছে। যেমন : 'পার্ব্বত্য প্রদেশ ছাড়িয়া গোবিন্দমাণিক্য দক্ষিণে সমুদ্রাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। সমস্ত বাসনার দ্রব্য বিসর্জন দিয়া তিনি হৃদয়ের মধ্যে আশ্চর্য স্বাধীনতা অনুভব করিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে আর বাঁধিতে পারে না, অগ্রসর হইবার সময় কেহ তাঁহাকে আর বাধা দিতে পারে না। প্রকৃতিকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখিলেন এবং আপনাকেও তাহার সহিত এক বলিয়া মনে হইল।'

(রাজর্ষি)

দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসের সংখ্যা চার--'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'গোরা' এবং 'চতুরঙ্গ'। 'চোখের বালি' থেকেই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার পরিচয় মেলে। এই উপন্যাসে জীবনের যথেষ্ট কাছে সরে এল ভাষা। ইতিহাস-আশ্রিত রোমান্সের জন্য ভাষাকে আর জনজীবন থেকে দূরে সরানোর প্রয়োজন নেই। এই উপন্যাস থেকেই সাধুগদ্যে তীক্ষ্ণতা, দ্রুততা ও নাট্যিক বেগ এসেছে।[১] কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে আমরা এই পর্বের উপন্যাসের ভাষারীতির পরিচয় নেব। যথা :

১. ড. ধীরেন্দ্র দেবনাথ, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ, ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এবং রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প, গোপিকানাথ রায় চৌধুরী. পৃঃ ২১৬-১৭।

'পরদিন একাদশী ছিল। অসুস্থ ক্লিষ্টদেহ রাজলক্ষ্মী বিছানায় পড়িয়া ছিলেন। বাহিরে ঘন মেঘে ঝড়ের উপক্রম করিয়াছে। আশা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আস্তে আস্তে রাজলক্ষ্মীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া কহিল, "তোমার দুধ ও ফল আনিয়াছি মা, খাবে এসো।"'

(চোখের বালি)

'ক্ষণকালের জন্য বৃষ্টির বিশ্রাম হইয়াছে, কিন্তু ঝড়ের বাতাস শরবিদ্ধ জন্তুর মতো চীৎকার করিয়া দিগ্বিদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মেঘ সত্ত্বেও শুক্লচতুর্দশীর আকাশ ক্ষীণ আলোকে অশান্ত সংহারমূর্তি অপরিস্ফুটভাবে প্রকাশ করিতেছে। তীর স্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছে, নদী ঝাপসা দেখা যাইতেছে; কিন্তু ঊর্ধ্বে-নিম্নে, দূরে-নিকটে দৃশ্যে অদৃশ্যে একটা মূঢ় উন্মত্ততা, একটা অন্ধ আন্দোলন যেন অদ্ভুত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া যমরাজের উদ্যত শৃঙ্গ কালো মহিষটার মতো মাথা ঝাঁকা দিয়া উঠিতেছে।'

(নৌকাডুবি)

'আজকাল গোরা নিজের হৃদয়ের মধ্যে যে-একটি আকাঙ্ক্ষা, যে-একটি পূর্ণতার অভাব অনুভব করিতেছে, কোনো মতেই কোনো কাজ দিয়া তাহাকে সে পূরণ করিতে পারিতেছে না। শুধু সে নিজে নহে, তাহার সমস্ত কাজও যেন ঊর্ধ্বের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিতেছে—একটা আলো চাই, উজ্জ্বল আলো, সুন্দর আলো। যেন আর সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত আছে, যেন হীরামাণিক্য সোনারূপা দুর্মূল্য নয়—যেন লৌহবর্মচর্ম দুর্লভ নয়—কেবল আশা ও সান্ত্বনায় উদ্ভাসিত স্নিগ্ধ-সুন্দর অনুরাগ-মণ্ডিত আলো কোথায়।'

(গোরা)

'গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে তো দুই পক্ষের মিল হয়। তিনি যে গাহিতেছেন আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।'

(চতুরঙ্গ)

দৃষ্টান্তগুলো সাধুরূপের সন্দেহ নেই, তবে এই পর্বে এসে লেখকের ভাষার কারিকুরি চোখে পড়ে। বড় বড় ভারি ভারি শব্দের প্রয়োগ কমেছে। 'নৌকাডুবির' গদ্যে এই রকম শব্দ ব্যবহারের প্রমাণ পাচ্ছি, কিন্তু এখানে শব্দের রশি লেখকের হাতে। গাঢ় সাধুরূপে একটা শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। 'গোরা' উপন্যাসের ভাষায় আবার হীরের ঝল্‌কানি। এর ভাষায় তাই দেখি কোথাও ঋজু কোথাও তীক্ষ্ণ, কোথাও আবার কবিতার স্বাদে আবেগদীপ্ত ও ব্যঞ্জনাময়। কোন কোন সমালোচক এই কারণে এতে 'এপিক উপন্যাসের' উপযোগী ভাষারূপ লক্ষ্য করেছেন।[১]

আবার 'চতুরঙ্গের' ভাষাও উপন্যাসের ভাষায় একটা বিশিষ্টতা এনেছে। এখানকার ভাষার সংহতিগুণ ও তির্যকভঙ্গিও বেশি। বলা বাহুল্য বীরবল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই বীরবলী ঢঙের যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করেন। 'চতুরঙ্গের' উদাহরণটির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের গদ্যচিন্তার সেই রূপটি বর্তমান। তার উপর সাধুগদ্য অনেকটা আটপৌরে বা সরল হয়ে উঠেছে।

১. অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, (১ম সংস্করণ) ২০৪ পৃঃ দ্রঃ।

এই দ্বিতীয় পর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে সংলাপের ব্যবহারে এবং অন্যত্র চলিত উপাদান প্রয়োগ করতে থাকেন। 'চোখের বালি' থেকেই সংলাপের মধ্যে চলিত এসে গেছে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তটির মধ্যেও তার প্রমাণ আছে। 'চতুরঙ্গের' ক্রিয়াটুকু ছাড়া বাকি সবই কথ্যরূপের। 'চতুরঙ্গের' কালে 'সবুজপত্রের' প্রভাব তো ছিলই, তার সঙ্গে নিজের ভিতরকার তাগিদও কম ছিল না। কথ্যরূপের আশ্চর্য রূপ 'গোরা'য় সংলাপের মধ্যেই তার পরিচয় পেয়ে যাই।

'গোরা' থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা এই পর্বে চলিত গদ্য ব্যবহারের পরিচয় নিতে পারি। যেমন : 'সুচরিতা কহিল, "আমাদের যে দেশ, আমাদের যে জাত, সে কত বড়ো তা জানিস! সে আমি বোঝাব কেমন করে! এ এক আশ্চর্য দেশ। এই দেশকে পৃথিবীর সকলের চূড়ার উপরে বসাবার জন্যে কত হাজার হাজার বৎসর ধরে বিধাতার আয়োজন হয়েছে, দেশ বিদেশ থেকে কত লোক এসে এই আয়োজনে যোগ দিয়েছে ; এ দেশে কত মহাপুরুষ জন্মেছেন, কত মহাযুদ্ধ ঘটেছে, কত মহাকাব্য এইখান থেকে বলা হয়েছে, কত মহাতপস্যা এইখানে সাধন করা হয়েছে, ধর্মকে এদেশ কত দিক থেকে দেখেছে এবং জীবনের সমস্যার কত রকম মীমাংসা এই দেশে হয়েছে। সেই আমাদের এই ভারতবর্ষ।'

এই কথ্যরূপ নিয়ে কোন তর্কের অবকাশ নেই। অতীতকথা কিঞ্চিৎ গাঢ় শব্দ সম্পদযুক্ত চলিতরূপেই তাকে সহজেই ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। চলিত পর্বের উপন্যাসের ভাষা-রীতির সূচনাও যেন এখান থেকে তীব্র হয়ে ওঠে। 'চতুরঙ্গের' সাধুগদ্যের রঙ তাই অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে। সে গদ্য চলিতরূপের কাছে সরে এসেছে। যেমন, 'গেলাম লীলানন্দ স্বামীর খোঁজে। কত নদী পার হইলাম, মাঠ ভাঙিলাম, মুদির দোকানে রাত কাটাইলাম, অবশেষে এক গ্রামে গিয়া শচীশকে ধরিলাম। তখন বেলা দুটো হইবে।'

(—জ্যাঠামশাই, চতুরঙ্গ)

চলিত উপাদানে এ ভাষা অনেক সরল। ভাষায় আটপৌরে মেজাজ নানা স্থানে। তাই 'এক ফুঁয়ে', 'দাওয়া আঙ্গিনা লোকে লোকারণ্য', 'গায়ে তো রোঁয়া আছে', 'মূর্তিমান রসভঙ্গ' ইত্যাদি শব্দগুলির সাক্ষাৎ পাই। যেন পরবর্তী চলিতরীতির গদ্যের জন্যেই এ সদর দোর খুলে দিয়েছে। ভাষার ঘর আর বাইরের হাত ধরাধরি ভাব।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাস দিয়েই চলিত গদ্যরীতির পর্বের সূচনা। এই পর্বে মোট ছটি উপন্যাস—'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা, 'দুই বোন', 'মালঞ্চ' ও 'চার অধ্যায়'। 'চতুরঙ্গ' থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রের' সঙ্গে যুক্ত হন এবং প্রমথ চৌধুরীর প্রত্যক্ষ প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথ অতঃপর 'ঘরে বাইরে' থেকে 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত চলিতেই লেখেন। আর উত্তরোত্তর চলিত গদ্য নিয়ে একটার পর একটা উপন্যাসে নানা কারুকার্যের ফুল ফুটিয়েছেন। তাই দেখি চলিতরীতির উপন্যাসে এক-একটার এক এক স্বাদ। ইতিপূর্বে সাধুরূপেও সেই একই রূপবৈচিত্র্য দেখা যায়। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে চলিতরীতির যে ঢঙ দেখি, 'শেষের কবিতার' রূপ চলিত হলেও সম্পূর্ণ ভিন্নতর। অবশ্য এই রূপবৈচিত্র্যের জন্যে বিষয় ভাবনাও দায়ী।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি যখনকার রচনা, তার বহুকাল আগে থেকে পত্রে, ভ্রমণে ও ভাষণে ও নাটকীয় গদ্যে চলিতরীতি ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে

এসেছেন। সুতরাং 'সবুজপত্র' সম্পাদকের তাগিদে 'ঘরে বাইরে' থেকে শেষপর্যন্ত চলিত রীতি ব্যবহার করেন এইমাত্র. কিন্তু চলিত-রীতি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ অনেক কাল আগে থেকেই শুরু করেন। উপন্যাসে এসে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারটাই আবার নানা উপন্যাসে নানা ভাবে দেখা দিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বিদেশি দ্রব্য বর্জন এবং সাময়িকভাবে কতিপয় দরিদ্রলোকের ক্ষতির সম্ভাবনা, স্বাদেশিকতা, গুপ্তহত্যা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, হিন্দুমেলা--ইত্যাদি বিষয়ের আলোকে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস লিখিত। রবীন্দ্রনাথ এগুলোর অনেকগুলির সঙ্গে নিজেও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হন। বিদেশি দ্রব্য বর্জন এবং গুপ্তহত্যার মত 'ইস্যু'গুলোর সঙ্গে আবার তাঁর চিন্তাভাবনার অমিল লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে সেসব বক্তব্যকেও তিনি কঠিন ভাষায় প্রকাশ করেছেন। উত্তেজনা-যুক্তিনিষ্ঠ 'ঘরে বাইরের' চলিতরূপে তাই তর্কশাস্ত্রের মত শব্দ ও তথ্যের এক ঋজু ভাষাভঙ্গি লক্ষ্য করি। আবার এই পর্বের আর এক উপন্যাস--'শেষের কবিতা যেন উপন্যাস ও কবিতায় জড়োয়া শিল্প।'[১] সমালোচক সুকুমার সেনের ভাষায়, 'বৈষ্ণব-সাধনার 'পরকীয়া' তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় উপন্যাস শিল্পে যে ভাবে রূপ প্রাপ্ত 'শেষের কবিতা'য় তাহারি ব্যক্ত পরিচয়।'[২] এক কথায় 'শেষের কবিতা' প্রেমের স্বপ্নলোক।'[৩] সেই স্বপ্নের ছোঁয়ায় চলিতরূপে এসেছে লাবণ্য। উপন্যাস-শিল্পের এ এক অভিনব স্টাইল। পরবর্তী দুটি উপন্যাস 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ'-এর ভাষারূপও প্রায় 'শেষের কবিতার' মত। তবে 'শেষের কবিতা'র শব্দ-সংযোজন চাতুর্য এখানে অনেক কম।

আবার শেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়ে' যেন 'ঘরে বাইরের' বক্তব্যই আরও জোর দিয়ে বললেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদটাও হলো জোরালো। কিন্তু লেখক স্বয়ং এই উপন্যাসের রাজনৈতিক বক্তব্যকে গৌণ বলে উল্লেখ করেন এবং এলা ও অতীন্দ্রের ভালবাসাকেই মূল আখ্যানবস্তু বলে দাবি করেন।[৪] ওই দুই বৃত্তের টানাপোড়েনে 'চার অধ্যায়ে'র ভাষায় কবিতার রঙ লেগেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সে কথা একপত্রে স্বীকার করেছেন, 'চার অধ্যায়ে'র যেদিকটা আমাদের পাঠককে ভোলায় তা ওর কবিতা অংশ। ওর ভাষায় লাগিয়েছি জাদু, সেইটের সে ওর ভিতর দিয়ে তারা যে জিনিসটা পায় সেটা ঠিক গদ্যের বাহন নয়। অন্তু আর এলার ভালোবাসার বৃত্তান্তটা লিরিকের তোড়া রচনা।'[৫]

আমরা এবার তাঁর এই পর্বের উপন্যাস থেকে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে উপন্যাসে চলিত ব্যবহারের স্বরূপ জেনে নিতে পারি। যথা :

'দিনের আলো শেষ হয়ে এল। জানলার সামনে পশ্চিম দিগন্তে গোয়ালপাড়ার ফুটন্ত শজনেগাছটার পিছনে সূর্য অস্ত গেল। সেই সূর্যাস্তের প্রত্যেক রেখাটি আজও আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অস্তমান সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা মেঘের ঘটা উত্তরে দক্ষিণে দুই ভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল, প্রকাণ্ড পাখির ডানা মেলার মতো তার আগুনের রঙের পালকগুলো থাকে থাকে সাজানো। মনে হতে লাগল আজকের দিনটা হু হু করে উড়ে চলেছে রাত্রের

১. ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড. ৪৪৬ পৃঃ।
২. ঐ
৩. ড. ধীরেন্দ্র দেবনাথ, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ, ৩১২ পৃঃ।
৪. চার অধ্যায়, গ্রন্থ-পরিচয়, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
৫. কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি, ২৯ চৈত্র ১৩৪১ (কবিতা, কার্তিক ১৩৫০)।

সমুদ্র পার হবার জন্যে।' (ঘরে বাইরে)

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এমন অংশ অনেক। আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ এখান থেকেই মৃত্যু পর্যন্ত চলিত গদ্য ব্যবহার করতে থাকেন এবং আর কখনো সাধুগদ্যে ফিরে আসেননি। দৃষ্টান্তটির মধ্যে দেখতে পাই হাল্‌কা ও ভারি পাশাপাশি শব্দযুক্ত এক প্রকার মার্জিত চলিত গদ্যরূপ। ফলে ভাষায় একসঙ্গে গাম্ভীর্য ও মিষ্টতা ফুটে উঠেছে। দিনের আলো শেষ হয়ে এল, এই কথাটাকে ভাষা দিয়ে উপমা দিয়ে ছবিময় করে তুলেছেন।

সহজ বক্তব্য এসব ক্ষেত্রে সহজ করে বলার দিকেই লেখকের ঝোঁক বেড়েছে। সেই সহজভঙ্গির সঙ্গে উপমা-অলংকারে গদ্য, বর্ণনার পথ ছেড়ে চিত্রধর্মী হয়ে উঠেছে। 'যোগাযোগ'-এ তাই শুনি, 'মধুসূদনের আওয়াজটা ঘরঘরে; কানে বাজে, যেন বেলে-কাগজের ঘর্ষণ। কুমুদিনীর সমস্ত শরীরটা রী রী করে উঠল।' তির্যক বাক্‌রীতি, তবে ব্যবহার কমে এসেছে। আটপৌরে শব্দ যথেষ্ট। "কুমুদিনী বললে, 'আমি পারবো না।' বলে সেই পুতির কাজ-করা থলেটির মধ্যে আংটি রেখে দিলে।" এখানে 'থলে' শব্দটির সঙ্গে আমাদের আজন্ম পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করলে শব্দটা বদল করতে পারতেন। কিন্তু প্রয়োজনের সঙ্গীটিকে আটপৌরে শব্দে ফুটিয়ে তুলতেই পছন্দ করেন। আবার—'সেই দাদার আংটি শনির সিঁধকাঠি—এ ঘরে আনা চলবে না।' এই উক্তিতে আমাদের বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে ওঠে। 'দাদাটি' ভয়ংকর না বলে, 'দাদার আংটিকে' 'শনির সিঁধকাঠি' বলার অর্থটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

আবার 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রগদ্যেই নয়, বাংলা গদ্যসাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। 'শেষের কবিতা'র দৃষ্টান্ত 'শেষের কবিতা'ই। ভাষা যেন একেবারে সহজ, গতিময়, যেন আপনি পথ কেটে গুটিপোকার মত বেরিয়ে এসেছে। কথা এখানে কবিতার মত সঙ্গীতের মত সুরে সুরে মাতোয়ারা। যেখানে হৃদয়ের আবেগ ঝরে পড়েছে, ভাষা যেন সেখানে ছবি হয়ে স্বপ্নের মায়াঞ্জন পরিয়ে দেয়। যথা :

'অমিত লাবণ্যর মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার মুখটি উপরে তুলে ধরলে। লাবণ্যের চোখ অর্ধেক বোজা, কোন দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানো পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে যেখানে দেহ নেই শুধু আনন্দ আছে সেই অমর্ত জগতের অব্যক্তধ্বনি আসছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হল ঘন। সেই খোলা আকাশটুকু, রাত্রিবেলায় ফুলের মতো, নানা রঙের পাপড়িগুলো বন্ধ করে দিলে।'

(শেষের কবিতা)

কিংবা, 'একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। সদ্য মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তার পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি—চারিদিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দর পর্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এই মাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে—মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে।'

(শেষের কাবিতা)

এ যেন জীবন্ত কবিতার ভাষা। পড়বার সাথে সাথে বিষয়টা যেন চোখের সামনে সজীব হয়ে ওঠে।

'শেষের কবিতা'র ভাষার আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, ক্রিয়াপদ কবিতার মত বাক্যের গোড়ায় এনে উচ্চারিত। যথা : 'উদ্বৃত্ত সময়টা ঠাসা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে', 'মেয়ে বিয়ে করত সেই পুরাকালে লক্ষণ মিলিয়ে', 'ছবিটা আবিষ্কৃত হয়েছে শোভনলালের টিনের প্যাটরার ভিতর থেকে', 'ঠিক হয়ে গেল, আগামী অঘ্রাণ মাসে এদের বিয়ে।' ইত্যাদি।

ভাষায় আর একটি বৈশিষ্ট্য, শাণিত কৃপাণের মত বক্তব্য প্রকাশে তির্যকভঙ্গি। অনেক ক্ষেত্রেই তা ব্যঙ্গ-কটাক্ষে পরিবেশিত। যথা : 'যে পরিমাণ টাকা তিনি জমিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন তিনপুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট', 'বুদ্ধি বেশি থাকাতে পড়াশুনো বেশি করে নি, অথচ বিদ্যেতে কমতি আছে বলে ঠাহর হয় না।' 'বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিস অল্প হয় বলেই তা ভালো, নইলে সে নিজেরই ভিড়ের ঠেলায় হয়ে যেত মাঝারি।' 'সম্ভবপরের জন্যে সব সময়ে প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা ; বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত', 'জগতে যারা উৎসব সভা সাজাবার হুকুম পেয়েছে কথা তাদের পক্ষেই ভালো।' 'চাইলেই পাওয়া যায়, দামি জিনিসকে এত সস্তা করা নিজেকেই ঠকানো।' 'সেই ক্ষণে অমিত কেটির হাতে আংটি পরিয়ে দিলে ; তার মধ্যে অনেক কথাই উহ্য ছিল, কিন্তু কোনো কথাই গোপন ছিল না' ইত্যাদি।

ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথ মূলত গীতিকবি, তাঁর গীতি-প্রাণতা গদ্যকেও আশ্রয় করেছে। গদ্য তাই কবিতার মত আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। আর এই মেজাজ থেকেই বেরিয়ে এসেছে গদ্যলেখক রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব স্টাইল। আমরা এখন দুটো উপন্যাস থেকে দুটো দৃষ্টান্ত দিয়ে উপন্যাস পর্বের ইতি করবো। যথা : 'বাগানের দেউড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল বেলা দুপুরের। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের সঙ্গে তার সুরের মিল। তিনটে পর্যন্ত মালীদের ছুটি। ওই ঘণ্টার শব্দে নীরজার বুকের ভিতরটা ব্যথিয়ে উঠল, উদাস হয়ে গেল তার মন। আয়া এল দরজা বন্ধ করতে। নীরু বললে, না না থাক। চেয়ে রইল যেখানে ছড়াছড়ি যাচ্ছে রৌদ্র-ছায়া গাছগুলোর তলায় তলায়।'

(মালঞ্চ)

'এলা বসে আছে কেদারায়, পিঠে বালিশ গোঁজা। লিখছে এক মনে। পায়ের উপর পা তোলা। দেশবন্ধুর মূর্তি-আঁকা খাতা কাঠের বোর্ডে কোলের উপর আড় করে ধরা। দিন ফুরোতে দেরি নেই, কিন্তু তখনও চুল রয়েছে অযত্নে। বেগুনি রঙের খদ্দরের শাড়ি গায়ে, সেটাতে মলিনতা অব্যক্ত থাকে, তাই নিভৃতে ব্যবহার তার অনাদৃত প্রয়োজন। এলার হাতে একজোড়া লাল রং-করা শাঁখা, গলায় একছড়া সোনার হার। হাতির দাঁতের মতো গৌরবর্ণ শরীরটি আঁটসাঁট, মনে হয় বয়স খুব কম কিন্তু মুখে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য।'

(চার অধ্যায়)

'শেষের কবিতা'র গদ্যে তির্যকভঙ্গি ও ব্যঙ্গ-কটাক্ষে কবিতার রঙ অনেক জায়গায় ফিকে। এখানে তা অনুপস্থিত। গদ্যে কবিতাকর্মও বেশি। 'মালঞ্চ' ও 'চার অধ্যায়ে'র ওই দুটি অংশকে অনায়াসে কবিতার মত সাজিয়ে দিলেই গদ্য কবিতা বলে চালানো যায়। ছোট ছোট বাক্য। ক্রিয়াপদ বাক্যের আদিতে এনে উচ্চারিত। আর ভাষায় কেমন এক তানপ্রধান ছন্দের মত কানে বাজে। এই হচ্ছে খাঁটি রবীন্দ্র-চলিত গদ্যভঙ্গি। এর সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি, 'গদ্য ও পদ্যের ভাশুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক আমি মানি না। আমার কাছে তারা ভাই আর বোনের মতো, তাই যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের

সহজ আদান প্রদান হচ্ছে তখন আমি আপত্তি করি নে।'[১] আপত্তি আমাদেরও নেই। পাঠক হিসেবে এই গদ্য আমাদের কাছে প্রধান পুরস্কার।

ছোটগল্প

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সূচনা রবীন্দ্রনাথের হাতে। কেবল ছোটগল্প নয়, সার্থক ছোটগল্পের স্রষ্টাও তিনি। তাঁর আগে এই বিভাগে উল্লেখ করার মত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দামিনী'[২] ছাড়া আর কিছুই নেই। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনার প্রেরণা কোথা থেকে পেলেন? এর উত্তর পেতে হলে জমিদার রবীন্দ্রনাথের পদ্মাবাসের সংবাদ নিতে হবে। এই সময়েই তাঁর বেশির ভাগ গল্পের সূচনা। এখানেই মাঝে মাঝে একটা আড্ডা বসতো। তাতে জগদীশচন্দ্র বসু, লোকেন পালিত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আসতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের আপ্যায়িত করতেন টাট্‌কা টাট্‌কা গল্প শুনিয়ে। লোকেন পালিত ছিলেন ফরাসি ভাষাবিদ্। তিনি বালজাক, দোদে, গতিয়ে, মোপাসাঁ প্রমুখ কথা-সাহিত্যিকদের গল্পের সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন। তাঁর মেজদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ফরাসি জানতেন এবং মোপাসাঁ ও বালজাকের কোন কোন গল্প অনুবাদও করেছিলেন। এসব ঘটনাই হয়ত পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথকে ছোটগল্প রচনায় প্রেরণা দিয়েছে।[৩] 'সাধনা', 'ভারতী', 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন', 'সবুজপত্র' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় অজস্র গল্প রচনা করে বাংলা ছোট-গল্পের ভাণ্ডার পূর্ণ করে তোলেন।

তিনি কেবল ছোটগল্প রচনা করেই ক্ষান্ত হন নি, ছোটগল্পের সৃষ্টি-চরিত্র সম্বন্ধেও উত্তরসূরীদের 'গাইড লাইন' দেন। 'সোনার তরী' কাব্যের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় বললেন—

'ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।'

এ শুধু গল্পকারের তত্ত্বকথা নয়, তিনিই প্রথম সেই অতি সাধারণ আটপৌরে মানুষের সুখ দুঃখ নিয়ে গল্প লিখেছেন। তাঁর জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে, পদ্মাপারের 'মূঢ় প্রজাদের' মধ্যে ঘোরাঘুরি করে 'মানুষ রবীন্দ্রনাথের' জীবনের নানাদিক খুলে গেছে।[৪]

রবীন্দ্রনাথের নাটকে ও উপন্যাসে কিছু কিছু অতি সাধারণ মানুষের দেখা মিললেও তাঁর

১. সাহিত্যের স্বরূপ, গদ্যকাব্য প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
২. দামিনী (১২৮১)-তে ড. সুকুমার সেন ছোটগল্পের লক্ষণ বিদ্যমান ছিল বলে জানিয়েছেন। দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।
৩. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অন্তরঙ্গ গল্পকার রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা।
৪. রবীন্দ্রজীবনী (১ম), পদ্মার ধারে।

নায়ক-নায়িকারা সবাই সমাজ-সৌধের উঁচু তলার বাসিন্দা। কিন্তু তাঁর ছোটগল্পে ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যথা--ছোটো ছোটো দুঃখ কথার সামিল সেই চাষী মজুর হাঘরে ভিখিরিদের কিছু কিছু চিত্র পাই। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ মাটির কাছাকাছি চলে এসেছেন বলা যেতে পারে। সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্তের ভাষায় বলা যায়, '...রবীন্দ্রনাথ যৌবনেই বিশ্বের সেই মহলে পা দিয়েছিলেন যেখানে শুধু আলো নেই আছে অনেক অন্ধকারও। যেখানে প্রশ্ন যদি হয় রাত কত হল? উত্তর মেলে না।'[১]

রবীন্দ্রনাথ মোট ১৬৬টি[২] ছোটগল্প লেখেন সাধু ও চলিত রীতিতে। সেই উভয় রীতিরই সহজ অনাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গি গল্পগুলির প্রাণবস্তু। চলিত গদ্যের আলোচনায় এদের গুরুত্ব কিছু কম নয়। তাঁর প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' (১২৮৪) লেখেন সাধুরীতিতে এবং শেষ গল্প 'মুক্ত কুন্তলা'র ভাষারূপ চলিত। এই দীর্ঘ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ গদ্যের দুই রীতিতেই সাহিত্যকর্ম করে এসেছেন। আর ওই দুইরীতির ফসলই তাঁকে বাংলা ছোটগল্পের জনকত্বের আসনে বসিয়েছে।

'গল্পগুচ্ছের' বারো আনা গল্প ও 'লিপিকার' একমাত্র 'তোতাকাহিনী' বাদে, অবশিষ্ট গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি চলিতরীতিতে লেখা। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে চলিতরীতির পক্ষে গল্পকারের পাল্লাটা ভারি, কিন্তু সার্থকতার হিসাবে সাধুরূপের জয়জয়কার।

এখন দেখা যাক, রবীন্দ্র-গল্পে চলিত ব্যবহার কেমন করে গৃহীত হল। গোড়ার দিকে সংলাপ বা কথাবার্তার ভাষায় চলিতরূপ ধীরে ধীরে লক্ষ্য করা যায়। পরে অখণ্ড 'গল্পগুচ্ছের' চুয়াত্তরতম গল্প 'স্ত্রীর পত্রে' (শ্রাবণ ১৩২১) চলিতরূপ হঠাৎ স্ফীত হয়ে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য সেটা 'সবুজপত্রের' কাল। 'স্ত্রীর পত্র'র আগে আরও তিনটি এবং পরে আরও চারটে গল্প সাধুরূপেই লেখেন। এ থেকে লেখকের ভাষারূপ নিয়ে যে কিছুটা দ্বিধা ছিল সেটা মনে করা অমূলক হবে না। কিন্তু অচিরে সব দ্বিধা কাটিয়ে উঠে 'সবুজপত্র' আষাঢ় ১৩২৪ সংখ্যা থেকে বাকি গদ্যের কালটার জন্যে চলিতরীতির কলমটা স্থায়ী ভাবে তুলে নিলেন। ছোটগল্প লিখলেন 'পয়লা নম্বর' নাম দিয়ে। ওই নামটার এই দিক থেকে একটা সার্থকতা দেখতে পাওয়া যায়। তবে ততদিনে সাধুগদ্যের রংটাও ফিকে হয়ে চলিতরীতির কাছে সরে এসেছে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

গল্পগুচ্ছের গোড়ার দিককার গল্পে সাধুগদ্যই প্রধান, পঞ্চম গল্প 'পোস্টমাস্টার'। এই গল্প থেকেই উক্তিগুলোর মধ্যে দিয়ে কথ্যরূপের দেখা মিলল। কথ্যরূপও এখানে স্বাভাবিক।

যথা : "পোস্টমাস্টার বলিলেন, রতন কালই আমি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে?

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।"

এখানে মুখের ভাষার সাধারণ কথাবার্তার রূপ লক্ষ্য করি। বাহুল্য বর্জিত কথ্যই এখানে গৃহীত হয়। আবার এক জায়গায় দেখি, 'কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধূলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দাদাবাবু তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না",—

১. রবীন্দ্র গল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ, ৩২০ পৃষ্ঠা দ্রঃ।

২. গল্পগুচ্ছ ৯০, লিপিকা ৪০, সে ১৬, তিনসঙ্গী ৩, এবং গল্পসল্প ১৭।

বলিয়া এক দৌড়ে সেখান হইতে পালাইয়া গেল।'

গ্রাম্য বালিকার এই উপযুক্ত সংলাপ চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে। সরকারি অফিসের কর্তাবাবুর কাছে কাজ করে এমন পল্লীবালার মুখে আঞ্চলিক ভাষার চাইতে এই সংলাপ অনেক বেশি সঙ্গত হয়েছে।

আবার আর একটি গল্পে সদ্যবিধবার লোভী মনোভাবটিকে প্রদীপের সলতের মত যেন উস্‌কে দেয়, 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পে তার পরিচয় পাই। যথা, 'ওগো, আমার কী সর্বনাশ হল গো, কী সর্বনাশ হল। আচ্ছা, ঠাকুরপো, লেখাটা কার। তোমার বুঝি? ওগো, তেমন যত্ন করে আমাকে আর কে দেখবে, আমার দিকে কে মুখ তুলে চাইবে গো। তোরা একটুকু থাম, মেলা চেঁচাস নে, কথাটা শুনতে দে। ওগো, আমি কেন আগে গেলুম না গো--আমি কেন বেঁচে রইলুম।'

গল্পটি সাধুগদ্যে লেখা, কিন্তু উক্তিগুলো কথ্যে লিখিত। স্বামী সদ্য মারা গেছেন। তাঁর শয্যা-পাশে সদ্যবিধবার কান্নার ভাষা এই। কুমীরের কান্নার মত লোভ এবং কপটতা, একই সঙ্গে এত স্পষ্ট করে অন্য কোনো রীতিতে প্রকাশ সম্ভব ছিল না।

আবার পুরোনো কলকাতা শহরের বনেদী পরিবারের শিক্ষিতদের মুখে ছোট ছোট বাক্য সহ এক সহজ অথচ মার্জিত কথ্যরূপ পাই, 'নষ্টনীড়' গল্প থেকে তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা :

'বন্ধুরা ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারখানা কী? এত ব্যস্ত কেন?"

ভূপতি কহিল, "খবরের কাগজ"--

বন্ধু। আবার খবরের কাগজ? ভিটেমাটি খবরের কাগজে মুড়ে গঙ্গার জলে ফেলতে হবে নাকি।

ভূপতি। না, আর নিজে কাগজ করচি নে।

বন্ধু। তবে?

ভূপতি। মৈশুরে একটা কাগজ বের হবে, আমাকে তার সম্পাদক করেছে।'[১]

(নষ্টনীড়)

এটিও সাধুরীতির গল্প। কিন্তু এর পরিবেশ পূর্বোক্ত গল্প দুটির থেকে আলাদা। এখানে সংলাপের মধ্যে দিয়ে যে কথ্যভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, তার সঙ্গে 'পোষ্টমাষ্টার' ও 'রাম কানাইয়ের নিবুর্দ্ধিতার' সঙ্গতি নেই। 'নষ্টনীড়ের' মধ্যে কলকাতার শিষ্ট সমাজের কথ্য রূপকেই এখানে সংলাপের ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। ছোট ছোট, অসম্পূর্ণ বাক্য. কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়, এখানে তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এইভাবে বিষয় অনুসারে চলিতরূপেরও রকম-ফের ঘটতে দেখা যাচ্ছে।

তাই দেখি 'কাবুলিওয়ালা' ও 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে অবাঙালি ভাষাভাষীর কথিত ভাষা পাই। 'কাবুলিওয়ালা' সুদূর কাবুল থেকে বাংলায় এসেছে। এখানেই অনেক বাঙালি পরিবারের সঙ্গে তার ওঠাবসা। তার মুখে ভাঙা বাংলা বা সাধুগদ্য বেমানান ঠেকে না। 'ক্ষুধিত পাষাণের' পাগলা মেহের আলির চীৎকার "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও। সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্ হ্যায়।"--তখন সে উক্তিও অতিপ্রাকৃত-পরিবেশে উতরে যায়। কিন্তু বাঙালি বাবুর

১. বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৩০৮ সন।

মুখে সেই গল্পে যখন শুনি :

'কহিলাম, "কী রে রহমত, কবে আসিলি।" সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।"

(কাবুলিওয়ালা)

তখন আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, লেখক কি তবে বাংলা কথা ভুলে গিয়েছিলেন? তা নাহলে অবাংলায় কথ্যভাষা দিলেন, বাংলার বেলাতেই কুণ্ঠা কেন! অথচ 'ক্ষুধিত পাষাণে' ওই চরিত্রের মুখেই শুনি, "মেহের আলি ক্যা ঝুট্ হ্যায় রে?" সেটাকে এতটুকু অস্বাভাবিক মনে হয় না আমাদের।

একেবারে 'তপস্বিনী'[১] পর্যন্ত গল্পগুচ্ছে চলিত ব্যবহারের এই ইতিহাস। কিন্তু 'তপস্বিনী' প্রকাশের পরের মাস থেকেই ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ চলিতরীতি প্রয়োগ করতে পাকাপাকি ভাবে শুরু করে দিলেন। এই চলিতপর্বের প্রথম গল্পটির নামও দিলেন 'পয়লা নম্বর।'[২] তবে তার আগে কথ্যে লিখিত 'স্ত্রীর পত্র'[৩] গল্পটি বলা যায় খাপছাড়া, সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

'স্ত্রীর পত্র' পত্রের আকারে সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে প্রথম ছোটগল্প। মনে হয় এখান থেকেই পত্র-গল্পের সূচনা। গল্পের আরম্ভ এইভাবে :

'শ্রীচরণকমলেষু

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখিনি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি, চিঠি লেখবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায়নি।'

চলিতরীতির প্রথম গল্পেই ভাষারূপের সাফল্য সম্পর্কে আমাদের মনে কোন সন্দেহ হয় না। কেননা ইতিপূর্বে লেখক চিঠিপত্রের ভাষায় সচরাচর কথিত ভাষাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর ভ্রমণ পর্যায়ের 'ডায়েরীর' সম্পর্কে প্রমাণ আগেই আমরা পেয়েছি। পার্থক্য এই, এখানে পত্র প্রবন্ধ না হয়ে গল্পের রূপে এসেছে এইমাত্র। তবে গল্প বলে এর ভাষারূপের জৌলুসও উপেক্ষার নয়। গল্পের শেষে দেখি :

'মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, "ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল প্রভু, তাতে তার যা হবার হোক। এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা। আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।'

চিঠির মোড়কে গল্প। সহজ ব্যঞ্জনাময় আটপৌরে চলিত গল্পটির গতিবেগ বৃদ্ধি করেছে। এ গল্প সাধুরীতিতে সম্ভব ছিল না। তবু 'স্ত্রীর পত্রে' রবীন্দ্রনাথ কথিত সামঞ্জস্যপূর্ণ গদ্য পাই না। সে গদ্যের সন্ধান পাই 'পয়লা নম্বর' গল্পে। সুতরাং 'পয়লা নম্বর', অনেক দিক থেকেই 'পয়লা'—সে কথাটা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। একটা উদ্ধৃতি দিয়ে দেখা যাক :

'সেখানে একটি ছোটো ভাই, একটি দিদি এবং একটি বিমাতার সমাবেশে নিয়তই একটা ঘাত-প্রতিঘাতের লীলা চলছিল। পুরাণের বাসকী যে পৌরাণিক পৃথিবীকে ধরে আছে সে পৃথিবী স্থির। কিন্তু, সংসারে যে মেয়েকে বেদনার পৃথিবী বহন করতে হয় তার সে পৃথিবী

১. জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪।
২. আষাঢ় ১৩২৪।
৩. শ্রাবণ ১৩২১।

মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন আঘাতে তৈরি হয়ে উঠছে। সেই চলন্তি ব্যথার ভার বুকে নিয়ে যাকে ঘর কন্নার খুঁটিনাটির মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন চলতে হয়, তার অন্তরের কথা অন্তর্যামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ বুঝবে।'

(পয়লা নম্বর)

সাধু-ঘেঁষা চলিত যাকে রবীন্দ্রনাথ 'সামঞ্জস্য পূর্ণ চলিত' বলেছেন, এ তারই যেন হাতে হাতে প্রমাণ দিলেন। এতে সমাসবদ্ধ শব্দ ও তৎসম শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষায় কেমন এক বিষণ্ণ-গাম্ভীর্য পরিবেশ রচনা করা হয়েছে। এই গল্পে তাই দেখি জীবননাট্য, পঞ্চমাঙ্ক, জীবনযজ্ঞবেদী, বিমাতা, সমাবেশ, ঘাতপ্রতিঘাত-প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের ছাড়পত্র পেয়েছে। তুলনায় তদ্ভব জাতীয় শব্দের প্রয়োগ কম। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের 'সিরিয়াস' প্রবন্ধে এ জাতীয় কথ্যরীতির সার্থক ব্যবহার বহুকাল আগেই ঘটে গেছে। 'গল্পগুচ্ছে' শেষপর্যন্ত কথ্যরূপের এই চেহারা বজায় থেকেছে। বলাই বাহুল্য, গল্পে এইরূপ ভাষাপ্রয়োগের পেছনে 'সবুজপত্র'-সম্পাদকের প্রভাব আছে, সেকথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন। একেবারে শেষ দিককার গল্প থেকে আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। যথা :

"সুরীতি মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'দেখুন আপনি আমার নাম নিয়ে ঠাট্টা করবেন না।'

নীহার বললে, 'তুমি বিদুষী হয়ে একে ঠাট্টা বল, এ যে বিশুদ্ধ ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য থেকে কোটেশন করা! এমন সম্মান কী আর কোনও নামে হতে পারে।'

'আমাকে আপনার সম্মান করতে হবে না।'

সম্মান না করে বাঁচি কী করে! 'হে বিকচকমলায়তলোচনা, হে পরিণতশরচ্চন্দ্র-বেদনা, হে স্মিতহাস্যজ্যোৎস্না বিকাশিনী, তোমাকে আদরের নামে ডেকে যে তৃপ্তির শেষ হয় না।'"

(প্রগতি সংহার ১৩৪৮)

এতে বড় বড় সমাসবদ্ধ শব্দর প্রয়োগ-নৈপুণ্য আমাদের 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের সাধুরীতির কথা মনে করায়। সেখানে সমালোচনার আড়ালে নতুন সৃষ্টির চমক, আর এখানে পরিহাস প্রিয়তায় সাধুগন্ধী-শব্দ প্রয়োগে সিদ্ধি। চলিত-রীতির আলোচনায় এই গদ্যরূপের গুরুত্ব অনেকখানি।

'গল্পগুচ্ছ'-পরবর্তী গল্পগ্রন্থগুলো হচ্ছে 'লিপিকা'[১] 'সে'[২], 'তিনসঙ্গী'[৩] এবং 'গল্পসল্প'[৪]। এদের মধ্যে 'লিপিকার' ভাষা অনেকটা গদ্যকাব্যশ্রেণীর। কবিতার মত ভেঙে ভেঙেই গোড়ায় ছাপা হয়েছিল। কিন্তু পাঠক ভীতির জন্যে রবীন্দ্রনাথ পরে টানা গদ্যরূপেই গ্রন্থকারে প্রকাশ করেন, সেকথা আগেই আলোচিত হয়েছে।

'সে'—ষোলটি গল্প ও গল্পকণার সংকলন। অদ্ভুতরসের ভিয়ানে পাক করা[৫] অনেকটা কিশোর উপন্যাসের মত একটা সুতোয় বাঁধা কাহিনী। ভাষায় প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ-কৌতুকের ধারা। রচনায় নতুন স্বাদ। রাজপুত্তুর, মন্ত্রীর পুত্তুর, গপ্‌পো, রোদ্দুর, ইত্যাদির মত অজস্র

১. ১৯২২ সালে সংকলিত।
২. ১৩৪৩ পৌষ।
৩. ১৩৪৭ পৌষ।
৪. ১৯৪১ সালে প্রকাশিত।
৫. ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য়), ৩৫৯ পৃষ্ঠা।

আটপৌরে শব্দের মেলা। তেমনি পাত্রপাত্রীদের নামের বহর, পুপে দিদি, গোবরা, পঞ্চু, ধেড়ে গাঁয়ের ভেকু সর্দার প্রভৃতি কিশোর-মনকে নাড়া দেবার উপযোগী। দ্বীপের নামটাও মজার--'হুহাউ।' ভাষার ঢঙটা এই রকম, 'স্বপ্ন দেখছি কি জেগে আছি বলতে পারি নে। জানিনে কত রাত। ঘর অন্ধকার, লণ্ঠনটা আছে বারান্দায়, দরজার বাইরে। একটা চামচিকে পোকার লোভে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, গয়ার-পিণ্ডি-না-দেওয়া ভূতের মতো।'

(গেছো বাবা)

'গল্পগুচ্ছ' ও 'লিপিকার' ভাষারূপের সঙ্গে 'সে'-এর ভাষার পার্থক্যটা বুঝতে পারা যায়। নাতিদের গল্পবলা দাদামশায়ের ঢঙ অনেকটা। এই সহজ অনাড়ম্বর কথ্যরীতিরও যে শক্তি অনেক, যে কোন জাতের শব্দকেই সে সহজে হজম করতে পারে। এখানে তার একটা প্রমাণ দিচ্ছি। যথা--

'এল সে তার কাঁটাওয়ালা মোটা গোলাপের গুঁড়ির লাঠিখানা ঠক্ ঠক্ করতে করতে। মালকোচামারা ধুতি, চাদরখানা জড়ানো কোমরে, হাঁটু পর্যন্ত কালো পশমের মোটা মোজা, লাল ডোরাকাটা জামার উপর হাতাহীন বিলিতি ওয়েস্টকোট সবুজ বনাতের, সাদা রোঁয়াওয়ালা রাশিয়ান টুপি মাথায়—পুরোনো মালের দোকান থেকে কেনা—বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে ন্যাকড়া জড়ানো--কোনো একটা সদ্য অপঘাতের প্রত্যক্ষ সাক্ষী।'

(গেছো বাবা)

ছোটদের জন্য লেখা 'গল্পসল্প' সতেরটি গল্পের ভাষারীতিও অনেকটা 'সে'-এর মত। আকারে 'লিপিকা', প্রকারে 'সে'। প্রতিটি গল্পের শেষে ছড়া। নাতিপুতিদের নিয়ে দাদামশায়ের গল্প বলার ঢঙ। তবে রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য যা লেখেন আর কতকটা ছোটদের, কিন্তু সবটাই বড়দের যদি-না বয়সের দোষে রুচিতে কড়া পড়ে[১]।

এই দুই গল্পগ্রন্থের মাঝখানে একক দ্বীপের মত 'তিনসঙ্গী'—'রবিবার', 'শেষকথা' ও 'ল্যাবরেটরি' নামে তিনটি গল্পের সংকলন।[২] আকারে গল্পগুলি গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পের চেয়ে বড়। ভাষারূপের দিক থেকে গল্পগুচ্ছের শেষ পর্যায়ের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মার্জিত বৈদ্যুতিক চমক এবং বক্রতা ও দ্রুতগতি জনিত চূড়ান্ত রূপ এই গ্রন্থে দেখি।[৩] 'রবিবার' গল্প থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যাতে শেষপর্বে চলিত গদ্যের ক্ষমতার পরিচয় পেতে পারি। যথা :

'ছেলের নাস্তিকতা নিয়ে বাপ অম্বিকাচরণ বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন না। মস্ত তাঁর নজির ছিল প্রসন্ন ন্যায়রত্ন, তাঁর আপন জ্যেঠামশাই। বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন তর্কশাস্ত্রের গোলন্দাজ, চতুষ্পাঠীর মাঝখানে বসে অনুস্বার—বিসর্গওয়ালা গোলা দাগেন ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদের উপরে। হিন্দু সমাজ হেসে বলে 'গোলা খাডালা,' দাগ পড়ে না সমাজের পাকা প্রাচীরের উপরে। আচারধর্মের খাঁচাটাকে ঘরের দাওয়ায় ঝুলিয়ে রেখে ধর্মবিশ্বাসের পাখিটাকে শূন্য আকাশে উড়িয়ে দিলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটে না। কিন্তু অভীক কথায় কথায় লোকাচারকে চালান দিত ভাঙা কুলোয় চড়িয়ে ছাইয়ের গাদার উদ্দেশ্যে। ঘরের চার দিকে মোরগ দম্পতিদের অপ্রতিহত সঞ্চরণ সর্বদাই মুখরধ্বনিতে প্রমাণ করত তাদের উপর বাড়ির বড়োবাবুর আভ্যন্তরিক আকর্ষণ।'

(রবিবার)

১. ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, রবীন্দ্র গল্প ঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ, ৩০১ পৃষ্ঠা।
২. রবিবার, আশ্বিন ১৩৪৬ ; শেষকথা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ ; এবং ল্যাবরেটরি, আশ্বিন ১৩৪৭।
৩. শ্রীঅনুনয় চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র সংখ্যা ১৩৮৭, সংখ্যা দ্রঃ।

খাপখোলা তরবারির মত ঝকঝকে ভাষা ব্যঙ্গ-কটাক্ষের পালিশ দিয়ে চেকনাই করার মত। তৎসম ও সমাসবদ্ধ শব্দ ব্যবহারে এই গদ্যের মাজা বেঁকে পড়ে না। তার উপর রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব গদ্যভঙ্গিও এই পর্বে আর একবার লক্ষ্য করা গেল এই তিনটি গল্পের মধ্যে দিয়ে।

বাংলা ছোটগল্প-ধারায় পরবর্তীকালে একাধিক গল্পকারদের উপর রবীন্দ্রনাথের ভাষারীতির যথেষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়, আর সেইখানেই ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব। 'বহির্বিশ্বে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতিই প্রধান হলেও গল্পকার হিসেবে নিঃসন্দেহে তাঁকে মোপাসাঁ, অ্যালন পো ও চেকভের পাশে স্থান দিতে কারো কুণ্ঠা হবে না।'[১]

গদ্যনাটক

রবীন্দ্রনাথের গদ্যনাটকের ধারায় চলিতরীতির জিত লক্ষ্য করা যায়। খান-কয়েক গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্য ছাড়া, বাকি উনত্রিশটি নাটক চলিত গদ্যে লেখেন। উপন্যাস রচনার তুলনায় এই সংখ্যা বেশ ভারি। 'জীবনস্মৃতির' পাতায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'বাল্যকাল হইতেই মনের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের শখ ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ কার্যে আমার স্বাভাবিক নিপুণতা আছে। আমার এই বিশ্বাস যে অমূলক ছিল না তাহার প্রমাণ হইয়াছে।'

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নাটক লেখেন এবং অভিনয় করে খ্যাতিও লাভ করেন। তাঁর প্রথম নাটক 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১২৯২ ফাল্গুন) রচনা করে সুর সহযোগে ঠাকুরবাড়ির 'বিদ্বজ্জন সমক্ষে অভিনীত' হয়। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভাদেবী সরস্বতীর অভিনয় করেন। অভিনয় দেখে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি মনীষিগণ রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনা, নাট্য-প্রযোজনা ও সুঅভিনয়ের প্রশংসা করেন। পরে শাস্ত্রী মশায় তাঁর 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থটি[২] সংশোধন ও পরিমার্জনা করেন এবং কলকাতা হাইকোর্টের তরুণ উকিল একটা গান লিখে ফেলেন।[৩] এসব ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে নাটক রচনায় বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দেয়।

তাঁর প্রথম গদ্যনাটক 'নলিনী' ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে ও শেষ গদ্যনাটক 'মুক্তির উপায়' ১৯৪৮ খৃঃ মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এই চৌষট্টি বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্য-সাহিত্যকে লালন করে এসেছেন। লালন করা বলতে যা বোঝায় বোধ হয়—তাঁর সাহিত্যের এই একটি শাখাতেই সেকথা আক্ষরিক অর্থে প্রযোজ্য। তিনি নাটক লিখতে লিখতে অভিনয় করেছেন ; অভিনয় করতে করতে নাটক রচনাও করেছেন। আবার নাটক সংযোজন করতে গিয়ে নতুন নাটক লিখে ফেলেছেন। তিনি নিজেকে চিরপথিক বলেছেন। দেশে দেশে তাঁর ঘর। সেই দেশে-দেশে সাংস্কৃতিক দল নিয়ে গিয়ে তিনি আনন্দ দিয়েছেন, সেখানেও সঙ্গী তাঁরই নাটক।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যে পূর্ববর্তী নাট্যকারদের সঙ্গে তাঁর নাট্যরীতির নানা দিক থেকে পার্থক্য ঘটে গেছে। পাশ্চাত্য আঙ্গিকে বাংলা নাটক সূচনাকাল থেকে রবীন্দ্র-সমকালীন কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পর্যন্ত একাধিক নাট্যকারগণ মোটামুটি একটা ছকেবাঁধা পথ

১. শ্রীঅনুনয় চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৩৮৭ সংখ্যা দ্রঃ।
২. প্রথম প্রকাশ বঙ্গদর্শন, পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন ১২৮৭, ২য় সং ১২৮৮ ভাদ্র।
৩. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ৮৮ পৃঃ।

ধরে নাটক রচনা করে গেছেন। তাঁদের অনেকেই সার্থক ট্র্যাজিডি সৃষ্টি করতেও সক্ষম হন।

কিন্তু নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য আঙ্গিকে[১] নাটক লেখা শুরু করলেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই তিনি প্রচলিত পথ থেকে সরে গিয়ে নিত্যনতুন রূপ-ভাবনার সন্ধানে নিয়তই ব্যস্ত থেকেছেন। নাটক লেখা শেষ করেও স্বস্তিবোধ করেননি। বার বার আঙ্গিকের বদল ঘটিয়েছেন। পর্বের পর পর্বে তাই দেখি লিখেছেন গীতিনাট্য, নাট্যকাব্য, রূপক--সাংকেতিক নাটক, এবং শেষে নৃত্যনাট্যে উত্তরণ। কেবল রূপই নয়--নাটকের সংলাপ, সঙ্গীত ও দৃশ্য পরিকল্পনাতেও তিনি স্বকীয়তার ছাপ রাখেন। সংলাপের ভাষায় স্বভাবতই তাই নিজস্ব গদ্যভঙ্গি সহজে স্থান করে নেয়। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বা বিষয় অনুযায়ী নাটকের ভাষা কোথাও তির্যক কটাক্ষে, কোথাও পদ্যের পদলালিত্যে, কোথাও আবার আটপৌরে জীবন থেকে ভাষা খুঁটে এনে পাত্রপাত্রীদের মুখে বসিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নাটক তাই একই সঙ্গে অভিনয় ও আবৃত্তি, উভয় দিক থেকে বাংলা নাট্যসাহিত্যে নতুন কথা বলেছে।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে নাটকে চলিত গদ্য ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের পরিমাপ করতে পারি। যথা :

'নীরদ। আমার কথায় কি একবার কর্ণপাতও করলে না? আমি মনে করতুম, প্রাণপণ আগ্রহকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। নলিনীর কি এতটুকুও হৃদয় নেই যে আমার অতখানি আগ্রহকে স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করতে পারলে? নাঃ হয়ত ফুল তুলতে অন্যমনস্ক ছিল, আমার কথা শুনতেও পায়নি। আর একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি। নলিনী!'

(নলিনী)

চলিত গদ্য-সংলাপ তাতে সন্দেহ নেই, তবে কথাবার্তার ভাষার সহজ রূপ এতে নেই। তার মধ্যে কোন কোন চরিত্রের মুখেও আবার সেকালের কলকাতার উপভাষার নিদর্শন পাই। যথা : যেখেন দিয়ে, সেখেনে, পিট্ পিট্ করে চাচ্চে, দেখ'সে, নেবু গাছ ইত্যাদি।

'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২) ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭) পর্যন্ত এই আড়ষ্ট ভাব বজায় থাকে। তবে শেষের দিকে পরিমাণ বেশ কমে আসে। 'শারদোৎসব' (১৯০৯)-এ পৌঁছে রবীন্দ্রনাটকের ভাষা নিজস্ব খাতে বইতে শুরু করে। এমনকি এইখান থেকে ক্ষীণভাবে হলেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাষা-ভঙ্গিরও সন্ধান মেলে। উদাহরণ স্বরূপ 'সন্ন্যাসী' চরিত্রটির সংলাপের কথা বলা যায়।

যেসব নাটকের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কোন ভাব বা তত্ত্ব আভাসিত হয়েছে, সেই সমস্ত তত্ত্ব-নাটকের সেসব পাত্রপাত্রীদের সংলাপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উক্ত চরিত্রগুলির সংলাপ বা ভাষার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাষাভঙ্গিটি বেশি করে ফুটে উঠেছে। 'সন্ন্যাসী' এই রকম একটি চরিত্র। পরবর্তী একাধিক নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী, ঠাকুরদা, দাদাঠাকুর প্রভৃতি চরিত্রগুলিও ওই রকম। তাঁর রূপক—সাংকেতিক পর্যায়ের ভাষায় আরও ধার, শাণিত কৃপাণের মত। উপন্যাস ও গল্পের ভাষা যেমন মনের মধ্যে গেঁথে যায়, এই পর্বের নাটকীয় গদ্যের ভাষা সোজাসুজি আমাদের মর্মে গিয়ে ঘা মারে। পূর্ববর্তী নাট্যকারদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটকের আকাশ-পাতাল দূরত্ব এইখানেই। আর নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের দোষ ও গুণও এখানেই।

১. 'সেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মালিনী' নাটকের ভূমিকা।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর নাটকে চলিতরূপ ব্যবহারের পরিচয় নিতে পারি। যথা :
'ঠাকুরদা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসন্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক—ফুলের রেণু এখন থাক, দক্ষিণে হাওয়ায় এবার ধুলো উড়িয়ে দিক। সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব, তাঁর গায়েও ধুলো মাখা। তাকে বুঝি কেউ ছাড়ে মনে করেছ? যে পায়, তার গায়ে মুঠো মুঠো ধুলো দেয় যে। সে ধুলো সে ঝেড়েও ফেলে না।'

(রাজা)

ভাষায় সহজ আটপৌরে রূপ তত্ত্বের রঙে চোবানো চলিত। এই গদ্যই রবীন্দ্রনাট্যের প্রাণ। তাঁর সব নাটকেই কমবেশি এই ঢঙ বিরাজ করে। রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির ভাষায় এক অভিনব বাক্‌ভঙ্গি দেখা যায়, যা বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রয়োগ করে দেখান। তির্যকভঙ্গি ও ব্যঞ্জনাময় শব্দের কারিকুরি সে ভাষা নাটকের কাহিনীতে গতি সঞ্চারে সহায়তা করে। যথা :
'ধনঞ্জয়। ঠাট্টা কেন কবর? এক পায়ে চলার মতো কি দুঃখ আছে? রাজত্ব একলা যদি রাজারই হয়, প্রজার না হয়, তাহলে সেই খোঁড়া রাজত্বের লাফানি দেখে তোরা চমকে উঠতে পারিস কিন্তু দেবতার চোখে জল আসে। ওরে রাজার খাতিরেই রাজত্ব দাবি করতে হবে।'

(মুক্তধারা)

'নন্দিনী। এ সব তোমাদের বানিয়ে-তোলা কথা।
অধ্যাপক। বানিয়ে তোলাই তো। উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে-তোলা কাপড়েই কেউ বা রাজা, কেউ-বা ভিখিরী। এসো আমার ঘরে। তোমাকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিতে বড়ো আনন্দ হয়।
নন্দিনী। তোমাদের খোদাইকর যেমন খনি খুদে খুদে মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, তুমিও তো তেমনি দিনরাত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুঁড়েই চলেছ। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন।
অধ্যাপক। আমরা নিরেট নিরবকাশ গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁদিয়ে আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশের সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এসো আমাব ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।'

(রক্তকরবী)

রূপক বা সংকেতকে আভাসিত করতে নাটকে এমন তির্যক-বাণীভঙ্গির প্রয়োজন। এই সব নাটকের কথ্যরূপের তাই ভিন্নতর স্বাদ। পরবর্তীকালে লিখিত অন্যান্য গদ্যনাটকেও ভাষার এই বিশিষ্ট বাণীভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শেষ গদ্যনাটক থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :
'ষষ্ঠী। মা, শরণ নিলুম তোমার।
পুষ্প। খবর নিয়েছি পাড়ায়, তোমার নাতি মাখন পলাতক সাত বছর থেকে—সংসারের দুনলা বন্দুক লেগেছে তার বুকে, দুঃখ এখনো ভুলতে পারেনি। একটা বিয়ে করলে পুরুষের পা পড়ে না মাটিতে, তোলা থাকে স্ত্রীর মাথার উপরে; আর, দুটো বিয়ে করলেই দুজোড়া মল বাজতে থাকে ওদের পিঠে, শিরদাঁড়া যায় বেঁকে।'

(মুক্তির উপায়, ১৯৪৮)

'তাসের দেশ' থেকে 'নির্দেশনামা'গুলো চলিতে দিতে শুরু করেন। 'বাঁশরি' (১৯৩৩) নাটক থেকে ওই নির্দেশনামায় কিছু নতুনত্ব দেখা গেল। বানার্ড শ'য়ের মতো বিস্তারিত ভাবে মঞ্চের দৃশ্যপটের নির্দেশগুলো কথ্যরীতিতে দিতে আরম্ভ করলেন। এদের সহজ-আটপৌরে গদ্য আমাদের দৃষ্টি কাড়ে। দুটো নাটক থেকে দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা এই পর্বের ইতি করতে চাই। যথা--

'বাগানের কোণে তিনটে ঝাউগাছ চক্র করে দাঁড়িয়ে। তলায় কাঠের আসন। সেই নিভৃতে ক্ষিতীশ। অন্যত্র নিমন্ত্রিতের দল কেউ বা আলাপ করছে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে, কেউ বা খেলছে টেনিস, কেউ বা টেবিলে সাজানো আহার্য ভোগ করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।'

(বাঁশরি, ১ম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

'শিষ্য শিষ্যা পরিবৃত গুরু। জটাজালবিলম্বিত পিঠের উপরে। গেরুয়া চাদরখানা স্থূল উদরের উপর দিয়ে বেঁকে পড়েছে, ঘোলা জলের ঝরণার মতো। ধূপধুনা। গদির এক পাশে খড়ম, যারা আসছে খড়মকে প্রণাম করছে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলছে--গুরো। গুরুর চক্ষু মুদ্রিত, বুকের কাছে দুই হাত জোড়া। মেয়েরা থেকে থেকে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। দুজন দুপাশে দাঁড়িয়ে পাখা করছে। অনেকক্ষণ সব নিস্তব্ধ।'

(মুক্তির উপায়, ২য় দৃশ্য)

ভাষা অনেক সরল। নাটকের সংলাপের সঙ্গে এই নির্দেশনামার ভাষার বাচনভঙ্গিই অনেক আলাদা। এখানকার মেজাজ নাট্যপরিচালক রবীন্দ্রনাথের। ভাষার সহজ-গাম্ভীর্য আমাদের মুগ্ধ করে। এখানে যেন কবি-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের প্রবেশাধিকার নেই, এখানে এই ভাষারূপের বৈশিষ্ট্য। এ যেন আসলের উপর ফাউ।

পত্র সাহিত্য

রবীন্দ্র-গদ্যসাহিত্যের বারো আনা অংশই বলা যায় পত্র। ভ্রমণ আলোচনা সমালোচনা সাহিত্যতত্ত্ব প্রভৃতি অনেক কিছুই পত্রের রূপেই জন্ম। পত্রের পর পত্র সাজিয়েই তো পরবর্তীকালে গ্রন্থকারে বা সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। আবার অনেক পত্র নিছক পত্র হয়েই আছে--কিন্তু সেগুলোর মধ্যে দিয়ে সমকালীন সৃষ্টি-মানসকে অনায়াসে উদ্ধার করা যায়। সেদিক থেকে ওই সমস্ত পত্রগুলির সাহিত্যিকমূল্য অপরিহার্য। অধ্যাপক-সমালোচক প্রমথনাথ বিশী তাই এগুলিকে ছদ্মবেশীকাব্য এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের চাবিকাঠি বলে উল্লেখ করেন।[১] কেননা, এতে কবি-তাত্ত্বিক-মানুষ রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় মিলিত হয়েছেন।

তাঁর এই সদ্য মুদ্রিত[২] পত্রাবলীর মধ্যে অন্যতম 'ছিন্নপত্রাবলী', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পত্র' ও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত কিছু পত্র। মোট পত্রের সংখ্যা ৩১৯টি। গোড়ায় পত্রসংকলন গ্রন্থের নাম ছিল 'ছিন্নপত্র'। পরে আরও পত্র উদ্ধার ও সংযোজিত হওয়ায় 'ছিন্নপত্রাবলী' রূপে চিহ্নিত করা হয়।

সম্পূরণ অংশের প্রথম পত্রের তারিখ ও স্থান বন্দোরা সমুদ্রতীর, ৩ অক্টোবর ১৮৮৫, প্রাপক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। ২৫২ নং পত্রের তারিখ ১৮৯৫, ১৫ ডিসেম্বর, শিলাইদহ। কালের হিসেবে তাই দশ বছরের পত্র 'ছিন্নপত্রাবলীর' সামগ্রী। আজও পত্র-পত্রিকায় দুটি

১. সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে উনি এই মন্তব্য ব্যবহার করেন।
২. রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবর্ষ, ১১দশ খণ্ডে ২৫২টি, ১৫শ খণ্ডে ৮টি এবং ৫৯টি ভানুসিংহের পত্র।

একটি পত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। আরও অনেকের সংগ্রহে থাকা স্বাভাবিক।

আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের গদ্যের ভাষা যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত, গতিময় ও জীবন্ত, তা হচ্ছে এই সব পত্র। একেবারে গোড়ার দিককার একটা পত্রে তাঁর ভাষাভঙ্গির চমৎকার নিদর্শন দেখি। যথা :

'এই চিঠি এবং আমরা শুক্রবারের সকালের ডাকে কলিকাতায় বিলি হব। আমাদের প্রবাসের পালা সাঙ্গ করলুম—এখানকার অগাধ আকাশ, অবাধ বাতাস, উদার মাঠ, বিমল শান্তি, এসব পশ্চাতে রেখে সেই বাঁশতলায় গলি, জোড়াসাঁকোর মোড়, সেই ছেকড়াগাড়ির আস্তাবল, সেই ধুলো, সেই ঘড়ঘড় হুড়মুড় হৈ হৈ, সেই মাছি ভন্‌ভন্ ময়রার দোকান, সেই ঘোরতর হিজিবিজি হ-য-ব-র-ল-এর মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করতে চললুম।...কলকাতার সেই জনতাসমুদ্রের মধ্যে আমার সেই বিরহান্ধকার ঘরটিই কেবল বিজন। তার সেই রুদ্ধ দ্বারের ভিতর থেকে কাতর স্বর উঠছে, রবিবাবু—উ-উ-উ। রবিবাবু আজ এখান থেকে বিদায় নিচ্ছেন, এই যা-আ-আ-ই।'

(সোলাপুর, অক্টোবর ১৮৮৫)

পরিচ্ছন্ন গতিময় চলিতরীতি। 'লুম'-প্রত্যয়স্ত ক্রিয়ার প্রয়োগ পাই। ভাবপ্রকাশে কুণ্ঠা বা অসুবিধা নেই। রসিকতা, বেদনা, প্রসন্নতা, মিলিয়ে এ পত্রের ভাষা জীবন্ত।

আর একটি পত্রে দেখি, অতিব্যস্ত নজরদার আর এক রবীন্দ্রনাথকে। বাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে যুবক, রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙে যান এবং সেই ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার পথ ও পথের শেষে যন্ত্র ও যন্ত্রণার আশ্চর্য সুন্দর ভাষাচিত্র ফুটে উঠেছে। যথা :

'কিন্তু এই দুদিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি এবং বেঞ্চের নিচে ঠেলে গুঁজেছি এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের করেছি, এত বাক্স এবং পুঁটুলির পেছনে আমি ফিরেছি এবং এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মত ফিরেছে, এত হারিয়েছি এবং এত ফের পাওয়া গেছে...কোনো ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্র সন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটেনি।

...ক্রমে ঠাণ্ডা, তার পরে মেঘ, তারপরে নদিদির সর্দি, তারপরে বড়দিদির হাঁচি, তারপরে শাল কম্বল বালাপোশ, মোটা মোটা, পা কন্‌কন্, হাত ঠাণ্ডা, মুখ নীল, গলা ভার ভার, এবং ঠিক তারপরেই দার্জিলিঙ। আবার সেই বাক্স, সেই ব্যাগ, সেই বিছানা. সেই পুঁটুলি। মোটের উপর মোট, মুটের উপর মুটে।'

যেন 'পুনশ্চ'র গদ্য কবিতা পড়ছি। কথ্যরীতির এ এক আশ্চর্য পরীক্ষা। এক নিঃশ্বাসে পড়ার মত লম্বা এক যৌগিক বাক্যের মধ্যে অজস্র কিছু অব্যয়ের পৌনঃপৌনিক ব্যবহার। 'এত', 'এবং' 'তারপরে'—বার বার শুনে মনে হচ্ছিল এ যেন গদ্য নয়, কবিতা। কেবল কবিতার ছদ্মবেশেই নয়, কবিতার স্বাদও এনে দেয় কোন কোন পত্র। তাদের ভাব ভাষা ও শব্দবিন্যাস আমাদের মনে কবিতার বাতাবরণ সৃষ্টি করে। যথা : 'এই সর্ষেক্ষেতের গন্ধটি আমাকে ভারী মুগ্ধ করে, আমার মনে কী একটা ছবি এবং সৌন্দর্যের আবেশ আনয়ন করে, যেন অনেক দিনের দেখা একটা রৌদ্ররঞ্জিত মাঠ, শীতলস্নিগ্ধ বাতাস, পুষ্করিণীর ধার দিয়ে বাঁকা গ্রামের পথ, ঘটকক্ষঅবগুণ্ঠিতা বধূ এবং সেই সঙ্গেই সর্ষেক্ষেতের মৃদু সুগন্ধে অনুপ্রবিষ্ট একটি উদার নির্মল আকাশ মনে পড়ে—যেন কোন এক সময়ের পরিতৃপ্ত প্রেম এবং পরিপূর্ণ শান্তির সুগভীর সুখস্মৃতি ঐ সর্ষেক্ষেতের গন্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।'

(সাহাজাদপুরের পথে, ১১ ডিসেম্বর ১৮৯০)

এ গদ্যকবিতা নয় তো কি? রবীন্দ্রসমালোচক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর ভাষায়, 'এ কাব্যের বস্তু লীলাচ্ছলে গদ্যের পোষাক পরেছে।'[১] এমনি করে পত্রাবলীর পত্রের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গদ্যরীতির সাক্ষাৎ পাই, বাংলা চলিতরীতির আলোচনায় এগুলোর গুরুত্ব অনেক।

ভানুসিংহের পত্রাবলী[২]

'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র সংখ্যা ৫৯টি। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পত্রধারার দ্বিতীয় পর্যায়ের চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল একটি বালিকাকে। সে চিঠির বেশির ভাগ লেখা হয়েছিল শান্তিনিকেতন থেকে। তাই সেগুলির মধ্যে দিয়েই স্বতই বয়ে চলেছে শান্তিনিকেতনের জীবন যাত্রার চলচ্ছবি। এগুলিতে মোটা সংবাদ বেশি কিছু নেই, হাসি তামাশায় মিশিয়ে আছে সেখানকার আবহাওয়া, জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস ; আর তারই সঙ্গে লেখকের সকৌতুক স্নেহ। বিশেষ কিছু বলতে হবে না মনে করে হালকা মনে আটপৌরে রীতিতে যা বলা যেতে পারে তাকে কোনো শানবাঁধানো পাকা সাহিত্যিক-রাস্তায় প্রকাশ করবার উপায় নেই।'

পত্রগুলির ভাষা এবং বিষয় দুইই অনাড়ম্বর চলিতরীতির। 'ছিন্নপত্রাবলীর' মধ্যে দেখি কবি, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে। আর এখানে হাজির স্নেহবৎসল মানুষ-রবীন্দ্রনাথ। ছিন্নপত্রের প্রাপক ও স্থান-কাল-পাত্র ছিন্নভিন্ন। এই পত্রের প্রাপক একটি নিছকই বালিকা। এর ভাষাভঙ্গি অনেকটা 'ছেলেবেলা' গ্রন্থের মত। পরিহাস-রসিক-প্রসন্ন রবীন্দ্রনাথের গল্পরস সৃষ্টির মিষ্টি আমেজ এগুলোর উপজীব্য। যথা :

'প্রথম যখন তোমার চিঠি পেয়েছিলুম, তোমার চিঠিতে "প্রিয় রবিবাবু" পড়ে ভারি মজা লেগেছিল। ভাবলুম রবিবাবু আবার "প্রিয়" হবে কেমন করে? যদি হত "প্রিয় মিষ্টার ট্যাগোর" তাহলে তেমন বেমানান হত না, কেননা রবিবাবু প্রিয়ও হতে পারে, অপ্রিয়ও হতে পারে। এবং প্রিয় অপ্রিয় দুইয়ের বাহিরও হতে পারে। তুমি যখন চিঠি লিখেছিলে, তখন রবিবাবু প্রিয়ও ছিল না, অপ্রিয়ও ছিল না, নিতান্ত কেবলমাত্র রবিবাবুই ছিল।

...আজকাল রবিবাবু পরীক্ষায় দুতিন ক্লাশ উঠে 'রবিদাদা' হয়েছে। কিন্তু যদি প্রিয় 'রবিদাদা' লেখো, তবে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে...অতএব আমি যেন থানধুতিপরা ঠাকুরদাদা, আমার কোনো পাড় নেই, আমি নিতান্তই যেন সাদা 'রবিদাদা' কী বলো!'

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক যুগের উপযোগী চলিত গদ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প-উপন্যাস নাটক-আলোচনা-সমালোচনা, ভাষণ, পত্র প্রভৃতির মধ্যে দিয়েই রেখে যান। কেবল চলিতরীতি নয়, চলিতরূপের বহু বিচিত্র রূপনির্মিতি হাতে কলমে দেখিয়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আসনে নিজেকে সর্বকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তাঁর যথার্থ উত্তরসূরী এখনো আমরা পাইনি।

---

১. বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, ১৯১ পৃঃ দ্রঃ।
২. প্রকাশ ১৩৪৫ সাল।

দশম অধ্যায়

সিদ্ধান্ত

বাংলা সাহিত্যে চলিতরীতির ক্রমব্যবহারের আলোচনায় দেখতে পাই পদ্যে ও গদ্যে সাধুরীতি ও চলিতরীতি একটা পর্যায় থেকে পাশাপাশি ভাষা-প্রবাহ অন্তঃসলিলা স্রোতধারার মত চলতি শতকের বুকে এসে পড়েছে। জোরের সঙ্গেই আজ উচ্চারণ করা যায় যে, গদ্যে ও পদ্যে চলিতরীতি সাহিত্যের প্রধান বাহন। চলিতরূপের এই গৌরবের পেছনে অনেক চড়াই-উতরাই আছে, সেকথা আমরা জানতে পেরেছি।

পঞ্চাশ বছরের অধিককাল আধুনিক কবিতায় চলিতরূপ একমাত্র ভাষা-মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় এই সময়টা বড় কম নয়।

চলিত গদ্যরীতির বেলায় একটু ভিন্নচিত্র চোখে পড়ে। 'সবুজপত্র'-সম্পাদকের চলিত ভাষার আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথের সম্মতির কথাও আমাদের জানা। তারপর ওই পত্র-পর্ব থেকে নিপুণ হাতে আমৃত্যু গদ্যের সমস্ত রচনা চলিতরূপে সৃষ্টি করে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু বলতে দ্বিধা নেই, তাঁর অবর্তমানে সে-রীতি কিন্তু সর্বত্রগামী হতে পারেনি। বেশ মেজাজে টিকে রইল সাধুরীতি উত্তরসূরী কথাকাবদের অনেকেরই আলোচনায়, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধ নিবন্ধে, চিঠিপত্রে, গবেষণা-অভিসন্দর্ভে ও পাঠ্যগ্রন্থে। ক্রমে অবস্থার বদল ঘটে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, শুরু থেকে যাঁরা সাধুরীতিতে গদ্যচর্চা করে এসেছেন তাঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে চলিতরীতিতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জটিল বিষয়ের আলোচকগণ, তথা প্রমথনাথ বিশী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কৃতী অধ্যাপকদের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বিমল মিত্র, বিমল কর, সমরেশ বসু, সুবোধ ঘোষ, গৌরকিশোর ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল রায়, দেবেশ রায়, দিব্যেন্দু পালিত, শংকর প্রভৃতি কথাশিল্পীরা চলিত গদ্যরীতির সফল রূপকার।

সত্তরের দশক থেকে লক্ষ্য করি সংবাদপত্র, আকাশবাণী ও দূরদর্শন প্রভৃতি প্রচার-মাধ্যমগুলি চলিতরীতি বা মুখের ভাষাতেই যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রচারের কাজ চালাতে শুরু করেন। একাত্তর সালে বাংলা ভাষাকে 'রাষ্ট্রভাষা'র মর্যাদায় বসিয়ে 'বাংলাদেশ রাষ্ট্র'র আত্মপ্রকাশ ঘটলো। সেদেশেও এপার বাংলার মত চলিত ভাষাকেই অন্যতম 'বাহন'-রূপে গৃহীত হতে দেখা যায়।

উপরোক্ত দশক থেকে যাত্রা অপেরা মঞ্চ ও চলচ্চিত্রেও ভাষা-মাধ্যম মুখের ভাষা বা চলিত গদ্য। এমনকি সাধুভাষায় লিখিত যে কোন আখ্যানকেই চলিত গদ্যে উপস্থাপনা হতে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বাড়ির অন্দর-মহল ও রান্নাঘরেও পৌঁছে যায় ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার বাংলা ধারাভাষ্য। কেবল খেলার জগৎ নয়—আজ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যগ্রন্থ ও গবেষণা-অভিসন্দর্ভগুলি রচিত হচ্ছে স্বাভাবিক চলিত গদ্যে।

বহুকাল পূর্বে 'বাংলা ভাষা পারিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করেছিলেন : 'গল্পের শেষ অংশটা এখনো সম্পূর্ণ আসেনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা বসবেন রাজাসনে।' আমাদের সিদ্ধান্ত, স্বামীজীর ভবিষ্যৎ বাণী, প্রমথ চৌধুরীর উদ্যোগ, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এবং সবশেষে কালের দাবি—এখন দু-পারের বাঙালির একমাত্র লেখ্যভাষা মুখের ভাষা, চলিত গদ্য।